সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন

: পরিবেশক :
গ্রন্থলোক
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী লীলা পাল
লীলা প্রকাশনী
আড়রা—কালীনগর
পোষ্ট—আড়রা
দুর্গাপুর—১২
জেলা—বর্ধমান

Surya Sener Sonali Swapna

প্রচ্ছদ ঃ পরিকল্পনা রূপময় পাল
অঙ্কনে শিল্পী চিত্তরঞ্জন সূত্রধর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আংশিক
অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

মুদ্রক ঃ অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২, বিধান সরণী (ব্লক-কে ১)
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ,
মনোরঞ্জন রায়, সুধাংশু সরকার
এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা
আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

শ্রীরূপময় পাল স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় 'সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন' নাম দিয়ে এই বইখানি লিখেছেন। এই বইখানি বঙ্গভঙ্গ থেকে আরম্ভ করে বিপ্লবের ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, মহান বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ ও দীর্ঘদিনব্যাপী চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বাহিরে গেরিলা সংগ্রামের ঘটনাসমূহ লেখক সঠিক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। শিল্পীর তুলির টানের মত দরদী হৃদয় দিয়ে তিনি প্রতিটি বিপ্লবীর চরিত্র সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্ত রূপময় পাল একজন শক্তিমান লেখক। তিনি বেশ সহজ ও সরল ভাষায় বিপ্লবপন্থী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বাস্তব ঘটনাবলী পরিবেশন করেছেন। লেখার শিল্প-কুশলতায় বিবৃত ঘটনাসমূহ প্রাণবন্ত তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বইয়ের উপকরণ সংগ্রহের জন্য শ্রীপাল বহু কষ্ট করে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাথে দেখা করেছেন ও তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। তা ভিন্নও যে সকল প্রবীণ সংগ্রামী বাংলাদেশে রয়েছেন তিনি তাঁদের অনেকের সঙ্গে পত্রযোগে যোগাযোগ করেছেন। ফলে অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা এই বইখানিতে স্থান পেয়েছে, যা পাঠকদের আনন্দ দেবে ও ইতিহাস গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ রূপে গৃহীত হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন। বিপ্লবপন্থী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সূর্য সেন একটি বিশিষ্ট ও অবিস্মরণীয় নাম। তিনি মুক্তি প্রয়াসী সংগ্রামী ভারতীয় জনগণের কাছে একটি অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করবার প্রয়াসে চট্টগ্রামকে তিন-চারদিনের জন্য যথার্থভাবেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী অজেয় নয়—এটাই তিনি প্রমাণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ চট্টগ্রামেই বিপ্লববাদের একটি নূতন সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়। সম্মুখ সমরে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ও দেশের সম্মুখে এই আদর্শ স্থাপনে। অল্পকাল স্থায়ী হইলেও প্রেরণা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশি। আলীপুর বোমার মামলার ফলে সমগ্র ভারতে যেমন সহিংস বিপ্লববাদের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল ঠিক তেমনিই চট্টগ্রামকে তিনদিনের জন্যও পরিপূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্য থেকে স্বাধীন করে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিদ্রোহীরা ভারতের জনগণকে মুক্তি অর্জনে প্রেরণা যোগাইয়া ছিলেন।

সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন কি ছিল ? সেই সোনালি স্বপ্ন ছিল—ভারতের স্বাধীনতা। সে সম্পর্কে মাস্টারদা সূর্য সেন ফাঁসীমঞ্চে প্রাণ বিসর্জ্জনের আগে তাঁর "বিদায়বাণী"-তে

লিখেছিলেন—"Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of Free India."

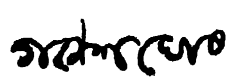
এ পুস্তকের লেখক কঠোর পরিশ্রম করে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম সম্পর্কিত একখানি ইতিহাস ভিত্তিক অমূল্য বই প্রণয়ন করে আমাদের দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন।

এখানে একটি নেহাতই ব্যক্তিগত কথা বলে রাখি,—ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উপর একখানি বই লিখবার একান্ত ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে এবং আমার স্বাস্থ্যের জন্য তা আর সম্ভব হয়নি এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত আর হবেও না। কিন্তু এই পুস্তকের লেখক শ্রীরূপময় পালের লেখা এই পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে আমি মনে মনে আমার কৈশোর ও যৌবনের বেলাভূমিতে বহুবার ফিরে ফিরে গিয়েছিলাম। সেদিনের পরাধীন ভারতের দুর্ভাগ্যজনক ও ক্লেশকর বাস্তব অবস্থার চিত্র আমার স্মৃতিপটে বারবার ভেসে উঠেছিল। বইখানি পড়ে যথার্থই খুব আনন্দিত বোধ করেছি। এই ধরনের ইতিহাস ভিত্তিক ভাল বই আরও বেশী সংখ্যায় প্রকাশিত হোক, ইহাই আমার একান্ত কামনা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ঘটনার ইতিহাস এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশেষভাবে বিপ্লবপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী এখনো জীবিত রয়েছেন। তাঁরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ইতিহাস গড়েছেন। ভারতের দেশপ্রেমিক লেখকগণ শ্রীরূপময় পালের ন্যায় এগিয়ে এসে এবং একটু কষ্ট করে অতীতের ওই সকল বিশিষ্ট মুক্তি সংগ্রামীগণের নিকট হোতে সব ঘটনা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন—এই আমার একান্ত অনুরোধ।

'সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন' বইখানি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একখানি মহাকাব্য গ্রন্থ। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যেদিন লিখা হবে আমার ধারণা সেদিন আকর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই বইখানি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে।

শ্রীরূপময় পাল এই বইখানি লিখে একটি মহান্ জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করেছেন।



মুখবন্ধ

লেখাই লেখকের পরিচয়। তারপরও কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ অথবা ঐতিহাসিক নই। আমি একজন খেটে খাওয়া অতি সাধারণ মানুষ। জীবনের গতিপথে চলতে চলতে হঠাৎ বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। সেই দিনগুলি হলো ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সাল। স্থান—নেতাজী ভবন, এ-জোন, দুর্গাপুর-৪, জেলা—বর্ধমান। এই সময় 'নবীন-সূর্য স্মৃতি সংঘের' উদ্যোগে 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের জাতীয় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব' বর্ধমান জেলা কমিটি কর্তৃক পালিত হয়েছিল। আমি উক্ত অনুষ্ঠানে 'স্মারক পুস্তিকার' সম্পাদক ছিলাম। সেই সুযোগে আমি কয়েকজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সেখান থেকেই আমি বই লেখার প্রেরণা পাই। এই বই আমার দীর্ঘ পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

'সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন' বইখানি লিখতে গিয়ে আমি অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তারজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল বিপ্লবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাঁরা হলেন—গণেশ ঘোষ, সরোজ গুহ, অর্ধেন্দু গুহ, কিরণ সেন, শৈলেশ রায়, মণিলাল দত্ত, নন্দলাল সিংহ, কালীকিঙ্কর দে, নির্মল দত্ত, নগেন্দ্রলাল সেন (জুলু সেন), বনবিহারী দত্ত, মনোরঞ্জন রায়, সুধাংশু সরকার, শান্তিরঞ্জন সেন, সুশীল দাশগুপ্ত, সুরেশ দে, শ্রীমতী বীণা দাস, শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী, শ্রীমতী ক্ষীরোদে প্রভা বিশ্বাস, হরলাল চৌধুরী' বিনোদ দত্ত ও দীনেশ সেন প্রমুখ।

এছাড়া আরো কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে ডাকযোগে আমার যোগাযোগ হয়েছে। এবং তাঁদের কাছ থেকে বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করেছি। তাঁদের নাম হলো—বিনোদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ), কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত (চট্টগ্রাম , সীতারাম বিশ্বাস (দিল্লী), হরিপদ ভট্টাচার্য, নির্মল সেন (বুলবুল, চট্টগ্রাম) প্রমুখ।

এখানেই শেষ নয়। তারপর যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি। যেমন কৃষ্ণ চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল চৌধুরী, সূর্য সেনের বৌদি বিরাজমোহিনী সেন, প্রীতিলতার বোন কনকলতার সঙ্গে আমি দেখা করে বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করেছি।

লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপিটি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডঃ প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়কে পড়তে দিই। তাঁর অভিমত শুনেই, মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে অনুদানের জন্য আবেদন করি। সৌভাগ্যবশতঃ সরকারের অনুদান বইটি লাভ করে। বইটি প্রকাশের জন্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা আমার সীমাহীন।

এখন সমস্যা হলো, বই ছাপাতে গেলে আরো টাকার প্রয়োজন। সরকারি সাহায্য ছাড়াও আরো অনেক টাকা ধার করতে হবে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একজন বন্ধু আলোক সম্পাত

করলেন। আমার বই প্রকাশের জন্য তিনি মোটা অঙ্কের টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন, 'আমার নাম যাতে কেউ জানতে না পারে।' এতোদিন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। এখন নামটি প্রকাশ করা শ্রেয় মনে করছি। বন্ধুটির নাম হলো—ইন্দুভূষণ সরকার।

আমার পারিবারিক জীবনের বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীধীরেন দেব বই ছাপানোর সময় আমাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ।

আমি থাকি দুর্গাপুর। কলকাতায় বই ছাপানো একটা বিরাট সমস্যা! নিরুপায় হয়ে আমার সাহিত্য জীবনের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় সুধাংশু সরকারকে বই ছাপানোর সমস্যার কথা বললাম। তিনি কঠিনরোগে আক্রান্ত। অনেক ভেবে তিনি তাঁর বন্ধুর সুযোগ্য পুত্র ও দীপায়ন প্রকাশনীর পরিচালক শ্রীযুক্ত সলিল সাহার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বইটি স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। কেননা তাঁর বাবা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সাহা একজন প্রবীণ বিপ্লবী। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাম্রপত্র লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনশন পান। সলিলবাবুর সাহায্য পেয়ে আমি ধন্য। ভবিষ্যতেও এরূপ সাহায্য পাবো আশা রাখি।

এখানে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—আমার এই বইখানি সরকারি সাহায্য লাভ করেছে জেনে, আমার কর্মজীবনের বিভাগীয় প্রধান ও প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ শ্রীযুক্ত অশোক কুমার দুবে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাতে আমি প্রেরণা লাভ করেছি।

প্রখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অনুনয় চ্যাটার্জি বইখানি ছাপানোর সময় আমায় অমূল্য পরামর্শ দিয়ে প্রভূত উপকার করেছেন। সেই কথা স্মরণ করেই আমি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

দুর্গাপুরের পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীঅশোক দাস কলকাতার প্রেস থেকে 'প্রুফ' নিয়ে দুর্গাপুরে আমার কাছে বারবার পৌঁছে দিয়েছেন। সেই সমস্ত 'প্রুফ' আমার সহকর্মী ও ভ্রাতৃপ্রতিম বিমলকৃষ্ণ তপাদার কষ্ট করে দেখে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর অবদান সত্যি প্রশংসনীয়।

আমার ভাই শ্রীমান তাপসময় পাল ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু সর্বশ্রী পঙ্কজ মজুমদার, দীপককুমার মজুমদার, সরোজিৎ রায়চৌধুরী, পবিত্রকুমার গুহ, দিলীপ ঘোষ, মোহিত গাঙ্গুলী, নারায়ণ চন্দ্র সিংহ বিশ্বাস, রত্নেশ্বর সেন, কমলাক্ষ শূর ও শ্রীমতী রমা অধিকারী প্রমুখ হিতার্থীরা নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন।

আমার গৃহ-চিকিৎসক ও বন্ধু শ্রীনরনারায়ণ সেন আমার সাহিত্য সাধনায় যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তা মনে রাখার মতো। তাঁর ভালোবাসার ঋণ অপরিশোধ্য। শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয় আমাকে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় গণেশ ঘোষ এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর লেখা ভূমিকা আমার সাহিত্য জীবনের এক পরম সম্পদ।

বইখানি ছাপানোর সময় আমি প্রায়ই অসুস্থ ছিলাম। তাই বইতে কয়েকটি বানান ভুল আছে। তাছাড়া প্রিয় পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আমার অজ্ঞাতসারে বইখানিতে তথ্য পরিবেশনে যদি কোন ভুল থাকে, তাহলে দয়া করে তাঁরা যেন আমাকে জানান। তারপর আমি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেবো।

'দি প্যারট প্রেস'-এর মালিক শ্রদ্ধেয় অসীম কুমার সাহা মহাশয়ের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার মনোমুগ্ধকর।
'গ্রন্থলোক' প্রকাশনীর মালিক শ্রীযুক্ত সুপ্রিয় সরকার বইখানি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উপকার করেছেন। এছাড়া নানা কাজে তিনি আমাকে সাহায্যও করেছেন।
'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা' শহিদের ব্লক দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।
'নবীন-সূর্য স্মৃতি সংঘ'-এর কাছ থেকেও আমি সহযোগিতা লাভ করেছি।
পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বন্ধু অনিল চৌধুরী ও বন্ধুপত্নী সুফলা চৌধুরীকে। বই ছাপানোর ব্যাপারে যতোবার কলকাতা গেছি ততোবার তাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছি। তাঁদের আন্তরিকতা প্রশংসনীয়।

আড়রা কালীনগর
পোস্ট—আড়রা
দুর্গাপুর—১২
জেলা—বর্ধমান

গ্রন্থকার

এই গ্রন্থের অগ্রজ

প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও অমৃত পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত, দেশ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক সংগৃহীত এই লেখকের তথ্য সমৃদ্ধ উপন্যাস।

ঢেউয়ের তালে তালে	(উপন্যাস)	৭.০০
অনন্যা	(গল্প)	৫.০০

বিশিষ্ট বিপ্লবীগণের পত্র

শ্রীরূপময় পাল আমার সঙ্গে তিনবার দেখা করেছেন। আমি তাঁকে আমার দিদি ইন্দুমতী সিংহ, আমার ভাই অনন্তলাল সিংহ এবং আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকার কথা বলেছি। এ ছাড়া আমার বাবার ডায়েরি দেখে তিনি কিছু ঘটনা লিখে নিয়েছেন। আমাদের বংশ তালিকাও তাঁকে দেখিয়েছি।

নন্দলাল সিংহ
৪৯।৩৪, রবীন্দ্র সরণী
রিষড়া, জেলা হুগলী

অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার। প্রীতিলতা আমার দিদি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে হাজির হয়েছি আমি। কঠিন রোগে আক্রান্ত। প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দে মহাশয় রূপময় পালের সঙ্গে আমার বাড়ী এসেছে। অসুস্থ হলেও আমি আমার দিদির সম্বন্ধে রূপময় পালকে বলেছি।

কনকলতা চৌধুরী (ওয়াদ্দাদার)
৮৭।১ কবি নবীন সেন রোড।
কাজীপাড়া, দমদম।
কলিকাতা-২৮

পময় পাল আমার কাছে দুখানা চিঠি লিখেছিলেন এবং আমার বাসায় এসে আমার সাথে দেখা করেছেন, আমি তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার কথা বলেছি। তাঁর শ্রম ও প্রয়াস দেখে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত
১০নং বঙ্গ সেন লেইন
কলিকাতা-২

স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীমান সীতারাম বিশ্বাস ও শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আমার মামাতো ভাই। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মামলা কলকাতা হাইকোর্টে চালনার প্রাথমিক ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। রূপময় পাল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আমার ভাই শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তা তাঁকে বলেছি।

দীনেশ চন্দ্র সেন
১ বৈষ্ণবঘাটা, পোঃ আঃ-গড়িয়া
জেলা—চব্বিশ পরগণা।

মাস্টারদা সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন আমার গৈরলা গ্রামের বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার পথে ইংরেজ সৈন্যের হাতে বন্দী হন। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা আমি রূপময় পালকে বলেছি।

শ্রীমতী ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস
গাঙ্গুলীবাগান গভঃ কোয়াটার
ব্লক নং ১২, ফ্ল্যাট-জি-১
কলিকাতা-৪৭

বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থার মাধ্যমে শ্রীরূপময় পালের একটি চিঠি পাই। তাতে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে আমার ভূমিকার কথা তিনি জানতে চেয়েছেন। তারপর তিনি দু'তিন বার দেখাও করেছেন। বিপ্লবী সংগ্রামে আমার ভূমিকার বিষয়ে আমি তাঁকে কিছু কিছু বলেছি ও লিখেও জানিয়েছি এবং আমি শ্রীপালের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

বনবিহারী দত্ত
গাঙ্গুলীবাগান গভঃ কোয়াটার
ব্লক নং ১২, ফ্ল্যাট-জি-১
কলিকাতা-৪৭

রূপময় পাল আমার সাথে দুবার দেখা করেছেন। দু খানি চিঠি তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার কথা তাঁকে আমি বলেছি।

নগেন্দ্র চন্দ্র সেন (জুলু সেন)
১৯নং বুন্দেল রোড
কলিকাতা-১৯

শ্রীরূপময় পাল আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমার অতীত জীবনে মাস্টারদা ও চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার কিভাবে যোগাযোগ ছিল তার কিছু ঘটনা ওঁকে বলেছি।

মনোরঞ্জন রায়
১৮নং খড়চা ফার্স্ট লেন
কলিকাতা-১৯

রূপময় পাল আমার সঙ্গে চার-পাঁচ বার দেখা করেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে বহু চিঠি আদান প্রদান হয়েছে। আমি তাহাকে আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকার বিষয়ে বলেছি ও কিছু কিছু লিখে জানিয়েছি। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অনেক বিপ্লবী সাথী ও বন্ধুদের অবদানের কথা বলেছি।

অর্দ্ধেন্দু গুহ
১৪৮ ডাঃ অক্ষয় পাল রোড
কলিকাতা-৩৪

আমি আমার স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু ঘটনা রূপময় বাবুর কাছে দিলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং পূর্বে ডাকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন।

নিত্যগোপাল চৌধুরী
৪২ নং আচার্য্য প্রফুল্ল রায় রোড
কলিকাতা-৯

শ্রীরূপময় পাল আমার সঙ্গে দু'বার দেখা করেছেন। আমি আমার জেঠতুত দাদা শহিদ কৃষ্ণ চৌধুরী ও আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের নেপথ্য কাহিনী শ্রীপালকে বলেছি এবং লিখেও দিয়েছি। আমার লেখাটি প্রবীণ বিপ্লবী নেতা বিনোদ বিহারী দত্তের কাছে জমা দিয়েছিলাম, শ্রীপাল শ্রদ্ধেয় বিনোদ দত্তের কাছ থেকে আমার লেখাটি সংগ্রহ করেছেন।

গোপাল চৌধুরী
১৩ সি, আনন্দপুরী
ব্যারাকপুর
জেলা—চব্বিশপরগণা

আমার দাদা শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও আমার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের নেপথ্য ঘটনাবলী শ্রীরূপময় পালকে লিখে ডাকযোগে পাঠিয়েছি। কিছু বিবরণ প্রবীণ বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় শ্রীসরোজ গুহের মারফত শ্রীপালের কাছে পাঠিয়েছি। প্রায় দুই বছর পর্য্যন্ত শ্রীপালের সঙ্গে আমার চিঠির আদান প্রদান হয়েছে।

শ্রীসীতারাম বিশ্বাস
নীল ব্লক্ ১৭/এ
মালভিয়ানগর
নিউ দিল্লী-১১০০১৭

আমার কয়েকটি কথা—
"চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ধমান জেলা কমিটির আমন্ত্রণে ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত অনুষ্ঠানে দুর্গাপুরে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার অনেক প্রবীণ বিপ্লবী বন্ধু সেই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেই সময় আমি লেখক রূপময় পালের বাসায় তিনদিন ছিলাম। এবং শ্রীপালকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার কথা আমি সবিস্তারে বলেছি। তাছাড়া অনেক ঘটনাবলী লিখেও পাঠিয়েছি।

শ্রীহরলাল চৌধুরী
সুভাষপল্লী
খড়্গপুর

সূর্য সেনের বৌদির পত্র

লেখক রূপময় পাল ৮-১-৪৪ তারিখে আমার বাড়ীতে এসেছিলেন, আমি আমার দেওর সূর্য্য সেন (মাস্টারদা) সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। তিনি কিছু বিবরণ লিখে নিয়েছেন। আমি তাতে সই করেছি।

বিরাজ মোহিনী সেন
পোঃ অঃ প্রফুল্ল কানন
প্রফুল্ল কলোনী
কলিকাতা-৫৯

লেখক শ্রীরূপময় পালকে আমার অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে কিছু লিখে দিয়েছি এবং মৌখিকও বলেছি। লেখকের সাথে আমার সঙ্গে তিন বৎসরের পরিচিতি এবং চিঠিও আদান প্রদান করেছি। তিনি কয়েকবার আমার বাড়ীতে এসেছেন।

নির্মলচন্দ্র দত্ত
৭২।৭ দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা-৭০০০৩৫

শ্রীরূপময় পালকে চিনি প্রায় দীর্ঘ দু'যুগ ধরে। ওর নিরলস সাহিত্য-চর্চা অনুকরণ যোগ্য। বর্তমানে যে অগ্নিযুগের মহাকাব্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছে তজ্জন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই। আমি তার সাফল্য কামনা করি।

সুধাংশু সরকার
২৩।৭, কবি নবীন সেন রোড
দমদম কলি-২৮

মাননীয়
রূপময়বাবু,
আমি অত্যন্ত খুশি যে গণেশদা আপনার বইটি মহাকাব্য বলে মন্তব্য করেছেন। আমি আপনার বই দেখিনি। তবে বইটির নামটি কাব্যিক ভাবাপন্ন। তাতে গণেশদার মন্তব্য যথার্থ হয়েছে।
আমার বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। একবছরের উপর হলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি গণেশদার কাছে আছে। ...আপনার বইতে আমার নামও উল্লেখ করেছেন জেনে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুরেশ দে
২২।৪ পেটেলনগর
জামসেদপুর

আমি নোয়াখালী (বাংলাদেশ) থেকে ভারতে এসে লেখক শ্রীরূপময় পালের আমন্ত্রণে ৩১শে অক্টোবর ১৯৪৪ তারিখে বর্ধমান জেলায় আসি। শ্রীরূপময় পালের বাড়িতে পাঁচদিন থাকি। এ সময় লেখকের লেখা "সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন" বইয়ের বিশাল পাণ্ডুলিপি অতি আনন্দ সহকারে পড়ি। ...লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিটি বিপ্লবী চরিত্র জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র রায়
দুর্গাপুর-৫

যে-সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব	অনন্ত সিংহ
২। অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (প্রথম খণ্ড)	অনন্ত সিংহ
৩। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)	অনন্ত সিংহ
৪। স্মৃতিকথা	কল্পনা দত্ত
৫। চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা	সম্পাদনা শচীন গুহ
৬। সূর্য সেন স্মৃতি	বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা
৭। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী
৮। বিপ্লবী সূর্য সেন	গণেশ ঘোষ
৯। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন	মণি বাগচি
১০। মৃত্যুর চেয়ে বড়	শৈলেশ দে
১১। কারাস্মৃতি	কুন্দ প্রভা সেনগুপ্তা
১২। বিনয়-বাদল-দীনেশ	শৈলেশ দে
১৩। চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন (১৮ এপ্রিল ১৯৭৫)	বিপ্লবতীর্থ স্মৃতি সংস্থা, কলিকাতা
১৪। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৮০-৮১) স্মরণিকা	সম্পাদক-অর্ধেন্দু গুহ কলিকাতা
১৫। চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ উৎসব (১৯৮০)	সম্পাদক সাধন প্রসাদ দত্ত কলিকাতা

পরিবর্তন (১১ আগস্ট ১৯৮২), আনন্দবাজার, বঙ্গবাণী, যুগান্তর ইত্যাদি।

সূর্য অস্ত গেলো। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার নেমে আসছে। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খধ্বনি বেজে উঠলো।

এ সন্ধিক্ষণে আর দশজন কুলবধূর মতো গণেশ ঘোষের মা রোজ মাটির প্রদীপ জ্বেলে তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেন।

ঘোমটা পরা। গলায় আঁচল দিয়ে তুলসী তলায় মায়ের প্রণাম দৃশ্য দেখে বালক গণেশ ঘোষের মনে কৌতূহল জাগে। গণেশ লক্ষ্য করেন, তাঁর মা তুলসীতলায় অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করেন। আর বিড়বিড় করে কি যেন বলেন।

দীর্ঘ সময় মাকে তুলসীতলায় প্রার্থনা করতে দেখে বালক গণেশ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "মা, এতোক্ষণ ধরে রোজ তুলসীতলায় কি প্রার্থনা কর?"

মা বললেন, "তোমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।"

মায়ের জবাব শুনে গণেশের মনে প্রশ্ন জাগে, "আর কি কামনা কর?"

"প্রার্থনা করি, ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের যাতে ফাঁসি না হয়"—মা জবাব দিলেন।

ক্ষুদিরাম বস এবং কানাইলাল দত্ত সম্বন্ধে বালক গণেশ ঘোষ কিছুই জানেন না। ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের ফাঁসিই বা হবে কেন? কি তাঁদের অপরাধ? মা কেন তাঁদের ফাঁসি না হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন? শত সহস্র প্রশ্ন গণেশের মনের দুয়ারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ক্ষুদিরাম ও কানাইলালকে জানার জন্য গণেশ ঘোষ আকুল হয়ে উঠলেন। মায়ের প্রার্থনার খবর জানতে গিয়ে তিনি আর একটি জগতের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন।

গণেশ ঘোষ ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধরে এগিয়ে গেলেন। অতীতের গর্ভে ডুব দিলেন তিনি। ইতিহাস যেন তাঁর সাথে কথা কয়। তাঁর মা এখনো ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের জন্য প্রার্থনা করছেন সমানে।

গণেশ ঘোষ বললেন, "মা, অনেকদিন আগে ক্ষুদিরাম আর কানাইলালের ফাঁসি হয়ে গেছে।"

"পাগল ছেলে। তুমি কিছুই জানো না। ওঁদের ফাঁসি হতে পারে না"—অবিশ্বাসের সুরে মা বললেন।

গণেশ ঘোষ বললেন, "মা, আমি বই পড়েই জেনেছি। সত্যি বলছি। তুমি বিশ্বাস করো। এতে কোন ভুল নেই। এও ঠিক—শহিদেরা মরে না। ওঁরা অমর। ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের মৃত্যু নেই।"

মা ভাবেন, গণেশ ইস্কুলের সেরা ছাত্র। মাস্টারেরা গণেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা হলে গণেশের কথাই ঠিক। মায়ের দুচোখ ছলছল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাস এগিয়ে চলে। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গেলো। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপ নিলো। জাতীয় জীবনে নেমে এলো ঘোর

দুর্দিন। এই ঘোর করাল রূপের মধ্যে জন্ম নিলেন আধুনিক যুগের নব ভগীরথ রাজা রামমোহন রায়। তিনি সমাজ ও ধর্মের শোচনীয় অধোগতির পথ থেকে নিজের প্রতিভা বলে জাতিকে আলো ও মুক্তির নবদিগন্তে হাজির করলেন।

তারপর এলেন—যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তাঁর দান অপরিসীম। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে এ মহারথীর অবদান জাতীয় জীবনে উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "যাঁরা অতীতের জড়-বাধা লঙ্ঘন ক'রে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগরমহাশয় সেই মহারথীগণের একজন অগ্রগামী ছিলেন।"

দেশমাতৃকার বেদীমূলে অর্ঘ্য সাজাতে একে একে এলেন—সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে শোনালেন, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করলেন। জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী দেশের তরুণদের ডাক দিলেন—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।' অর্থাৎ ওঠো, জাগো।

ইতিহাস কালের সাক্ষী। মহাকাল সব ঘটনাকে নিজের বুকে ধারণ করে। প্রতিপালন করে। আপন গতি পথে ইতিহাস এগিয়ে যায়।

লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে ভারতে এলেন।

১৯০৩ সালের শেষদিকে শাসন কার্যের সুবিধের অজুহাতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দিলেন। বাঙ্গালীরা শিক্ষাদীক্ষায় এবং জাতীয়তার প্রেরণায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এতে ইংরেজদের বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। বাঙ্গালীর সংহতি ও প্রভাবকে খর্ব করার জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের চাল দিলেন। তারপর প্রায় দু বছর নীরব রইলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্ত্র শানাতে লাগলেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান বাংলাদেশ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। শহর ও গ্রামে শত শত প্রতিবাদ সভা ও মিছিল বের হয়। বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা হয়। এ ছাড়া পঁচাত্তর হাজার লোকের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র ইংল্যাণ্ডে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো হয়।

আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হলো না। ১৯০৫ সালের মে মাসে লণ্ডনের 'Standard' পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো—বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারত গভর্নমেন্টের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

১৬ অক্টোবর। ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আইন অনুসারে প্রবর্তিত হলো। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেলো। পূর্ববঙ্গের রাজসাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগসহ সমস্ত আসাম নিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম হলো—পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলার প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ নিয়ে গঠিত প্রদেশটির নাম বাংলাদেশ।

১৬ অক্টোবর ভোরবেলা কলকাতার নাগরিকেরা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে এক বিরাট মিছিল করে গঙ্গাতীরে সমবেত হলেন। গঙ্গাস্নান করে পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন। তারপর সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হলো রবীন্দ্রনাথের গান :

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।'

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে জাতিকে ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে তুললেন।

একই সুরে সুর মিলিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করলেন। তাঁদের রচিত গান জাতির অন্তরে ভাবের প্লাবন বয়ে দিলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশের মানুষ উত্তাল। এ সময়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'বসুমতী', 'অমৃতবাজার', 'বেঙ্গলী', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি একই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো।

'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র বুঝলেন, ইংরেজ সরকারকে সোজা পথে বোঝানো যাবে না। কৌশলে জব্দ করতে হবে।

১৩ জুলাই। ১৯০৫ সাল। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী পণ্য বয়কট বা বর্জন, সরকারী কর্মচারীদের সংস্পর্শ ত্যাগ এবং দেশে শোক চিহ্ন ধারণ করার প্রস্তাব দেন।

'সঞ্জীবনী' সম্পাদকের প্রস্তাব ১৬ জুলাই (১৯০৫) খুলনা জেলার বাগেরহাট গ্রামে একটি জনসভায় গৃহীত হয়। পরে আরো অনেক জনসভায় অনুরূপ প্রস্তাব নেওয়া হয়।

বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার কয়েক মাসের মধ্যেই এটি সর্ব ভারতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। দেখতে দেখতে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বম্বে, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড, মুক্তিসংগ্রাম) বইতে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১০৭) :

"স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় এবং সন্ত্রাসবাদের আরম্ভ হয়। ইহা ক্রমে ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও ১৯৪৭ সন পর্যন্ত স্বাধীনতাসংগ্রামে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলন ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই যে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের একমাত্র পন্থা ছিল এবং স্বাধীনতালাভের সমস্ত কৃতিত্ব যে মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য, এই ধারণা প্রচলিত থাকিলেও এবং অনেকের মনে বদ্ধমূল হইলেও ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে।"

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদল কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো দেখা যাক।

১৮৯৩ সাল। অরবিন্দ বিলাত থেকে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি একটি গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে আসেন। সেই সময় থেকে বাংলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে থাকেন। এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দের প্রধান সহায়ক হন। তিনি বরোদা মহারাজার দেহরক্ষী ছিলেন। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯০০ বা ১৯০১ সালে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথকে গুপ্ত সমিতি গড়ার জন্য বাংলায় পাঠান। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র নিয়ে যতীন্দ্রনাথ প্রথম কলকাতায় আসেন।

ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ১০৮ এ বা বি আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে প্রথম বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিপ্লবী সঙ্ঘ গঠন করেন।

অরবিন্দের টাকাতেই গুপ্ত সমিতি চলতে থাকে। এ ছাড়া সি. আর. দাস ও অন্যান্য লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়।

গুপ্ত সমিতির আখড়ার নাম 'অনুশীলন সমিতি'। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হতে লাগলো। অনুশীলন সমিতির শাখা গুলিতে কুস্তি, ব্যায়াম, বক্সিং, লাঠি খেলা ও ছোরা খেলা প্রভৃতি চর্চা শুরু হলো। কিছুদিন পর বারীন ঘোষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ার ফলে যতীন্দ্রনাথ চলে যান।

বাংলাদেশে বিপ্লবীদের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি'। এ পার্টির মুখপত্রের নাম—'যুগান্তর'।

১৯০৬ সালের ১৮ মার্চ 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। যুগান্তরের সম্পাদক হলেন—স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

'যুগান্তর'-এর প্রবন্ধ গুলিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা হয়। কিভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, কিভাবে বোমা তৈরি করতে হয়, কিভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়—এ সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হতে থাকে। ফলে এ কাগজ রাজরোষে পড়ে।

'যুগান্তর' প্রথমে এক হাজার ছাপা হতো। দেখতে দেখতে বিশ হাজার ছাপা হতে লাগলো।

৮ জুন। ১৯০৮ সাল। যুগান্তর পত্রিকার প্রচার বন্ধ করার জন্যই সরকার সংবাদপত্র দমনের নূতন আইন পাস করেন।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছেন, "যুগান্তরের ক্রেতার ভীড়ে রাস্তায় লোক বা গাড়ি চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম।"

যুগান্তরের সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে অভিযুক্ত হন। কারাদণ্ড ভোগ করেন। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সম্পাদক বললেন, "আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক এবং মামলার বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধের জন্য আমি একাই দায়ী। আমার সরল বিশ্বাসে দেশের প্রতি আমার যা কর্তব্য বলে মনে করেছি তাই পালন করেছি। আমি আর দ্বিতীয় জবানবন্দি দেবো না এবং বিচারাধীন মামলায় আমি আর কোনও অংশ গ্রহণ করবো না।"

বিচারে ভূপেন্দ্রনাথকে যিনি সাজা দিলেন, তিনি হলেন—চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড।

অনুশীলন সমিতির অনেক শাখা পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে স্থাপিত হয়।
১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় যান। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা গঠন করেন। এবং পুলিন দাসকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।
কলকাতার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।
১৪ অগাস্ট। ১৯০৬ সাল। 'Bengal National College and School' প্রতিষ্ঠিত হলো। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অতি সামান্য বেতনে National College-এর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এলেন। এ পদে প্রথমে ৭৫ টাকা বেতন পান। পরে ১৫০ টাকা। বরোদা কলেজে তাঁর বেতন ছিল ৭৫০ টাকা।
১৯০৭ সাল। অরবিন্দ ন্যাশনাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ ত্যাগ করেন। এবং ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য—বিপ্লববাদের প্রচার ও প্রসার।
বাংলার তরুণেরা অরবিন্দের নেতৃত্ব মেনে নিলেন। ইংরেজ সরকার স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারা ইস্কুল—কলেজের ছাত্রদের ওপর দমননীতি শুরু করলো। ফলে বিপ্লববাদ ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদের দিকে এগিয়ে চললো।
অরবিন্দ লিখেছেন, "স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকার-মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, ফলে দমননীতি শুরু হয় ভীষণ। স্কুল কলেজের ছেলেদের জরিমানা করা, বের করে দেওয়া, জেলে পোরা, শাস্তি দেওয়া, এমন কি প্রকাশ্যে বেত-মারা ইত্যাদি অত্যাচার যখন বেড়ে উঠল, তখন বিপ্লবীরা স্থির করল, এর প্রতিবিধান চাই, অর্থাৎ বিপ্লববাদ আস্তে আস্তে সন্ত্রাসবাদের রূপ নিল। বোমা তৈরির কাজ আগেই আরম্ভ হয়ে গেছে বিপ্লবের উদ্দেশ্যে, এখন দমননীতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে বারীনের দল স্থির করল তখনকার গর্ভনর ও ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা ছুঁড়ে মারবে।"
অরবিন্দ মন্তব্য করেছেন, "এসব ক্ষুদে ডাকাতি, সাহেব-মারা মোটেই আমার বিপ্লবের অঙ্গ বা অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু, যখন কোন আন্দোলন জনমতে ' ইচ্ছার অনুকূল হয় তখন তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।" [শ্রীকালীচরণ ঘোষ "জাগরণ ও বিস্ফোরণ" ২৮০ পৃঃ]
অরবিন্দ কিভাবে বিপ্লবের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন, তা জানতে হলে তাঁর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করতে হয়।
১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট অরবিন্দ ঘোষের জন্ম। তাঁর বাবা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় অভ্যস্ত। সাহেব। মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বাংলার নবযুগের প্রবর্তক। এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্‌বোধক ঋষি।
ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ছেলেকে পুরোদস্তুর সাহেব তৈরি করার জন্য শিশু অরবিন্দকে মাত্র আট বছর বয়সেই বিলাতে পাঠান।
অরবিন্দ বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ। বাংলা জানেন না। তাঁর বাবা 'Bengalee' সংবাদ

পত্র থেকে ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনী কেটে ছেলেকে পাঠান। এ সব পড়ে বালক অরবিন্দের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অরবিন্দ ভারতীয় ছাত্রদের আলোচনা সভা 'মজলিস'-এ যোগ দেন। এ আলোচনা সভায় ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বহুবার বক্তৃতা করেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি পাস করেন। পরীক্ষার অঙ্গ হিসাবে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর চাকরি হয়নি। কেউ বলেন, কেমব্রিজ 'মজলিসে' বিদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্য তাঁকে চাকরি দেওয়া হয়নি। বিলাতে Lotus and Dagger নামে এক গুপ্ত সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন।

বরোদা কলেজে চাকরি নেওয়ার পর তিনি বম্বে থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পুণায় গুপ্ত বিপ্লবী নেতা ঠাকুর সাহেবের সান্নিধ্যে আসেন। এবং বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের কল্পনা করেন। তারপর তিনি 'ভবানী মন্দির' ও 'No Comproimise' দুখানি ছোট ইংরেজী বই লেখেন।

'ভবানী মন্দির' সম্বন্ধে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আত্ম-কাহিনীতে লিখেছেন, "আমাদেরই একজন বড় কাজের কাজী 'ভবানী মন্দির' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, নিভৃত পর্ব্বত-গুহায় ভবানীর মন্দির হইবে, সেইখানে সাধনায় সিদ্ধ শক্তিমান আধারে ভগবতী বিগ্রহ হইয়া দেশকে মুক্তিযজ্ঞে দীক্ষা দিবেন। আমাদের পাগল করিবার যেটুকু বাকি ছিল, তাহা 'ভবানী মন্দির' করিয়া ছাড়িল। বইখানির লেখা যেমন অপূর্ব্ব শক্তিব্যঞ্জক, বিষয়ও তেমনি মন-প্রাণ-ভরা, তাই সেই অবধি এই নেশায় আমাদের পাইয়া বসিল।"

১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুর রোডের একটি বাগানে সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপিত হলো। বাগানে ধর্মচর্চা ও গীতা-পাঠ হতে লাগলো। পাড়ার লোক এ ধর্ম সভায় যোগ দিতে শুরু করলো। কিন্তু তলায় তলায় বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরির কাজে সফল হলেন।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। পাঁচজন বিপ্লবী একটি বোমা সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার জন্য দেওঘর গেলেন। বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিপ্লবীদের নাম হলো—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার ও নলিনীকান্ত গুপ্ত।

দেওঘর থেকে প্রায় ছ মাইল দূরে দিঘিরিয়া পাহাড়। একদিন বিকেলে পাঁচজন বিপ্লবী পাহাড়ে গেলেন। পাহাড়ের মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাথর। বোমা পরীক্ষার উপযুক্ত স্থান। পাথরটা একদিক খাড়া। অন্যদিক ঢালু।

পাথরের খাড়া দিকটির আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল চক্রবর্তী পাথরের ঢালুর দিকে বোমা ছুঁড়ার পরিকল্পনা করলেন। প্রফুল্লের পাশে উল্লাসকর। অন্যরা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন। বোমা পরীক্ষার আগে নলিনীকান্ত গুপ্ত একটা গাছে চাপলেন। গাছের ওপর থেকে তিনি এক দৃষ্টিতে পাথরটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

নলিনীকান্ত গুপ্ত "স্মৃতির পাতা" গ্রন্থে কি লিখেছেন দেখা যাক:

"...একটু দূরে একটা গাছের ওপর থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি পাথরটার দিকে—

হঠাৎ দেখি, সেখানে একটি আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল, খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে কি বিকট আওয়াজ! সমস্ত আকাশটা যেন ছিঁড়ে ফুঁড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল—শত মেঘগর্জন যেন যুগপৎ।…'সাকসেসফুল, সাকসেসফুল'—চেঁচিয়ে বলতে বলতে চেয়ে দেখি বীভৎস দৃশ্য। প্রফুল্লর মৃতদেহ উল্লাসের বুকের উপর। কপালের একটা পাশ চৌচির, তার ভিতর দিয়ে খানিকটা ঘিলু বের হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যা হয়েছিল তা এই। আমরা মনে করেছিলাম বোমাটা নীচে পড়লে শক্ত জায়গার সঙ্গে ঘর্ষণ হলে, তবে বিস্ফোরকটায় আগুন জ্বলবে। কিন্তু তা না হয়ে বিস্ফোরকটি এত জোরালো অর্থাৎ সহজে দাহ্য হয়ে উঠেছিল যে আকাশে ছোঁড়ামাত্র বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগেই তা জ্বলে উঠেছে।"

একটি তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেলো। প্রফুল্ল চক্রবর্তী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। প্রফুল্লকে চিরদিনের মতো পাহাড়ের কোলে শুইয়ে দেওয়া হলো। প্রফুল্লের এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না। প্রফুল্লর বিয়োগ ব্যথায় বিপ্লবীদের মন ভারাক্রান্ত। বিয়োগান্ত নাটকের শেষে বিপ্লবীরা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলেন।

নলিনী গুপ্ত বললেন, "আমরা এসেছিলাম পাঁচজন, ফিরে যাচ্ছি চারজন।"

বারীন ঘোষ বললেন' "No sentimentality please."

বোমার আঘাতে উল্লাসকরও আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক বিপ্লবীদের আপনজন। বিশ্বস্ত। তিনি উল্লাসকরকে দেখে বললেন, "ক্ষত আশঙ্কাজনক নয়।"

উল্লাসকর দত্ত সুস্থ হলেন।

বাংলাদেশ তথা ভারতে বিপ্লববাদ প্রসার কল্পে 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও ইংরেজী পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল তা অতুলনীয়।

'সন্ধ্যা' দৈনিক বাংলা পত্রিকা। ১৯০৪ সালের ২৬ নভেম্বর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়। সম্পাদক—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি এর আগে 'সোফিয়া' নামে ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী দর্শন ও সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত।

ব্রহ্মবান্ধব বিপ্লববাদ প্রচারের অগ্রদূত! চলতি বাঙ্গলায় লেখেন। তাঁর লেখা যুবকদের রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ ক্ষুরধার লেখনীতেই তিনি ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়েন। এবং বিদ্রোহের অভিযোগে তিনি কয়েকবার অভিযুক্ত হন।

২৬ অক্টোবর। ১৯০৭ সাল। অভিযুক্ত থাকাকালীন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' প্রতিষ্ঠা করেন। অরবিন্দ 'National College'-এর প্রিন্সিপ্যালের পদ ছেড়ে দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করলেন। তারপর 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' সম্পাদকের মতো অরবিন্দও রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হলেন।

অরবিন্দ যে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক তা প্রমাণ করার জন্য সরকার পক্ষ বিপিন পালকে সাক্ষী মানলের। বিপিন পাল সাক্ষী দিতে অসম্মত হলেন। ফলে ছ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হলো। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন!

এদিকে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকের বিচারের রায় শোনার জন্য আদালতের বাইরে জনতার ভীড়। ভীড় আয়ত্তে আনার জন্য ইংরেজ সার্জেন্ট মিঃ হুয়ে বিপ্লবী তরুণ সুশীল সেনকে বেটনের আঘাত করেন। সুশীল সার্জেন্টকে পাল্টা ঘুঁষিতে তার জবাব দিলেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সুশীলের বিচারের রায় দিলেন পনরো ঘা বেত।

মিঃ কিংসফোর্ড 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' ও 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার মতো সুশীলকেও সাজা দিলেন! হুকুম পালিত হলো।

সুশীল জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। সুশীলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য জাতীয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ পালিত হলো। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেলো। কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হলো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সুশীলকে বীরোচিত কাজের পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক প্রদান করলেন।

মিঃ কিংসফোর্ডের সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখে বাংলার বিপ্লবীরা উত্তপ্ত। সুশীলের রক্ত ঝরানোর বদলা চান। দেশবাসী প্রতিবাদে মুখর। বিপ্লবী নেতারা জনমতকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। বিপ্লবীদের বিচারে মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের সিদ্ধান্ত হলো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

অবস্থা ঘোরালো। নিরুপায়। শেষ চেষ্টা হিসেবে মিঃ কিংসফোর্ড কলকাতা থেকে বদলি হয়ে মজঃফরপুর গেলেন। বিপ্লবী নির্দেশ কথার কথা নয়। বিপ্লবীদের কাছে কলকাতা আর মজঃফরপুর আদৌ কোন সমস্যা নয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গেলেও বিপ্লবী সিদ্ধান্তের কোন হেরফের হবে না।

মিঃ কিংসফোর্ড সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করে কিছুদিন আগে প্রফুল্ল চাকী ও সুশীল সেন মজঃফরপুর থেকে ঘুরে এসেছেনে।

এ অ্যাকশনে সুশীল ও প্রফুল্লর যাওয়ার কথা। কিন্তু ক্ষুদিরামের গুরু সত্যেন বসু এবং অগ্নিযুগের দ্রোণাচার্য হেমচন্দ্র কানুনগো এ অ্যাকশনে যাওযার জন্য ক্ষুদিরামের নাম প্রস্তাব করলেন। বিপ্লবী নেতৃত্ব সুশীল সেনের পরিবর্তে ক্ষুদিরাম বসুকে নির্বাচিত করলেন।

কলকাতা থেকে মজঃফরপুর রওনা দিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। উদ্দেশ্য—মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করা। কিন্তু বিপ্লবী দুজন কেউ কাউকে চেনেন না।

ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর পরিচয় জানতে চাইলেন। প্রফুল্ল পরিচয় গোপন করে বললেন, "আমার নাম দীনেশচন্দ্র রায়। বাড়ি বাঁকীপুর। কলকাতায় দাদার কাছে থাকি।"

দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রকৃত নাম প্রফুল্ল চাকী। বাড়ি রংপুর। থাকেন মুরারীপুকুরের গুপ্ত আস্তানায়।

প্রফুল্ল চাকী তাঁর বিপ্লবী সাথীর পরিচয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিপ্লবী সঙ্গীটি জবাব দিলেন, "আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাড়ি মেদিনীপুর!"

নাম শুনেই প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামকে চিনতে পারলেন। কেন না কিছুদিন আগে ক্ষুদিরামের নামে পুলিশ মামলা করেছিল। সেই খবর প্রফুল্লর জানা।

ঘটনার ছ-সাত দিন আগে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল মজঃফরপুরে ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তারপর তাঁরা মিঃ কিংসফোর্ডের গতিবিধির খবরাখবর নিতে থাকেন।

ধর্মশালা থেকে জেলা জর্জ মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলো খুব একটা দূরে নয়। বাংলোয় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন। সেখানে ঢুকে জেলা জর্জকে হত্যা করা যাবে না। উপায় ?

একদিন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল ঘুরতে ঘুরতে আদালতে গিয়ে হাজির। আদালতে লোকের ভীড়। তাঁরা জনতার ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। দেখতে পেলেন, মিঃ কিংসফোর্ড বিচারকের আসনে বসে আছেন।

আদালত কক্ষ লোকে লোকারণ্য। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা বোমা, চার্জ করার কথা ভাবলেন। আবার চিন্তা করলেন, মিঃ কিংসফোর্ডকে বোমা ছুঁড়ে মারলে অনেক নিরপরাধ লোকের প্রাণনাশ হবে। অগত্যা তাঁরা ফিরে এলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর বিপ্লবীরা আবিষ্কার করলেন মিঃ কিংসফোর্ড রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে যান। ফেরেন রাত সাড়ে আটটায়। বাংলো থেকে ক্লাব অতি নিকটে। এইতো সুযোগ। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে।

৩০ এপ্রিল। ১৯০৮ সাল। বৃহস্পতিবার। অমাবস্যার রাত। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল শিকারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন।

রাত সাড়ে আটটায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে বের হয়ে, মিঃ কিংসফোর্ডের বাংলোর ফটকের কাছে আসতেই ক্ষুদিরাম গাড়িটাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়লেন। বোমার আঘাতে গাড়িটা চুরমার হয়ে গেলো। সেই গাড়িতে ছিলেন মজঃফরপুরের বড় উকিল মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা। তাঁদের মৃত্যু হলো।

মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ি এবং মিঃ কেনেডির গাড়ি দেখতে একই রকম। তাছাড়া অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধকারে মিঃ কেনেডির গাড়িকে মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল এই ভুলটা করলেন।

মজঃফরপুরের উকিল এবং 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা উপেন্দ্রনাথ সেন 'ক্ষুদিরাম' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "গিয়া দেখি, তাঁহার (মিঃ কিংসফোর্ড) বাংলোর গেটের কাছে রাস্তার উপর খানিকটা স্থান ঘিরিয়া আট-দশটি পুলিশ পাহারা দিতেছে। মধ্যখানে ধুলায় মেশানো রক্ত জমাট বাঁধা, তাহার উপর মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে। জজ-সাহেবের এবং কেনেডি সাহেবের গাড়ি দেখিতে একই রকম ছিল। আততায়ীরা জজের গাড়ি নির্বাচন করিতে ভুল করিয়াছিল।"

বোমা ছোঁড়ার পর প্রফুল্ল চাকী দৌড়লেন—বাঁকীপুরের দিকে। ক্ষুদিরাম দৌড়লেন—সমস্তিপুরের দিকে। কিন্তু বিপ্লবীদের জুতো ঘটনাস্থলে ঘটনার সাক্ষী হয়ে পড়ে রইলো। খালি পায়ে আততায়ীরা চলেছেন, এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

ক্ষুদিরাম রেলপথের ধারে ধারে সারা রাত হাঁটলেন। পরদিন ভোরে ওয়াইনী স্টেশনে (অধুনা পুশা রোড রেল স্টেশন) পৌঁছলেন। মজঃফরপুর থেকে ওয়াইনী রেল স্টেশনের দূরত্ব প্রায় চব্বিশ মাইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে তিনি ক্লান্ত।

ওয়াইনী স্টেশনে এক মুদির দোকানে জল খাচ্ছেন। কাছেই দুজন পুলিশ। নাম—ফতে সিং ও শিবপ্রসাদ মিশ্র। ক্ষুদিরামকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। সারা রাতের ক্লান্তি ক্ষুদিরামের সমস্ত শরীরে লেপটে আছে। পায়ে জুতো নেই ধুলায় ধূসরিত পা।

অবস্থা বেসামাল দেখে ক্ষুদিরাম পলকে পকেট থেকে রিভলবার বের করতে চেষ্টা

করলেন। রিভলবার বের করা তাঁর আর হয়ে উঠলো না। তার আগেই পুলিশ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

১লা মে। ১৯০৮ সাল। সময়—সকাল ন'টা। স্থান—ওয়াইনী রেল স্টেশনের এক মুদির দোকানে ক্ষুদিরাম বন্দী হলেন। তাঁর কাছে পাওয়া গেলো—দুটি রিভলবার, ত্রিশটি বুলেট, তিনটি দশটাকার নোট, কিছু খুচরো পয়সা আর টাইম-টেবিলের একটি ছেঁড়া পাতা।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর ক্ষুদিরামকে রেল গাড়িতে করে মজঃফরপুরে আনা হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উডম্যানের কাছে ক্ষুদিরাম কি বিবৃতি দিয়েছেন দেখা যাক ঃ

"আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাড়ি মেদিনীপুর।...আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছি বলিয়া আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে।

"দীনেশের সঙ্গে আমার হাওড়ায় দেখা হয়। তাহার সঙ্গে একটা বোমা ছিল। সে বোমা তৈয়ার করিতে পারিত।

"আমার সঙ্গে ২টা রিভলবার ও কতকগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭।৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুর পৌঁছিয়া ধর্মশালায় অবস্থান করিতেছিলাম। ধর্মশালার নিকটে কিশোরীবাবুর বাসায় থাকি।

"আমরা সর্বদা কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম, কিংসফোর্ড কুঠি হইতে কয়েক গজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল তাহাতে অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলাম।

"৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ডের গাড়ি কখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ি আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

"আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম। ওয়াইনি স্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন দুইজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে।

"কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম। যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।" [সঞ্জীবনী ঃ ৭ই মে, ১৯০৮]

মজঃফরপুরে বোমা ছোঁড়ার পর প্রফুল্ল চাকী হাঁটতে হাঁটতে সমস্তিপুর এসে পৌঁছলেন। মজঃফরপুর থেকে সমস্তিপুরের দূরত্ব প্রায় বত্রিশ মাইল।

এতো দূরে গিয়েও প্রফুল্ল চাকী বিপদ এড়াতে পারলেন না। বিপদ ছায়ার মতো তাঁকে

অনুসরণ করে চলেছে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তিনি নূতন কাপড় ও নূতন জুতো কিনে পরলেন কিন্তু ভাগ্যদেবতা তাঁর প্রতি বিমুখ।
নূতন কাপড় ও জুতোই হলো কাল। সমস্তিপুরে প্রফুল্লের নূতন কাপড়, জুতো ও ফুলো পা দেখে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ হয়।
ছুটিতে নন্দলাল গিয়েছিলেন মজঃফরপুর। দাদুর বাড়িতে। দাদু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মজঃফরপুরের গভর্নমেন্ট উকিল।
রাতের ট্রেনে প্রফুল্ল চাকী সমস্তিপুর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। একই কামরায় নন্দলালও উঠলেন। বাঙালী সহযাত্রী হিসেবে তিনি প্রফুল্লের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললেন। দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন গভীরভাবে। দেশপ্রেমী ভেবে প্রফুল্ল নন্দলালকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন।
স্টীমার হতে ট্রেনে উঠবার সময় নন্দলাল কুলি কুলি করে হাঁকছেন। প্রফুল্ল কুলি নিতে বারণ করলেন। প্রফুল্ল সঙ্গে সঙ্গে নন্দলালের মালগুলো কাঁধে তুলে নিলেন।
এ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিদান প্রফুল্ল পেলেন হাতে হাতে। মোকামাঘাট স্টেশনে পৌঁছে নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে ঘটনাটা জানালেন। পরের অধ্যায় বড়ই মর্মান্তিক।
প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্মে আসামাত্র নন্দলাল একজন পুলিশকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। প্রফুল্লের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।
প্রচণ্ড আক্রোশে প্রফুল্ল চিৎকার করে বললেন, "তমি বাঙালী হয়ে আমাকে বন্দী করছ ?"
একজন পুলিশ পেছন থেকে প্রফুল্লকে জাপটিয়ে ধরলো। কৌশলে তিনি পুলিশকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। কিন্তু আর একজন পুলিশ তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। পুলিশকে লক্ষ্য করে তিনি পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। নিরুপায় দেখে দুবার নিজের দেহে গুলি করলেন। দেখতে দেখতে প্রফুল্লের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের যবনিকা পড়ে গেলো।
'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৪।৫।১৯০৮) সংবাদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ
"...নন্দলাল স্টেশন মাস্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল এবং প্রফুল্ল প্ল্যাটফর্মে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবলকে হুকুম দিল, গ্রেপ্তার কর। প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চিৎকার করিয়া বলিল—'তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ ?'
"একজন কনস্টেবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনস্টেবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হটিয়া গেল।
"তৎক্ষণাৎ অপর একদিক হইতে আর একজন কনস্টেবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনস্টেবলের দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।
"এদিকে ভূপাতিত কনস্টেবল আবার অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পালাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল।

পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপাতিত হইল।"

৩০ এপ্রিল। ১৯০৮ সাল। মজঃফরপুরে বোমা ছোঁড়া হলো। ১ মে ক্ষুদিরাম বন্দী হলেন। একই তারিখে প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাট রেল স্টেশনে আত্মহত্যা করলেন।

ঘটনা দ্রুতলয়ে এগিয়ে চললো। অরবিন্দ তাঁর ছোট ভাই বারীনের কাছে সর্তকতামূলক নির্দেশ পাঠালেন। মুরারীপুকুর বাগানের আপত্তিজনক সব কিছু যাতে তাড়াতাড়ি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়।

অরবিন্দের অনুমান অমূলক নয়। ২ মে ভোররাতে পুলিশ এসে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি থেকে বারীন ঘোষ ও তাঁর অনুগামীদের ছেঁকে তুলে নিলেন। মাটি খুঁড়ে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হলো। তারপর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

একই তারিখে ভোর ৫টায় ৮ নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়ির দোতলা থেকে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন।

মুরারীপুকুর বাগানবাড়িতে যাঁরা বন্দী হয়েছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁদের মধ্যে একজন। 'স্মৃতির পাতা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

"শ্রীঅরবিন্দের বাসায় দুই তিনটি রাইফেল ছিল তা আনা হল। এগুলি এবং যে-ক'টি রিভলবার ছিল এবং বোমার সাজসরঞ্জাম সব, লোহার পাত দিয়ে তৈরি দু'টি বাক্সের মধ্যে পুরে মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয়। তারপর কাগজপত্র নামধাম প্ল্যান প্রভৃতি যার মধ্যে আছে যথাসাধ্য সব অগ্নিসৎকার করা হল, অনেক রাত্রি অবধি। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি—অনেক নাম ছিল, তা ধরে খোঁজ করে পুলিশ অনেককে অনেক জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পরে।...যতটা সম্ভব শেষ করে আমরা শুয়েছি, কল্পনা—ভোর হতে না হতেই দেব সব ছুট।"

ছত্রিশ জন বিপ্লবীর বিচার শুরু হলো।

১৯০৮ সালের ৪ মে। দলের প্রধান সংগঠক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ইচ্ছে করে স্বীকারোক্তি দিলেন। ফলে বিপ্লবীদলের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। নরেন গোঁসাই তখনো পুলিশের কাছে সন্দেহ মুক্ত। স্বীকারোক্তির পর নরেন গোঁসাই বন্দী হলেন। কিন্তু বারীন ঘোষ তাঁর সেজদা অরবিন্দের সম্বন্ধে সবকথা বেমালুম চেপে গেলেন।

বারীন ঘোষ 'আত্ম-কাহিনী' গ্রন্থে এ বিষয়ে জবাবদিহি করেছেন ঃ

"আমাদের দফা ত এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কী করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার...

"এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে।...আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে বুঝি, এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না।...খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে সময়ে নরেন গোঁসাই-এর নাম বলা হইয়াছিল।"

নরেন গোঁসাইও ধরা পড়ার পর পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিলো। বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তিকে বারীন ঘোষ জলাঞ্জলি দিলেন। বারীনের মাথায় যেভাবে খুন চাপলো তেমনি নরেনের

রক্তও উজান বেয়ে চললো। তাই নরেন পুলিশের কাছে বিপ্লবীদলে অরবিন্দের সক্রিয় ভূমিকার বিবরণ দিলো।

'কারাকাহিনী' গ্রন্থে অরবিন্দ লিখেছেন (পৃঃ ৩৩-৩৪) ঃ

"গোঁসাইয়ের কথা নির্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসে পূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই অ্যাপ্রুভার হয়।"

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে—দুটি। একটি মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের মামলা। অন্যটি মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর আলিপুরে বোমার মামলা।

প্রফুল্লের মৃতদেহ দেখে শোকে অধীর হয়ে ক্ষুদিরাম বলেছেন, এ "আমার বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়।"

ক্ষুদিরামের বোমার শব্দে ভারতবাসী যেন শতাব্দীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সকলের নজর ক্ষুদিরামের মামলার দিকে। বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ।

ক্ষুদিরামের পক্ষে মামলা পরিচালনা করলেন মজঃফরপুরের দেশপ্রেমিক উকিল কালিদাস বসু। ক্ষুদিরামকে বাঁচাবার জন্য দুজন উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রংপুর থেকে মজঃফরপুরে ছুটে এলেন।

শুরু হলো বিচার। আদালত কক্ষে লোক ধরে না!

প্রথম দিনেই সাক্ষী দিলো বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্ল চাকীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নন্দলাল নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা করলো। পরিশেষে বললো ঃ

"সেই রাত্রেই মৃতদেহ নিয়ে আমি মজঃফরপুরে ফিরে যাই। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং পাটনার পুলিশ সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বারুণী স্টেশনে মৃতদেহের ছবি তোলা এবং সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।"

পরদিন ১০ মে ১৯০৮ সাল। সাক্ষী দিতে এলেন মিঃ কিংসফোর্ড। তিনি জানালেন ঃ

"রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত পত্রিকা 'যুগান্তর' আমার নিকট ৩ বার, 'বন্দেমাতরম' ১ বার ও 'নবশক্তি' ১ বার অভিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল মোকদ্দমার পূর্বে ও পরে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমার পর আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা খুব বৃদ্ধি পায়।

"কলিকাতার ছাত্রগণ আমার প্রতি কিভাব পোষণ করিত, তাহা আমি জানি না। দুইবার আদালত হইতে বাহির হইবার সময় রাস্তায় কতকগুলি লোক আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই সব লোকের ভিতর কতকগুলি ছাত্র এবং কতগুলি অপর লোক তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও ছিলাম, সেখানে কেহ আমাকে অসম্মান করিয়াছে বলিতে পারি না" [সঞ্জীবনী ঃ ১৮ জুন ১৯০৮]

তিন-চারদিন সাক্ষীদের জবানবন্দী, জেরা ও বক্তৃতা শেষ হবার পর বিচারে ক্ষুদিরামের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। মামলার রায় শুনে ক্ষুদিরাম কি রকম শান্ত ছিলেন তা 'সঞ্জীবনী' (১৮ জুন ১৯০৮) পত্রিকার কিছুটা অংশ তুলে নেওয়া হলো।

"মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকারভাব লক্ষ্য

করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয় বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, *আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝতে পারে নাই। এই ধারণার* বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?

"ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'বুঝিয়াছি'।"

তারপর ক্ষুদিরাম জজকে বললেন, "একটা কাগজ পেন্‌সিল দিন। আমি বোমার চেহারাটা এঁকে দেখাই। অনেকের ধারণা নেই, ও বস্তুটি কি রকম দেখতে।"

জজ ক্ষুদিরামের অনুরোধ মঞ্জুর করলেন'না।

পরের অধ্যায় হাইকোর্টে আপিল। ক্ষুদিরাম আপিল করতে আপত্তি জানালেন।

বললেন, "চিরজীবন জেলে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

উকিল কালিদাস বসু ক্ষুদিরামকে বাৎসল্য স্নেহে বুঝালেন, "দেশে এমনও ঘটনা ঘটতে পারে, তোমায় বেশিদিন জেলে থাকতে না হতেও পারে।"

অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন, পিতৃতুল্য কালিদাস বসুর স্নেহের দাবীকে উপেক্ষা করা যায় না ক্ষুদিরাম দরদী হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

কালিদাস বসু ক্ষুদিরামের কাছে যেন মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধ সরোবর।

আপিলেও ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে যে দুজন বাঙালী উকিল উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম— ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ সেন।

উপেন্দ্রনাথ সেন 'ক্ষুদিরাম' প্রবন্ধে লিখেছেন :

"১১ আগস্ট (১৯০৮) ফাঁসির দিন ধার্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব…উডম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুজন মাত্র বাঙালী ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবে। আর শব বহন করিবার জন্য বারোজন, শবের অনুগমনের জন্য বারো জন থাকিবে। ইহারা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে যাইবে।

"ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল অনুমতি পাইলাম। আমি তখন 'বেঙ্গলী' কাগজে স্থানীয় সংবাদদাতা।…

"ভোর ছয়টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ির মাথায় খাটিয়াখানি ও অবশ্যকীয় সৎকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে।

"সহজেই আমরা দুজনে জেলের ভিতর প্রবেশ করিলাম।…দ্বিতীয় লোহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ।

"দুই দিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড বা আড়দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটা ফাঁস!

"একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটা ঠিক বলা হইল না। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে। আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল।

শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যুষে উঠিয়া, স্নান করিয়া, কারবাসকালীন বর্ধিত চুলগুলি আঙুল দিয়া বিন্যাস করিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল।

"আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল।

"ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিক ওদিক একটুও নড়িল না। উডম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপাশে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল।

"ক্ষুদিরাম নিচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

..."কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পাশে কিছু দূর অন্তর পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে। অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল, শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। একটি ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিশ শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল।

"চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম। দেখিলাম মস্তকটি মেরুদণ্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ-বেদনা-ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন।

"তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত রহিল।

"দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালাযন্ত্রণা বোধ করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

"আমরা শ্মশানবন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিতে গেলে পুলিশ প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া মনের ভার খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটোয় কিছু চিতাভস্ম কালিদাসবাবুর জন্য।...

"ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম-দগ্ধ শ্বেত চিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতর অম্লান আছে তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি।"

ক্ষুদিরামের ফাঁসি সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় ১২ আগস্ট, ১৯০৮ প্রকাশিত সংবাদ ঃ

"মজঃফরপুর, ১১ আগস্ট—অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ়-পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাসিতেছিল।"

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি...'

অজ্ঞাত কবির কালজয়ী গানটি আজো মানুষের মনে রেখাপাত করে। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল

চাকীর নামে অনেক গান ও কবিতা লেখা হয়েছিল। সেই সব গানের অংশ কাপড়ের পাড়ে বোনা হতো। সরকার তা বন্ধ করে দেয়।

ক্ষুদিরামের চিতার আগুন নিবতে না নিবতেই সবার অলক্ষ্যে আরো তিনটি চিতার আয়োজন চলতে লাগলো।

নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তির পর ঘটনার গতি অন্যদিকে মোড় নিলো। অরবিন্দের বিপদে বিপ্লবীরা দিশেহারা, তাঁদের এক কথা—যে কোন মূল্যেই অরবিন্দকে বিপদ মুক্ত করতে হবে।

ইতিমধ্যে বারীন ঘোষ আলিপুর জেলের মধ্যে গোপনে রিভলবার নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। জেলের মধ্যেই রিভলবার লুকিয়ে রাখলেন। তাঁর অজ্ঞাতে রিভলবার দুটি কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর হাতে এসে গেলো।

এদিকে সতর্কতা হিসেবে নরেনকে আলিপুর জেলে ইউরোপীয়ান অভিযুক্তদের ওয়ার্ডে নিয়ে গেলো। ২৩ জুন তার বিরুদ্ধে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে।

কানাই ও সত্যেন ভাবলেন, নরেনকে বাগে পাওয়া যায় কি করে?

পরিকল্পনা মতো অসুখের অজুহাতে সত্যেন জেল হাসপাতালে ভরতি হলেন। তিনদিন পর পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে কানাইও গেলেন হাসপাতালে।

সত্যেন পুলিশকে স্বীকারোক্তি করার আভাস দিলেন। এবং নরেনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। পুলিশ ফাঁদে পা দিলো। নরেন জেল হাসপাতালে এসে দুবার দেখা করলো। ঘটনা পরিণতির দিকে এগিয়ে চললো দ্রুতলয়ে।

৩১ আগস্ট। ১৯০৮ সাল। সকাল ৭ টা। এক ফিরিঙ্গী ওয়ার্ডার নরেনকে নিয়ে হাসপাতালে এলো। দোতলায় সত্যেনের ঘরের সামনে অপেক্ষা করছে নরেন। এ সময় কানাই নরেনকে গুলি করেন। আহত অবস্থায় নরেন ছুটতে থাকে। সত্যেন ও কানাই নরেনের পিছু ধাওয়া করেন। দ্রাম! দ্রাম! শব্দে রিভলবার গর্জে উঠলো।

হাসপাতালের গেটের কাছে ওয়ার্ডারেরা সত্যেন ও কানাইকে ধরে ফেলে। কানাই তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে আর একটি মাত্র গুলি তাঁর রিভলবারে অবশিষ্ট আছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, ক্ষণিকের বিলম্বে নরেন রিভলবারের পাল্লার বাইরে চলে যাবে।

কোনরকমে ডান হাতটি মুক্ত করে নিয়ে কানাই তাঁর শেষ গুলিটি নরেনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন—দ্রাম!

কানাইয়ের শেষ গুলিতে নরেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

বিচারে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসির হুকুম হয়। ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়। সত্যেন বসুর ফাঁসি হলো একই বছরে একই মঞ্চে ২১ নভেম্বর।

নরেন গোঁসাইকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা প্রবাহ আলিপুর জেলে ঝড়ের গতিতে ঘটে গেলো তা বারীন ঘোষ 'আত্মকথা' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃ-৮৫-৮৭):

"আমি জানিতাম না যে, ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে।...কাঁচা লীডারের যাহা সচরাচর

হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদ্রূপই ছিল ; বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের। সবাইকে লইয়া কাজ করিতাম বটে, কিন্তু আপন গোঁয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া ছেলেদের কাহারও কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের ভাব যে দেখা দিয়েছে, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই যে আমাকে বাদ দিয়া, অন্ততঃ আমাকে না বলিয়া তাহারা একটা কিছু করিবে।"

১৯ অক্টোবর, ১৯০৮ সাল। আসামীর কাঠগড়ায় অরবিন্দ ও তাঁর অনুগামী বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে আছেন। এ মামলায় আসামী মোট ছত্রিশ জন। শুনানী আরম্ভ হলো।

বিচারকের আসনে বসে আছেন দায়রা জজ মিঃ সি. পি. বীচক্রফ্‌ট। মিঃ বীচক্রফ্‌ট ছিলেন ইংলণ্ডে অরবিন্দের সহপাঠী। আসামীদের পক্ষে প্রথমে নিযুক্ত হলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী। আসামীদের পক্ষে এতো বড় ব্যারিস্টারের খরচ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। তারপর মামলা পরিচালনার ভার নিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

'মানুষ চিত্তরঞ্জন' বইতে চিত্তরঞ্জন দাশের মেয়ে অপর্ণা দেবী এ সম্বন্ধে লিখেছেন :

"কারণ মামলা পরিচালনা করবার অর্থ নিঃশেষিত হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর মত বিচক্ষণ ব্যারিস্টারকে আর নিযুক্ত করা সম্ভব হলো না। এবং তিনিও থাকতে চাইলেন না। তখন অরবিন্দের তরফ থেকে 'বন্দে মাতরম্‌'-এর কর্মিগণ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র বাবাকে এসে এ মামলা পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন। (পরে) উল্লাসকরের জননী এসে পিতৃদেবকে এ মামলা চালাতে বললেন—'আমি শুধু আমার ছেলের জন্য আসি নি, সব ছেলেদের বাঁচাবার ভার তুমি নাও, বাবা'। এরপর বাবা প্রথমে নামমাত্র পারিশ্রমিকে মামলা আরম্ভ করলেন।"

৬ মে, ১৯০৯ সাল। বিচারের রায় দেওয়া হলো। অরবিন্দ এবং আরো যোলজনের মুক্তি। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির আদেশ। দশজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তিন জনের দশ বছর দ্বীপান্তর। তিনজনের সাত বছর এবং একজনের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

এবার দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীলের পালা। আপীল করা হলো।

২৩ আগস্ট ১৯০৯ সাল। দুজন জজ মিঃ জেনকিন্স এবং মিঃ কার্নডাফ রায় দিলেন : ফাঁসি রদ হলো। ফাঁসির পরিবর্তে বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মোট চার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তিন জনের দশ বছরের দ্বীপান্তর। তিন জনের সাত বছরের দ্বীপান্তর। এবং দুজনের পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

অবশিষ্ট পাঁচজনের সম্বন্ধে বিচারকদের মতের অমিল দেখা দিলো। ফলে তৃতীয় জজ মিঃ রিচার্ড হ্যারিংটনের পুনর্বিচারে তিনজনের মুক্তি হয়। দুজনের মধ্যে একজনের সাত বছর দ্বীপান্তর। অন্য জনের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলো। আন্দোলন চলতে লাগলো বছরের পর বছর। বঙ্গভঙ্গের জ্বালা বাঙালীরা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এ জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলছে।

১৯১০ সাল। নভেম্বর মাস। ভারতের শাসন-বিভাগে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলো। ভারত সচিব মর্ণ্টেগু পদত্যাগ করলেন। তার জায়গায় এলেন লর্ড ক্রু।

বড়লাট লর্ড মিণ্টোর কার্যকাল শেষ। ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলা দেশের রাজনীতিক গোলমাল ও সন্ত্রাসবাদের অবস্থা পরিদর্শন করে মন্তব্যে লিখলেন—ছোটলাট সার এডওয়ার্ড বেকার এবং তাঁর আইনজ্ঞ পরামর্শদাতাদের অবিবেচকের মতো কাজেই সরকারের প্রতিপত্তি কমেছে। দেশের অরাজকতা বেড়েছে। এ ছাড়া যে সব রাজদ্রোহের অভিযোগ এ পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন আছে তা এক বছরে বিচার শেষ করা অসম্ভব। অধিকাংশ অভিযোগে অভিযুক্তকে আদালতে দোষী প্রমাণ করা কঠিন। এক বছরের মধ্যে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে আসবেন। দেশে শান্তি আনা একান্তই অবশ্যক। ভবিষ্যতে বড়লাটের অনুমোদন ব্যতীত কোন রাজনীতিক অপরাধের অভিযোগ আনা চলবে না। অপরাধ প্রমাণিত হবে না এমন সব অভিযোগ তুলে নিতে হবে।

এটি লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর লিখিত মন্তব্যের মর্মার্থ।

১৯১১ সাল। ১২ ডিসেম্বর। দিল্লীর দরবারের সমাপ্তিকালে ভারত সম্রাট দুই বাংলা এক হবার কথা আর কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

বঙ্গভঙ্গের অবসানে দেশবাসী আনন্দিত। কিন্তু রাজধানী দিল্লী নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শুনে অসন্তুষ্ট।

২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল। দিল্লী মহানগরী নূতন সাজে সজ্জিত। মোগল বাদশাহের ধাঁচে সিংহাসনে আরোহণ করবেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। সিমলা থেকে ট্রেনে তিনি সস্ত্রীক দিল্লী এলেন। বড়লাটের আগমণ বার্তায় দিল্লী যেন গোলাপী হাসি হাসছে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। রাস্তার দুধারের বাড়ি গুলির ছাদে ও বারান্দায় ভীড় আর ভীড়।

বড়লাটকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছেন ভারতের রাজা, মহারাজা ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীগণ এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

বিরাট মিছিল। মিছিলের পুরোভাগে হাতির পিঠে বিরাট হাওদায় সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। একজন ছত্রধর তাঁদের মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে। আরো প্রায় পঞ্চাশটি সুসজ্জিত হাতি শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

মিছিল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বড়লাটের হাতি চাঁদনীচকে ঘড়িঘরের কাছে এসে পড়েছে। এমন সময় কানে তালা লাগার মতো এক বিরাট শব্দ হলো।

ধোঁয়া আর ধোঁয়া। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। সে সময় সাধারণ মানুষের বোমা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ধোঁয়া সরে গেলে বোঝা গেলো—শব্দটা বোমা—বিস্ফোরণের। পরের দৃশ্য বড়ই করুণ। ছত্রধারী বোমার আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। বড়লাট গুরুতর আহত। হাওদার কিছু অংশ বোমায় গ্রাস করে নিয়েছে। লাটসাহেবের স্ত্রী হাওদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি অক্ষত। এখানেই দৃশ্যের শেষ নয়। এ ছাড়া বোমায় আরো দুজনের প্রাণ ছিনিয়ে নিলো।

জনতা ছত্রভঙ্গ। বড়লাট কিছুক্ষণ পর জ্ঞান হারালেন। মোটর গাড়িতে করে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো।

আততায়ী উধাও। ঘোষণা করা হলো আততায়ীকে ধরে দিতে পারলে লক্ষ টাকা পুরস্কার। গুপ্তচরদের চোখে ঘুম নেই। ঝানু ঝানু গোয়েন্দাদের শত চেষ্টাতেও এ ঘটনার কোন কূলকিনারা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এভাবে মাসের পর মাস চললো। বছর ঘুরে আসতে মাত্র একত্রিশ দিন বাকি।

২১ নভেম্বর, ১৯১৩ সাল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার পুলিশ, পলাতক আসামী অমৃতলাল হাজরার সন্ধানে বের হয়েছে। ১৯৬/১ আপার সার্কুলার রোডের একটা গোপন আস্তানায় পুলিশ গিয়ে হাজির। বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরা বন্দী হলেন। তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য। অমৃতলালকে ধরতে গিয়ে পুলিশ বোমার কারখানা আবিষ্কার করে ফেললো।

বিপ্লবীদের গোপন আস্তানাটি প্রকৃতপক্ষে বোমার কারখানা। ভাগ্যের জোরে ধরা পড়লেন না, প্রবর্তক সংঘগুরু বিপ্লবী নায়ক মতিলাল রায়ের সহকর্মী মণীন্দ্র নায়েক। তিনি একজন বোমা বিশারদ। তাঁর তৈরি বোমা দিল্লীর চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর ছোঁড়া হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন অমৃতলাল হাজরা ও মণীন্দ্র নায়েক মিলে এই আস্তানায় উচ্চমানের বোমা তৈরি করেন। সেদিন বোমা কারখানার কাছাকাছি গিয়ে এক অমঙ্গল আশঙ্কায় মণীন্দ্র নায়েক বাড়ি ফিরে গেলেন। তাঁর বাড়ি চন্দননগর।

পুলিশ বোমার খোল দেখে বিস্মিত হলো। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতি দিল্লীতে ছোঁড়া বোমের খোল আর এ খোলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আরো তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেলো একখানা সাঙ্কেতিক লেখা কাগজ।

শৈলেশ দে সম্পাদিত 'অগ্নিযুগ' সঙ্কলন গ্রন্থে মণীন্দ্র নায়কের প্রবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো (অগ্নিযুগ ঃ পৃ-৪১-৪২) ঃ

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লী চাঁদনীচকে, চন্দননগরে আমার দ্বারা প্রস্তুত বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার পর আমি কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে অমৃতলাল হাজরার সাহায্যে আরও উন্নত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বোমা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করি, এবং আমি সেখানে নিয়মিত যাইয়া অমৃতলাল হাজরাকে সাহায্য করিতাম। তিনি নিজেই লোহার খোল ঢালাই করিতেন এবং তাহার মধ্যে মালমসলা দিয়া আমি তাঁহাকে বোমা তৈয়ারীর বিষয়ে সাহায্য করিতাম।

"১৯১৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের সন্ধ্যায় সেখানে যাইতে যাইতে কলিকাতায় তাঁহার বাসার নিকটবর্তী আমহার্স্ট স্ট্রীটে পৌঁছিয়া ভিতর হইতে নির্দেশ পাইলাম যে, আজ সেখানে না যাইয়া আমাকে চন্দননগরে চলিয়া যাইতে হইবে, আমি তাহাই করিলাম।

"পরদিন সকালেই সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, অমৃত হাজরার বাসায় খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং সেখান হইতে বোমা তৈয়ারীর মালমসলা পাওয়া গিয়াছে। অমৃতলালকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।"

সাঙ্কেতিক লেখাটাই হলো কাল। অমৃত হাজরাকে অনেক জেরা করেও পুলিশ কোন কথা বের করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ডি, আই, জি, মিঃ ডেনহাম রহস্য উদ্ঘাটন করলেন। কাগজে লেখা রয়েছে 'দিল্লীর সেণ্ট জোসেফ ইস্কুলের শিক্ষক আমীরচাঁদ।'

একে একে ধরা পড়লেন - আমীরচাঁদ, দীননাথ তলোয়ার, বসন্ত বিশ্বাস, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী প্রমুখ সবাই।

কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লী-ষড়যন্ত্রের নেতার নামও প্রকাশ হয়ে পড়লো। তাঁর নাম—রাসবিহারী বসু। বড় বড় সাহেব সুবোদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা। পরিচিত মহলে তিনি একজন রাজভক্ত কর্মচারী। অনেকের দৃষ্টিতে তিনি একজন গুপ্তচর। পুলিশ রিপোর্টেও তাই।

'...It is the general belief there amongst the Bengali community that Rash Behari was a police spy and used to supply information to the C.I.D. officer.' [The Weekly Report of the Intelligence Branch, Bengal dated July 20, 1914. Quoted by Two Great Indian Revolutionaries : Uma Mukherjee.]

রাসবিহারী বসু গা-ঢাকা দিলেন। পুলিশ পলাতক রাসবিহারীকে হন্যে হয়ে সারা ভারত খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

রাসবিহারীর জন্ম—১৮৮৬ সাল। আদি নিবাস বর্ধমানের সুবলদহ গ্রাম। মতান্তরে রাসবিহারীর জন্ম পারালা—বিঘাটি মামার বাড়িতে।

বাবার নাম—বিনোদবিহারী বসু। মায়ের নাম—ভুবনেশ্বরী। রাসবিহারীর জন্মের তিন-চার বছরের মধ্যে ভুবনেশ্বরী মারা গেলেন।

বিনোদবিহারী আবার বিয়ে করেন। তিনি সিমলা কমিশরিয়েট ছাপাখানায় চাকরি করতেন। আনুমানিক ১৮৯০ সালে তিনি চন্দননগরের ফটকগোড়ায় স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

ছোটবেলায় ইস্কুলের একজন শিক্ষকের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ থেকে রাসবিহারীকে বের করে দেন। তারপর কলকাতার মর্টন ইস্কুলে ভর্তি হন।

ছাত্রজীবনেই রাসবিহারী বিপ্লবীদলের সদস্য হন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কেরানীর চাকরি নেন।

নিজের প্রতিভাবলে রাসবিহারী বসু কিভাবে ভারতের বিপ্লবীদলের নেতা হলেন সেই সম্বন্ধে 'Chittagong Uprising Golden Jubilee' স্মারক পুস্তিকায় "উপেক্ষিত রাসবিহারী' প্রবন্ধে নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন :

"সেখানে ইতিপূর্বেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তিলক মহারাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লবী হরদয়াল উত্তর ভারতে বিপ্লবের বীজ বপন করেন। পুলিশ পিছনে লাগায় হরদয়াল ১৯০৮ সালে ভারত ত্যাগ করেন—যাওয়ার সময় নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে যান জিতেন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের উপর। একই ভাবে জিতেন্দ্রও পর বৎসর বিলাত চলে যেতে বাধ্য হলেন। নেতৃত্বের দায়িত্ব বর্তালো রাসবিহারীর স্কন্ধে ; যদিও সে দলে অনেক বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও প্রৌঢ় নেতাও ছিলেন। উত্তর প্রদেশ থেকে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাসবিহারীর তখন একচ্ছত্র প্রভাব।"

লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর রাসবিহারী বসু হাত গুটিয়ে বসে রইলেন না। ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে তিনি ভারতবর্ষে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এমন সময় বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামে এক মারাঠি যুবক আমেরিকায় বহুদিন

থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য। রাসবিহারী ও পিংলের মিলন যেন মণিকাঞ্চনযোগ। এ সন্ধিক্ষণে আমেরিকা থেকে কিছু সংখ্যক শিখ এসেছেন। তাঁদেরও উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করা।

পিংলে ও রাসবিহারী শিখদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

কর্তার সিং, পিংলে প্রমুখ বিপ্লবীরা লাহোর, আম্বালা, ফিরোজপুর ও রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে ভারতীয় সৈন্যদলকে বিদ্রোহের জন্য উসকাতে লাগলেন। অন্যদিকে রাসবিহারী তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে বেনারস, এলাহাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি সেনা ছাউনিতে পাঠালেন —একই উদ্দেশ্যে।

১৯১৫ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। রাসবিহারীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হবার ব্যবস্থা পাকা। বিপ্লবীদের মধ্যে একজন পুলিশের কাছে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়। ফলে পিংলে বোমা সহ ধরা পড়েন। পুলিশের তৎপরতায় কর্তার সিং সহ আরো অনেকে ধরা পড়েন। সশস্ত্র অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো। শুরু হলো—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

৫ অক্টোবর। ১৯১৪ সাল। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের ফাঁসির হুকুম হয়। কম বয়স বলে বসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

রায়ের বিরুদ্ধে শাসক সম্প্রদায় আপীল করলেন। আপীলে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হয়।

বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হলো। বসন্ত বিশ্বাসের আপীল নাকচ হয়ে গেলে। ফাঁসি বহাল রইলো।

১৯১৫ সালের ১ মার্চ আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধবিহারীর ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্বে এক ইংরেজ অবোধবিহারীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার শেষ ইচ্ছে কি ?" অবোধবিহারী জবাব দিলেন, "ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস হোক, এই আমার একমাত্র ইচ্ছে।

ইংরেজ বললেন, "শান্ত হও। শান্তিতে মরো। এ সব কথা বলে এখন কোন লাভ নেই।" অবোধবিহারী বললেন, "শান্তি কোথায় ? আমি চাই অগ্নিবর্ষণ হোক। চারদিকে অগ্নিবৃষ্টি হোক। সে আগুনে তুমি জ্বলো। আমি জ্বলি। আমাদের দাসত্ব জ্বলে যাক—ভারত স্বাধীন হোক।"

রাসবিহারী বুঝলেন অবস্থা ঘোরালো। পলাতক অবস্থায় দীর্ঘদিন ভারতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আম্বালা জেলে চারজন বিপ্লবীর ফাঁসি হবার পর, মে মাসেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি জাপান চলে গেলেন।

সিঙ্গাপুরে এক বক্তৃতায় রাসবিহারী বসু বললেন, "আমি নিজের হাতে দিল্লীর চাঁদনীচকে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা ছুঁড়ে ছিলাম।"

কিন্তু প্রচলিত ধারণা অন্য। বসন্তকুমার বিশ্বাসই লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা ছুঁড়ে ছিলেন।" 'জাগরণ ও বিস্ফোরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ-৩৬৮) বইতে কালীচরণ ঘোষ লিখেছেন ঃ

'রাসবিহারী বসু এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বসন্তকুমার বিশ্বাস রাস্তায়

দাঁড়াইয়াই বোমাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের বেশে দোতলার বারান্দা হইতে নহে।"

রাওলাট রিপোর্টে রাসবিহারী সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছে দেখা যাক :

"Among the few handful of Bengal revolutioneris who made the British Government almost impossible in India, the name of Rash Behari Bose tops the list".

১৯১৫ সালের মে মাসে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপান চলে গেলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সেনা বিদ্রোহের ওপর যবনিকা পড়ে গেলো। কিন্তু ইতিহাস এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাসবিহারী যখন সেনা বিদ্রোহের আয়োজন করছিলেন তখন বাঘা যতীন একই সঙ্গে পূর্ব ভারতে ব্রিটিশকে আঘাত হানতে তৈরি হচ্ছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) কিভাবে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এলেন সেই সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার রায় লিখেছেন (পৃঃ—১০৭) :

"বরোদা রাজ্য হইতে ১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সময় বাঙ্গলা দেশে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির গোড়াপত্তনের জন্য কলিকাতায় আসেন, সেই সময় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার ও পরিচয় ঘটে। সেই সময় হইতেই যতীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্পর্শে ছিলেন। তবে প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসর বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।"

প্রথম থেকেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার বৈপ্লবিক কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তার নজির পাওয়া যায়। তবে তিনি ছিলেন পুলিশের শ্যেনদৃষ্টির বাইরে। যথাসময়ে প্রতিভা স্ফুরণের জন্য ভারতমাতা যেন তাঁকে স্নেহের আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। উত্তরকালে দেশমাতা তাঁকে যে, বিপ্লবী মহানায়কের পদে বরণ করবেন।

কাশীনাথ বিশ্বাস ও জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস তাঁরা দু ভাই। কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজের কাছে তাঁদের বাড়ি। তাঁদের আদি নিবাস চট্টগ্রাম জেলার গুজরা নয়াপাড়া গ্রাম। দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁরা প্রতি বছর চট্টগ্রাম যান।

কলকাতায় বাঘা যতীনের সঙ্গে কাশীনাথের পরিচয় হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে কাশীনাথ তিন দফায় প্রায় আঠারোটি রিভলবার চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

চট্টগ্রাম থেকে রিভলবার সংগ্রহ করে কলকাতায় নিয়ে আসার নেপথ্য কাহিনী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

আবদুল কাদের জার্মান জাহাজের একজন সারেঙ। তার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে। সেই সুবাদে আবদুল কাদেরের সঙ্গে কাশীনাথের পরিচয় অনেক গভীরে।

১৯০৫ সাল। জার্মান জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে ভিড়লো। আবদুল কাদের তাঁর কথা

রেখেছেন। তিনি কাশীনাথের হাতে চৌদ্দটি রিভলবার ও কিছু কার্তুজ এনে দিলেন। জার্মান জাহাজ যথাসময়ে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে গেলো।

কাশীনাথ রিভলবার ও কার্তুজগুলি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করলেন। নয়াপাড়া গ্রামের দুজন মধ্য ইংরেজী ইস্কুলের ছাত্র যোগেশ ও মণীন্দ্রকে বেশ ফন্দি করে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব শুনে যোগেশ ও মণীন্দ্র আনন্দে মেতে উঠলেন। মণীন্দ্র যোগেশের খুড়তুতো ভাই।

কাশীনাথ যোগেশের বাবাকে বললেন, "আপনার ছেলের অভিনয় প্রতিভা আছে। কালীপূজার সময় কালীঘাটের মহামেলায় ও টালিগঞ্জের রাসের মেলায় কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে অভিনয়ে, বালক-বৃদ্ধ ও বদর ফকিরের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যোগেশকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন।"

যোগেশের বাবা সানন্দে যোগেশকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। একই কায়দায় মণীন্দ্রকেও পাওয়া গেলো। নয়াপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ বহুরূপীর ছেলে রমণীরঞ্জনকে দিয়ে 'মুশকিল আসান' গানের তালিম দিলেন। তিন দিনের চেষ্টায় যোগেশের 'মুশকিল আসান' গানটি রপ্ত হলো। একই সময়ে মণীন্দ্রও বাউল গানে সাফল্যলাভ করলেন।

কাশীনাথ ও জ্যোতিষ নয়াপাড়া গ্রাম থেকে যোগেশ ও মণীন্দ্রকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে এলেন।

এবার বহুরূপী সাজে সাজার পালা।

কাশীনাথ সাজলেন শেখ বদরুদ্দিন। যোগেশ সাজলেন বালক-ফকির জামীর আলি। মণীন্দ্র– বাউল বালক ঠাকুরদাস। জ্যোতিষচন্দ্র—বাউল প্রেমচাঁদ।

বাউল বালক মণীন্দ্রের কাঁধে ডুগডুগি। বালক—ফকির যোগেশের কাঁধে একটি 'আসা' নামের সামান্য মোটা বাঁশের ভিতরে বারোটি রিভলবার রাখা হয়েছে। বাঁশের যে দিকে কেটে রিভলবার রাখা হয়েছে, সেই দিক গালা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। তাতে পিতলের পেরেক বসানো। পিতলের পেরেকগুলো 'আসা'কে অলংকারের মতো সুশোভিত করে তুলেছে। কাশীনাথের (ফকির বদরুদ্দিন) কাঁধেও একটি 'আসা'। আত্মরক্ষার জন্য প্রেমচাঁদ বাউল ও ঠাকুরদাস বাউলের কাছে রাখা হয়েছে দুটি রিভলবার ও কিছু কার্তুজ।

কাশীনাথ, জ্যোতিষচন্দ্র, যোগেশ ও মণীন্দ্র বহুরূপীর সাজে সেজে ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। গাড়ির একই কামরায় চেপেছেন একজন পাদরি। নাম মিঃ পিটার। তাঁর বাড়ি নয়াপাড়া। জাতিতে জেলে।

গ্রামের চারটি ছেলেকে বহুরূপীর বেশে দেখে পিটার সাহেব অবাক। তিনিও কলকাতায় যাচ্ছেন। কাশীনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। কাশীনাথের কাছে ফকির ও বাউল সাজার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

কাশীনাথের দলটি গান গাইতে গাইতে রেলযাত্রীদের মনোরঞ্জনের ছলনায় রেলের অন্য কামরায় চলে গেলেন। বাউল ও ফকিরের দলটি কলকাতার টিকেট কেটেও ফেণী স্টেশনে নেমে পড়লেন। পরদিন নোয়াখালী থেকে স্টীমারে বরিশাল গেলেন। ফের স্টীমারে বরিশাল থেকে পৌঁছলেন কলকাতায়।

কলকাতা পৌঁছে কাশীনাথ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে খবর দিলেন। বাঘা যতীন কাশীনাথের বাড়ি এলেন। যোগেশের সঙ্গে বাঘা যতীনের পরিচয় হলো। তিনি যোগেশকে জামীর আলি নামে ডেকে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করলেন।

এবার দায়িত্ব পড়লো রিভলবারগুলি যথাস্থানে পৌঁছানো।

যোগেশকে আবার জামীর আলি সাজানো হলো। পরনে ছেঁড়া কম্বলের আলখাল্লা। বাঁ-কাঁধে 'আসা' ও ভিক্ষার ঝুলি। ডান হাতে চামর।

শ্যামবাজার অঞ্চল। বালক-ফকির জামীর আলি গান ধরলেন।

'মুশকিল আসান কর—মুশকিল আসান।
আল্লা আমায় দোয়া কর, লে লো সালাম।'

জামীর আলি শ্যামবাজার অঞ্চলের এক এক বাড়ির উঠানে গিয়ে মুশকিল আসানের গান করতে লাগলেন। কোন বাড়িতে চাল, কোন বাড়িতে পয়সা ভিক্ষা দিলো। এভাবে চলতে চলতে তিনি নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

নির্দিষ্ট বাড়িটির উঠানে জামীর আলি আসার সঙ্গে সঙ্গে, বাঘা যতীনের বোন বিনোদবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো।

যোগেশ ছোটবেলায় মাস্টারদা সূর্য সেনের সহপাঠী ছিলেন। দর্শনে এম. এ. পাস করার পর আবার মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সময় তিনি নেতাজীর সহপাঠী হন। ১৯২২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি মস্কোয় যান। ৩ ফেব্রুয়ারি মহামতি লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। পরে সাধক হন। সাধক জীবনে তিনি শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী নাম গ্রহণ করেন।

'চট্টগ্রাম ঃ বিপ্লবের বহ্নিশিখা' গ্রন্থে 'স্বাধীনতার সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী' প্রবন্ধে শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী লিখেছেন ঃ

'চলিতে চলিতে এক বাড়ির সম্মুখে মহীয়সী মহিলার সম্মুখীন হইলাম। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি আরম্ভ হইল। এই ভদ্রমহিলা বাঘা যতীনের ভগ্নী বিনোদবালা। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'মুশকিল আসান—এ দিকে এস। তোমার নাম কি ?'

আমি বলিলাম, 'আমার নাম জামীর আলি।'

তিনি বলিলেন, 'তোমার কাঁধে ওটা কী ?'

আমি বললাম, 'এর নাম আসা।'

হাসিতে হাসিতে দেবী বিনোদবালা বলিলেন, 'এই বাঁকাবুঁকা এক বাঁশকে 'আসা' বলছ কেন, একটা ভাল লাঠি নেবে ?'

আমি বলিলাম, 'না, এ আমার ফকির সাহেবের 'আসা', এটা না থাকলে আমাকে আল্লা মুশকিল আসান করতে দেবেন না।'

দেবী বিনোদবালা আবার এক গাল হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি তো বড় ফকির হয়ে গিয়েছ, আমাদের ভবিষ্যৎ কিছু বলতে পার ?'

সেই সময় ততোধিক প্রৌঢ়া এক ভদ্রমহিলা বলিলেন, 'আহা, ভিখারি ছেলের মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে। ওকে আগে কিছু খেতে দাও।'

তিনি ভিতর হইতে কিছু মুড়ি ও মুড়কি আনিয়া আমাকে খাইতে দিলেন। আমি খাইবার উপক্রম করিয়া 'আসা' ও চামর প্রভৃতি বাহিরের রাস্তার উপর রাখিলাম এবং মুড়ি-মুড়কি

আঁচলে লইলাম। হাস্যময়ী মহিলা অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনোদবালা আমার 'আসা' কে হাতে লইয়া দেখার ছলনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মাকে দেখাইবেন— এই ছলনায় ভিতরে লইয়া গেলেন।

এদিকে পাড়ার ছেলেগুলি আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আমাকে তখন নানা কথায় খেপাইতে লাগিল। আমিও 'মুশকিল আসান' গাহিতে গাহিতে তাহাদের তুষ্টি বিধান করিলাম। কিছু সময় কাটাইয়া দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এই সময়ের মধ্যেই দেবী বিনোদবালা 'আসা' হইতে এক ডজন রিভলবার বাহির করিয়া লইলেন এবং 'আসা'কে উনানে গরম করিয়া লাক্ষা দিয়া বন্ধ করিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

বিনোদবালা হাসিমুখে বলিলেন, 'ফকির, নাস্তা খেয়েছ ?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, বেগমসাহেবা।'

যতটা পারি, মুসলমানী ভাষায় কথা চালাই, যেন কেহ আমাকে হিন্দু বলিয়া সন্দেহ না করে।

বিনোদবালা বলিলেন, 'আবার এস। এই ক'দিনের মধ্যে যে-মুশকিল জমবে, তুমি এসে আসান করে দিও।'

আমি 'আসা' কাঁধে করিয়া চামর দোলাইতে দোলাইতে বালকদিগের উপহাসের হাসিতে আপ্যায়িত হইয়া পুনরায় সংকেতস্থানে চলিয়া আসিলাম।"

ফকির চলে যাওয়ার পর বাঘা যতীনের বাড়িতে দুজন বাউল এসে হাজির হলো। এ কজনের নাম—ঠাকুরদাস বাউল (মণীন্দ্র)। অন্যজনের নাম প্রেমচাঁদ (জ্যোতিষ)। ঠাকুরদাস বাউল গান ধরলেন ঃ

'মনের মানুষ চেনা বড় দায়,
চিনতে হলে কিনতে হবে প্রেমেরই পাল্লায়।'

বিনোদবালা দেবী ঠাকুরদাসকে ডাকলেন। ঠাকুরদাস একই সুরে গাইলেন ঃ

'তার ঠাঁই হবে কার আঙিনায়,
মনের মানুষ চেনা বড় দায়।'

বিনোদবালা দেবী ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ডুগডুগি বাজে না কেন ? দেখি, কেমন তোমার ডুগডুগি ?'

ডুগডুগি ঘরের ভেতরে কাউকে দেখানোর ছুতোয় বিনোদবালা দেবী ঠাকুরদাসের কাছ থেকে নিয়ে নিলেন। এদিকে প্রেমচাঁদ নেচে গেয়ে দরজায় দাঁড়ানো সকলকে ভুলিয়ে রাখলেন। এ সময়ের মধ্যে বিনোদবালা দেবী ডুগডুগি থেকে রিভলবার বের করে নিয়ে, ডুগডুগি ফেরত দিলেন।

পিটার সাহেব কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে গেলেন। চট্টগ্রামের পুলিশকে কাশীনাথের বহুরূপী সাজার খবর দিলেন। পুলিশ কাশীনাথের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন হদিস পায়নি। কাশীনাথ কিছুদিন পর চট্টগ্রামে এলেন। তিনি মিঃ পিটারকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলেন। অতিরিক্ত মদ খেয়ে মিঃ পিটার প্রায় অচল। মিঃ পিটারকে বাড়ি পৌঁছানোর জন্য কাশীনাথ সঙ্গে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মিঃ পিটারকে ধাক্কা দিয়ে এক গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে কাশীনাথ পালিয়ে গেলেন। মিঃ পিটার আর

বাড়ি ফিরতে পারলেন না। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পাড়ার লোক ভাবলো মিঃ পিটারকে মদেই খেয়েছে।

১৯০৬ সাল। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে শিবরাত্রির মেলা। মেলা উপলক্ষে যোগেশ ও মণীন্দ্রকে নেড়া মাথা করে, গায়ে ভস্ম মাখিয়ে, কৌপীন পরিয়ে নাগাবাবা সাজানো হলো! তাঁদের বাঁ-কাঁধে বটুয়া ও একটি করে পিতলের নাগফণী ঝুলছে। বটুয়ার ভেতর কার্তুজ। নাগফণীর মধ্যে একটি করে রিভলবার রাখা হয়েছে। মেলা শেষে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বালক-নাগা সাধু দুজন কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেনে যাত্রা করলেন। সাধু দুজনের সঙ্গে রয়েছেন কাশীনাথের স্ত্রী। তিনি যেন সাধুদের সেবা করে তীর্থযাত্রার পুণ্য সঞ্চয় করছেন। তৃতীয়বার যোগেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে দুটি রিভলবার চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

৯ নভেম্বর। ১৯০৮ সাল। কাশীনাথ বিশ্বাসের বাড়ির অদূরে কলকাতার সার্পেণ্টাইন লেনে বিপ্লবীরা দারোগা নন্দলাল বানার্জীকে হত্যা করেন। বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে আদেশ দিয়েছিলেন। যাঁরা নন্দলালকে হত্যা করেছিলেন, তাঁরা হলেন—ঢাকা বিপ্লবী মুক্তি সংঘের (পরবর্তীকালে বি. ভি.) সদস্য শ্রীশ পাল ও 'আত্মোন্নতি সমিতির সদস্য রণেন গাঙ্গুলী। কিন্তু হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পুলিশ কাশীনাথকে বন্দী করে।

'স্বাধীনতার সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী' প্রবন্ধে শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী লিখেছেন (পৃঃ—২০৮):

"ঐ হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে কাশীনাথকে গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর হইতে কাশীনাথের অবস্থা শোচনীয় হইল। পুলিশের অত্যাচারে তাঁহার দেহ জর্জরিত হইল। পুলিশের দেওয়া ইন্‌জেক্‌শনের ফলে তাঁহার দেহের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া বড় হইতে লাগিল। কাশীনাথ অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেন।...১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমার বি এ পাস করিবার পূর্বেই কাশীনাথের কাশীপ্রাপ্তি ঘটিল।"

অরবিন্দ আলিপুর মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পেলেন। এবং ১৯০৯ সালে বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে যোগ দেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ইংরেজী 'কর্মযোগিন' ও বাংলা 'ধর্ম' দুখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু ঘটনার গতি অন্য দিকে মোড় নিলো।

আলিপুর মোকদ্দমায় পুলিশ ইনস্পেক্টর সামশুল আলম, সরকারকে যথেষ্ট কাজ দেখিয়ে ছিলেন। ফলে তিনি প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। মামলার আসামীদের কাছে তিনি ছিলেন চক্ষুশূল। বিপ্লবীরা সামশুল আলমকে খতম করতে তৎপর হলেন।

২৪ জানুয়ারি। ১৯১০ সাল। হাইকোর্টে আলিপুর মামলার তখন আপীল চলছে। হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে সামশুল আলম নামছেন। পেছনে তাঁর দেহরক্ষী। অল্প বয়স্ক তরুণ বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের রিভলবার সামশুল আলমকে লক্ষ করে গর্জে ওঠে। হাইকোর্টের মধ্যে সামশুল আলম খুন হলেন। বীরেন্দ্রনাথ পালাবার সময় হেস্টিংস স্ট্রীটে (বর্তমান

কিরণ শঙ্কর রায় রোড) অশ্বারোহী পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। বিচারে বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়।

সামশুল আলমকে হত্যা করার খবর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের কাছে পৌঁছলো। এ সম্বন্ধে নলিনীকান্ত গুপ্ত 'স্মৃতির পাতা' বইতে লিখেছেন ঃ

"এরই মধ্যে একদিন বিকেলের দিকে এক যুবক ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত— শ্রীঅরবিন্দকে খবর দেবার জন্য যে, সামশুল আলম (আমাদের আলিপুর মোকদ্দমায় সরকারের প্রধান সহায় পুলিশ ইনস্পেক্টর) খতম হয়ে গেল হাইকোর্টে বীরেনের হাতে (বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত)। সেও সঙ্গে ছিল— সে পালাতে পেরেছে, বীরেন পারল কিনা সন্দেহ"।

সামশুল আলম হত্যার খবর পেয়েই অরবিন্দ তাঁর আত্মীয় বীরেন ঘোষ ও সুরেশ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকোয় চন্দননগর যাত্রা করলেন। চন্দননগরে মতিলাল রায়ের আশ্রমে ও নরেন্দ্র ব্যানার্জির আশ্রয়ে ছ সপ্তাহ থেকে তিনি পাণ্ডিচেরী চলে গেলেন। সেখানে স্থায়ী-ভাবে বাস করতে থাকেন। এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিপ্লবের রণতরী অরবিন্দের অভাবে কাণ্ডারীহীন। বাঘা যতীন এসে তার হাল ধরলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীরা বাঘা যতীনকে নেতার পদে বরণ করে নিলেন। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত নেতৃত্ব অকালে নেমে আসা অন্ধকারে যেন আলোক সম্পাত করলো। বিপ্লবীরা মনোবল ফিরে পেলেন।

১৯১৩ সাল। মেদিনীপুরে প্রবল বন্যা দেখা দিলো। আর্ত মানুষের সেবায় বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তের দেশ নায়কেরা তাঁদের সেবাদল নিয়ে মেদিনীপুরে ছুটে এলেন।

বিপ্লবীদের কাছে এ একটি সুবর্ণ সুযোগ। গোয়েন্দা পুলিশের অত্যাচারে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এ বন্যা যেন বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ করে দিলো। বন্যা ত্রাণের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো।

বহুদিন ধরে সব বিপ্লবী গোষ্ঠীই চেয়েছিলেন তাঁরা একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অধীনে কাজ করবেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বাঙলার বিপ্লবী সমাজ কিভাবে মহানায়ক পদে বরণ করে নিলেন, সেই সম্বন্ধে 'উপেক্ষিত রাসবিহারী' প্রবন্ধে নারায়ণ সান্যাল লিখেছেন ঃ

"ত্রাণ-কার্যের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন স্থানীয় গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ মিলিত হবার সুযোগ পেলেন ঃ মাখনলাল সেন, অশ্বিনীলাল রায়, চন্দননগরের অমরেন্দ্র, মতিলাল, শ্রীশ, অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলী, এদিকে বাঘা যতীন, ত্রৈলোক্য মহারাজ, যাদুগোপাল প্রভৃতি। বন্যা ফেরত কলকাতায় এসে এঁরা এক নেতৃত্বে আসার জন্য সচেষ্ট হলেন। সতীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বরিশাল-পার্টি, নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ফরিদপুর গোষ্ঠীর নিখিল রঞ্জন গুহরায়, মৈমনসিং, সাধনা সমাজের হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী, বগুড়ার যতীন রায়, ওদিকে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন বসু, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই চাইছেন একজন সর্ববাদী সম্মত নেতা। অনতিবিলম্বেই বাঙলা-খণ্ডে সে-যুগে সেই সর্বজনসম্মত নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বাঘা যতীন।

বাঘা যতীনের জন্ম—৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ সাল। বাড়ি কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রাম। বাবার নাম উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাঙলার অবিসংবাদিত নেতা বাঘা যতীন। তিনি ভাবলেন, বাঙলা দেশের একক প্রচেষ্টায় ভারত থেকে ইংরেজদের হটানো যাবে না। তাই তিনি ভারতের অন্য প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। উদ্দেশ্য—ভারতীয় সেনাদলে বিদ্রোহ এবং ইংরেজের শত্রু বিদেশী শক্তির সাহায্য।

১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মানী, জয়ের পর জয় করে চলেছে। বিপ্লবীদের কাছে এইতো সুযোগ।

এদিকে বিপ্লবীদের কাছে একটি বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্রের খবর এলো। বিপ্লবী শ্রীশ মিত্র রডা কোম্পানির 'কাস্টমস্ অফিসার।' শ্রীশ ওরফে হাবুর কাজ হলো, সরকারী গুদাম ঘর থেকে মাল খালাস করে কোম্পানির অফিসে নিয়ে আসা।

রডা কোম্পানি হলো—কলকাতার প্রসিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী। এ কোম্পানি বিদেশ থেকে বন্দুক, গুলি ও বারুদ আমদানী করতো। শ্রীশ মিত্র বিপ্লবী নেতা শ্রীশ পালকে বিদেশ থেকে মাউজার পিস্তল আসার খবর দেন।

২৬ আগস্ট। ১৯১৪ সাল।

ঢাকার হেম ঘোষের পার্টি ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'-র যৌথ উদ্যোগে পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ রডা কোম্পানি থেকে চুরি যায়। এবং অস্ত্রগুলি বাঙলার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো।

ছদ্মবেশী গাড়োয়ান সেজে বিপ্লবী হরিদাস দত্ত অস্ত্রগুলি চুরি করেছিলেন। মাউজার পিস্তলে কুঁদো লাগিয়ে প্রয়োজনে রাইফেলের মতো ব্যবহার করা যায়।

'অগ্নিযুগ' সঙ্কলন বইতে রডা কোম্পানির অস্ত্র হরণের তাৎপর্য প্রবন্ধে হরিদাস দত্ত লিখেছেন (পৃ-৪৬):

"কার্য সমাধা হবার পর ব্রিটিশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবীরাও তেমনি আনন্দে ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি যত্নে ও সঙ্গোপনে মাউজার পিস্তলগুলি বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। তখন কিন্তু কোন দলাদলি থাকল না। কে অনুশীলন, কে যুগান্তর, কে-কোন ছোট-বড় দলের লোক, তা কারো ভাববার অবসর ছিল না।...অস্ত্রের প্রয়োজন। সেই অস্ত্র এসেছে। এখন ইণ্ডো-জার্মান ষড়যন্ত্র সফল হোক। আসুক জাহাজ বোঝাই অস্ত্র-শস্ত্র, আসুক ভাণ্ডার বোঝাই অর্থ।"

দুর্ধর্ষ পুলিশ কর্তা মিঃ চার্লস টেগার্ট তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন:

'The gang responsible for this theft is connected with Hem Ghosh's party in Dacca.

(Note of Mr. Tegart to Mr. Colson, Sept. 1, 1914. 9. B. Records of the Govt. of W. Bengal, F. N. 1030/1914)

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাস। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা এক গোপন মিটিংয়ে সারা ভারত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি করলেন।

অস্ত্র এসে গেছে। এবার বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে টাকার প্রয়োজন। এদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের

পরিকল্পনা তৈরি। গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা অঞ্চলে টাকা লুঠ করে ৩৮,০০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
প্রসিদ্ধ নেতা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও আরো কয়জন ঘটনার কয়েকদিন পর গ্রেপ্তার হন। নরেন্দ্রনাথ জামিনে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যান।
২১ ফেব্রুয়ারি সারা ভারত সশস্ত্র বিদ্রোহের দিন স্থির হয়েছে। বাঘা যতীনের উৎকণ্ঠা সীমাহীন। বিপ্লবীদের মধ্যে একজন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কিন্তু বাঘা যতীন তাঁর সংকল্পে অটুট রইলেন।

গার্ডেনরীচ এবং বেলেঘাটা ডাকাতিতে বাঘা যতীন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এটি পুলিশের সন্দেহ। তাই পুলিশ বাঘা যতীনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।
বাঘা যতীন তাঁর চারজন সঙ্গী সহ কলকাতার ৭৩ নং পাথুরিয়াঘাটার গুপ্ত আস্তানায় আছেন। তাঁর সঙ্গী চারজনের নাম হলো—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেনচন্দ্র দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল।
২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ সাল।
গুপ্তচর নীরোদ হালদার ঘুরতে ঘুরতে সিংহের গুহায় গিয়ে হাজির।
নীরোদ হালদার বললো, "আরে, যতীনবাবু এখানে ?"
সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপ্রিয়ের পিস্তল গর্জে উঠলো। গুলির আঘাতে নীরোদ হালদার মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। মৃত্যুর আগে নীরোদ পুলিশের কাছে বাঘা যতীনের সংবাদ দিয়ে গেলো। বিপ্লবীরা পলকে উধাও হয়ে গেলেন।
নীরোদ হালদার আচমকা বাঘা যতীনের গুপ্ত আস্তানায় এসে নিহত হলো। কিন্তু দক্ষ সি. আই. ডি ইন্‌সপেক্টর সুরেশ মুখার্জি বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করার খোয়াব দেখছেন। তাঁকে ধরে দিতে পারলে প্রমোশন কে রোখে ? সুরেশ মুখার্জির স্বপ্ন তাঁর মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ তোলে। এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বাঘা যতীন।
কিন্তু খতমের তালিকায় সুরেশ মুখার্জির নাম উঠে গেছে। বিপ্লবীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে করেই হোক সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করতে হবে।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে বড়লাট আসবেন। তাই সুরেশ মুখার্জি ব্যস্ত। হেদুয়ার মোড় দিয়ে তিনি প্রতিদিন যাতায়ত করেন। পরিকল্পনা মতো চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিত্তপ্রিয়ের অদূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন আরো চারজন বিপ্লবী।
চিত্তপ্রিয় ফেরারী আসামী। সুরেশ মুখার্জি চিত্তপ্রিয়কে দেখে বন্দী করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যেতেই দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে পাঁচটি রিভলবার একসঙ্গে গর্জে উঠলো। সুরেশ মুখার্জি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নীরোদ হালদারের মৃত্যুর মাত্র চারদিন পর।
ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জার্মানীতে বসবাসকারী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেলেন। সংবাদ এলো জার্মানী থেকে বাটাভিয়ার পথে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গল, হাতিয়া ও উড়িষ্যার উপকূলে আসবে।

অস্ত্র বোম্বাই জার্মান জাহাজ আসার খবর পেয়ে বাঘা যতীন নরেন ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নরেন ভট্টাচার্য সি. মার্টিন ছদ্মনামে বাটাভিয়া যাত্রা করলেন। একই উদ্দেশ্যে অবনী মুখার্জিকে পাঠালেন জাপান। ভোলানাথ চ্যাটার্জি আগে থেকে ব্যাঙ্ককে ছিলেন। জার্মানের অস্ত্র এলো বলে।

এবার জার্মানী থেকে টাকা আনার ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই বাঘা যতীন বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলতে নির্দেশ দিলেন। হরিকুমার নিজের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে ইংরেজী কায়দায় 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' নামে একটি ভুয়ো প্রতিষ্ঠান খুললেন। এ ফার্মের নামে বাটাভিয়া থেকে দফে দফে টাকা আসতে থাকে।

নরেন ভট্টাচার্য বাটাভিয়া থেকে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফিরে এলেন। অস্ত্র এসে পৌঁছলেই সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হবে।

বাঙলা দেশের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে মোটামুটি এই রকম ঃ

(১) বাঙলার বাইরে থেকে যাতে সৈন্য আসতে না পারে তার ব্যবস্থা হিসাবে রেল লাইন উপড়ে ফেলা হবে।

(২) অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পর পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের দিয়ে একটি বাহিনী তৈরি করে জেলাগুলি মুক্ত করবে। পূর্ববঙ্গ জয় করে বাহিনীটি কলকাতা চলে আসবে।

(৩) বিপ্লবীদল একই সময়ে কলকাতা ও তার কাছাকাছি স্থানের অস্ত্রাগার দখল করার পর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করবে।

(৪) একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করা হবে।

সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য কাজের দায়িত্ব বিপ্লবীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের প্রকাশিত সিডিশন কমিটির রিপোর্টে কি লিখেছে দেখা যাক ঃ

"They considered that they were numerically strong enough to deal with troops in Bengal. but they feared reinforcements from outside. With this idea in view they decided to hold up the three main railways into Bengal by blowing up the principal bridges.

Jatindra was to deal with the Madras railway from Balasore. Bholanath Chatterjee was sent to Chakradharpur to take charge of the Bengal-Nagpur railway, while bridge on the East Indian Railway.

Naren Choudhury and Phanindra Chakraborty were to go to Hatia where a force was to collect, first to obtain control of the Eastern Bengal district, and they to march on to Calcutta.

The Calcutta party, under Naren Bhattacharjee and Bipin Ganguly, were first to take possession of all the arms and amunations around Calcutta, then to take Fort William, and afterwards to sack the town of Calcutta." [S. C. Report : P. 83.]

বাঘা যতীন বালেশ্বর যাত্রা করলেন। বাঘা যতীনের সঙ্গে গেলেন—চিত্তপ্রিয়, জ্যোতিষ, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন। তাঁদের আশা, অস্ত্রবোঝাই 'ম্যাভারিক' জাহাজ মহানদীর মোহানায় আসবে। অস্ত্র খালাস করার পর বিপ্লবীরা বালেশ্বরে কলকাতা-মাদ্রাজ রেলপথের লাইন তুলে দেবেন। এখন একমাত্র অস্ত্রের প্রতীক্ষা।

৭ আগস্ট, ১৯১৫ সাল। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স প্রতিষ্ঠানে পুলিশ হানা দিলো। মালিক হরিকুমার চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন বন্দী হলেন। সেখানে খানাতল্লাশী করে কাগজ-পত্রে বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর সন্ধান পাওয়া গেলো। এটি 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা।

৪ সেপ্টেম্বর। পুলিশ ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে হানা দেয়। সেখানে একটা কাগজের টুকরোয় বাঘা যতীনের আস্তানা 'কাপ্তিপোদা'-র নাম পায়।

এবার পুলিশ কাপ্তিপোদায় গিয়ে হাজির হলো। ভাগ্যদেবী বিপ্লবীদের কপালে যেন কিস্তির চাল দিয়ে বসলেন।

সরকারী রিপোর্টের ভাষায় ঃ

"On the 4th September the 'Universal Emporium' at Balasore a branch of 'Harry & Sons' was searched as also a revolutionary retreat at Kaptipada 60 miles distant where a map of Sunderbans was found together with a cutting from Penang area about the Maverick."

[Sedition Committee Report : P. 83]

দুর্ভাগ্য। অস্ত্র বোঝাই 'ম্যাভারিক' জাহাজ ভারতের উপকূলে পৌঁছতে পারলো না। বিপ্লবীদের প্রতীক্ষা কেবল প্রতীক্ষায় রয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ ধরা পড়ার খবর এলো। বাঘা যতীন শান্তভাবে সব ঘটনা শুনলেন।

বাঘা যতীন শান্তভাবেই বললেন, 'আমরা একটা মস্ত ভুল করতে বসেছিলাম। ভগবান শুধরে দিলেন, আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম দেশ কিন্তু নিজের জোরে দাঁড়াবে। অপরের সাহায্যে নয়। বাঁচা গেল।"

জার্মানীর অস্ত্র না পেয়ে বিপ্লবীদের আশা দীপ নিবে গেলো। পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো। তা ছাড়া বাঘা যতীনের গোপন আস্তানা পুলিশের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় বিপ্লবীদের বিপদ আসন্ন।

পুলিশ বিপ্লবীদের ধরার জন্য গ্রামে গঞ্জে রটিয়ে দিলো—এ অঞ্চলে ডাকাত দল আশ্রয় নিয়েছে। ডাকাতদের ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার মিলবে।

গ্রামে পুলিশ আসার খবর পেয়ে বাঘা যতীন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা 'বুড়ীবালাম' নদীর তীরে পৌঁছলেন।

পাঁচজন বিপ্লবীকে একসঙ্গে দেখে গ্রামবাসীরা ডাকাত সন্দেহে তাঁদের পিছু নেয়। বোঝানোর শত চেষ্টা করেও বিপ্লবীরা গ্রামবাসীদের নিরস্ত করতে পারলেন না। ডাকাত ধরিয়ে দিয়ে সরকারের ঘোষিত পুরস্কার পাওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

এক চরম সান্ধিক্ষণ। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলি চালান। ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত হন। এবং কয়েকজন আহত হন। এমতো অবস্থায় গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয়।

বিপ্লবীরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামেন। তারপর নদী পার হলেন। জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। ঐদিকে সশস্ত্র পুলিশ বিপ্লবীদের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে পুলিশের কর্তা মিঃ টেগার্ট ও মিঃ ডেনহ্যাম।

৯ সেপ্টেম্বর। ১৯১৫ সাল।

বাঘা যতীন ও তাঁর চারজন সঙ্গী সম্মুখ সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করাই শ্রেয় মনে করলেন। পাঁচ জনের হাতেই মাউজার পিস্তল।

বুড়ীবালাম নদীর তীর। সামনে নদীর উঁচু বাঁধ। পেছনে উইঢিবি। যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। এ যেন প্রকৃতির গড়া সুন্দর পরিখা। পরিখার আড়ালে আশ্রয় নিলেন—বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ।

শুরু হলো যুদ্ধ। দু পক্ষই সমান তালে গুলি ছুঁড়ছে। অনেকক্ষণ গুলি বিনিময় হলো। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর জীবন ছিনিয়ে নিলো। বাঘা যতীনের পাশেই প্রিয়সাথী চিত্তপ্রিয় চিরনিদ্রিত হলেন।

এবার গুলির আঘাতে গুরুতর আহত হলেন স্বয়ং বাঘা যতীন। আর একটা গুলি এসে জ্যোতিষ পালের বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

পরের কাহিনী আনন্দবাজার পত্রিকায় (৯-৯-১৯৪৭) প্রকাশিত 'মাদারীপুরের তিন বন্ধু' প্রবন্ধে প্রখ্যাত বিপ্লবী-সাহিত্যিক অমলেন্দু দাশগুপ্তের লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো। অমলেন্দু দাশগুপ্ত হলেন—নীরেন দাশগুপ্তের ভাই।

"যতীন মুখার্জী কহিলেন, 'গুলি বন্ধ কর, সাদা রুমাল ওড়াও।'

জীবনে এই প্রথম নীরেন্দ্র তাঁহার নেতার আদেশ অমান্য করিল। বলিল—'না, মরার আগে পিস্তল বন্ধ করব না।'

মনোরঞ্জন সায় দিয়া বলিল—'না, তা হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি গুলি থাকবে, ততক্ষণ লড়ব।'

উপর দিকে দৃষ্টি তুলিয়া ভূলুণ্ঠিত সিংহ বলিলেন—'I order stop firing. আমি তোমাদের মরতে দিতে পারি না। গুলি বন্ধ কর।'

নেতার হুকুম! সম্মুখ যুদ্ধে বীরের মৃত্যু হইতে তিনি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। সাদা চাদর ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। বালেশ্বরের বুড়ি বালামের তীরে এবং প্রান্তরে পঞ্চবীরের সম্মুখ যুদ্ধ শেষ হইল।

হাসপাতালে যতীন মুখার্জী বলিয়াছিলেন—'সমস্ত কিছুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী।'

টেগার্ট সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আর কিছু বলবেন?'

যতীন মুখার্জী তখন বলিলেন—'Yes, tell the people of Bengal that Chitta-priya Ray and I sacrifice our lives in vindicating the honour of Bengal.

এটিই বাংলার বীরের শেষ কথা।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল। সকালবেলা। বালেশ্বর হাসপাতালে বিপ্লবী মহানায়ক বাঘা যতীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। জ্যোতিষ সুস্থ হলেন।
বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির আদেশ হয়। জ্যোতিষের চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তর। আন্দামানে অত্যাচারের ফলে তাঁর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। তাঁকে বহরমপুর জেলে পাঠান হয়। মুক্তির চার—পাঁচদিন মাত্র বাকী। এমন সময় বাড়িতে জ্যোতিষের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলো।

বালক গণেশ ঘোষ তাঁর মায়ের কাছে শহীদ ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের নাম প্রথম শুনতে পান। বীর বিপ্লবীদের ইতিবৃত্ত জানতে গিয়ে, বিপ্লবের অগ্রদূত ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষ শহীদ সত্যেন বসু, মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) প্রমুখের সংগ্রামময় জীবনের কথা জানতে পারলেন। এ সব পড়ে বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর আবছা ধারণা জন্মালো। তাতেই তিনি আত্মস্থ হলেন।
প্রমোদ চৌধুরী, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁরা তিনজন সহপাঠী ও বন্ধু। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলে পড়েন। ক্লাস এইটের ছাত্র। প্রমোদ চৌধুরী অনন্ত সিংহকে মাস্টারদার কাছে নিয়ে যান। মাস্টারদা অনন্ত সিংহকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন।
চট্টগ্রাম গুপ্ত বিপ্লবীদল যাঁরা গঠন করেন তাঁদের নাম হলো—সূর্য সেন (মাস্টারদা), অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী চারুবিকাশ দত্ত ও নগেন্দ্রচন্দ্র সেন।
নগেন্দ্রচন্দ্র সেনের ডাকনাম জুলু সেন। তিনি জুলু সেন নামে পরিচিত।
জুলু সেনের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয় হয়েছে। কিভাবে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল গঠিত হয়েছিল তা তিনি লেখককে বলেছেন।
জুলু সেনের জন্ম—১৮৯৭ সাল। বাবার নাম-প্রাণকৃষ্ণ সেন। গ্রাম—কুয়েপাড়া। থানা—রাউজান। জেলা—চট্টগ্রাম।
মাস্টারদা, চারু দত্ত, অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, জুলু সেন, অনিল সেন এবং আরো কয়জন বন্ধু মিলে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সময়—সময় তাঁদের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে। তাঁদের ধারণা, বাঙলাদেশে যে বিপ্লবী আন্দোলন চলছে তাতে বিপ্লবীরা অস্ত্রের ব্যবহার যথাযথ করতে পারছেন না। বিপ্লবীরা প্রাণের তাগিদে লড়ছেন। সামরিক অভিজ্ঞতা তাঁদের নেই। যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠলেন। উদ্দেশ্য—যুদ্ধবিদ্যা শিখে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন।
১৯১৬ সালের আগে বাঙালিদের সৈন্যদলে নেওয়া হতো না। ইংরেজ সরকার ভাবতো বাঙালিদের যুদ্ধবিদ্যা শেখালে সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহ করবে। ডাক্তার সুরেশ সর্বাধিকারী, সুরেন ব্যানার্জি প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের চেষ্টায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট খোলার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল ডাবল্ কোম্পানি নাম দিয়ে একটি বিভাগ খোলেন।
১৯১৬ সাল। জুলু সেন ও তাঁর কয়কজন বন্ধু বেঙ্গল ডাবল্ কোম্পানিতে ফার্স্ট্ ব্যাচ্-এ সৈন্যদলে ভরতি হন। অনিল সেনও সেনাদলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের কান্নাকাটির জন্য সেনাবিভাগে যোগদান করতে পারলেন না।

নওশেরা ক্যাম্পে জুলু সেন মিলিটারি ট্রেনিং নেন। বেঙ্গল ডাব্‌ল্‌ কোম্পানির পর ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেণ্ট তৈরি করা হয়। ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেণ্টের নূতন সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য বেঙ্গল ডাব্‌ল্‌ কোম্পানি থেকে একটি দল বাঙলাদেশে পাঠানো হয়। সেই দলটিতে জুলু সেন ছিলেন। তখন প্রায় এগারো শ বাঙালি ছেলেকে ৪৯ রেজিমেণ্টে রিক্রুট্‌ করেছিলেন।

বাঙালি ছেলেদের করাচীতে মাত্র পাঁচ-ছ মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর তাদের মেসপটেমিয়াতে পাঠিয়ে দেন। বাঙালি ছেলেদের কাজ দেওয়া হলো—অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম চৌকি দেওয়া, জাহাজ থেকে মাল খালাস করা, তাঁবু খাটানো ইত্যাদি। এদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাঙালি অফিসার। এ সমস্ত কাজ করতে বাঙালি সৈনিকেরা মোটেই ইচ্ছুক নয়। তারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বাঙালি সেনাদল যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ পেলো।

যুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈনিকদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য একমাস ছুটি দেওয়ার নিয়ম। বাঙালি অফিসারেরা রিপোর্ট দিলেন, সৈনিকেরা ছুটি নিতে অনিচ্ছুক। অথচ অফিসারদের মধ্যে অনেকে গোপনে ছুটি নিয়ে বাঙলাদেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অফিসারদের ছুটির খবর শুনে যাঁরা যুদ্ধবিদ্যা শিখে ভবিষ্যতে দেশের কাজে লাগার জন্য গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন একদিন রাতে অফিসার মেস্‌ আক্রমণ করে গুলি চালান। তাতে দুজন অফিসার মারা যান। কয়েকজন অফিসার আহত হন। বিচারে দুজন সৈনিকের ফাঁসি হয়।

আক্রমণের ফলস্বরূপ বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করা হলো। এবং বেঙ্গল রেজিমেণ্টকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো।

১৯১৮ সাল। জুলু সেন সেনাবাহিনী থেকে কলকাতায় ফিরে এসে দেখেন, বাঙলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে স্তিমিত প্রায়। অনেক বিপ্লবী আত্মগোপন করে আছেন। বহু বিপ্লবী জেলে বন্দী।

কিছুদিন কলকাতা থাকার পর জুলু সেন চট্টগ্রাম গেলেন। তিনি মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারু দত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাদের জানালেন। এ সময়ে তাঁরা চট্টগ্রামে গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন। এবং আলোচনায় স্থির হয়—জুলু সেন কলকাতায় অন্যান্য বিপ্লবীদলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এ দায়িত্ব নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

জুলু সেন সপরিবারে কলকাতায় থাকেন। কলকাতা বিপ্লবীদলের যাঁরা পলাতক, এবং যাঁরা দলের হয়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে কাজ করছেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে অনেকে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। জুলু সেন যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁরা হলেন—প্রফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল, অনুকূল মুখার্জি, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমর চ্যাটার্জি, নরেন সেন প্রমুখ বিপ্লবী নেতাগণ। এ ছাড়া সতীশ চক্রবর্তী, সন্তোষ মিত্রের সঙ্গেও চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

জুলু সেনের দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তারপর চট্টগ্রামে ফিরে, কলকাতার বিপ্লবীদলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যা যা আলোচনা হয়েছে, তার রিপোর্ট দিলেন।

এবার বিপ্লবীদলের গোপন সংবিধান রচনা করার পালা। সংবিধান রচনা করার ভার পড়লো অনুরূপ সেনের ওপর। অনুরূপ সেন সংবিধান লিখলেন। দলের সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান অনুমোদন লাভ করলো। সংবিধান অনুযায়ী দলের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো।

নূতন সদস্য গ্রহণের দায়িত্বে রইলেন—মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, চারু দত্ত ও নির্মল সেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর কর্মক্ষেত্র রেঙ্গুন।

অনুরূপ সেন ও জুলু সেনের ওপর কর্তব্যের ভার পড়লো, কলকাতার অন্যান্য দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

বিপ্লবীদলের দায়িত্ব নিয়ে অনুরূপ সেন ও জুলু সেন কলকাতা চলে এলেন। কলকাতায় এসে অনুরূপ সেন চব্বিশ পরগনার বুরুল গ্রামের হাই ইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরি নেন।

বুরুল ইস্কুলে চাকরি নেওয়ার পর তিনি কয়েকজন ছাত্রকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। জুলু সেন কলকাতায় যতো আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন, তা বুরুল গ্রামে অনুরূপ সেনের কাছে পাঠিয়ে দেন। বুরুল গ্রামটিই হলো—চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের আগ্নেয়াস্ত্র রাখার সুরক্ষিত ভাণ্ডার।

বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাস রায় অনুরূপ সেনের ছাত্র। তিনি প্রভাস রায়কে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে, দুর্গাপুর 'নেতাজী ভবনে' প্রভাস রায় তাঁর মাস্টার মশায় অনুরূপ সেন সম্বন্ধে যে ভাষণ দেন তা বড়ই মর্মস্পর্শী।

অনুরূপ সেন কতো বড় মহান্ নেতা ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তা প্রভাস রায় তাঁর ভাষণে সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মাস্টার মশায়কে অন্তরীণ অবস্থায় বিনা-চিকিৎসায় ইংরেজ সরকার মেরে ফেলেছেন। মাস্টার মশায়ের কথা বলতে বলতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো। চোখ অশ্রু সজল। মাস্টার মশায় যেন তাঁর জীবনের পরশমণি।

কি হয়েছিল অনুরূপ সেনের ? কেন তিনি অকালে মারা গেলেন ?

অনুরূপ সেন মাস্টারদার সমবয়সী। তাঁর প্রতি ছিল মাস্টারদার অগাধ শ্রদ্ধা। অনুরূপ সেনের পরামর্শ মাস্টারদা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন।

১৯২৬ সাল। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে অনুরূপ সেন গ্রেপ্তার হন। উত্তরবঙ্গের এক অজ পাড়াগাঁয়ে তাঁকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। সেখানে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য মুক্তির আবেদন করেও তিনি মুক্তি পেলেন না। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কাশীধামে পাঠানো হয়। রোগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯২৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪ গ্রন্থে অনন্ত সিংহ, অনুরূপ সেন সম্বন্ধে লিখেছেন :

"ভাল বলতে পারতেন, ভাল লিখতে পারতেন অনুরূপদা ; অল্প কথায় নিজের মতামত

ব্যক্ত করতে পারতেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের গোপন সংবিধান রচনা করেছিলেন তিনিই—পরে সেটা অনুমোদন করি আমরা সকলে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়, প্রায় আড়াই বছর, অনুরূপদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছি আমি। তখন তিনি ছিলেন বুবুল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর আমি ছিলাম মানিকতলার বি. টি ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) ছাত্র। সেই সময় লক্ষ্য করেছি তাঁর বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও প্রতিভা, ইস্পাতের মত দৃঢ়তা অথচ মানুষকে বশ করবার অসীম ক্ষমতা। বুবুল গ্রামের বহু গৃহস্থের গৃহকোণ তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষণের কেন্দ্র ছিল। গ্রামের যুবকরা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত।

একটা ঘটনা খুব স্পষ্ট মনে আছে। জুলুদার নির্দেশে একটি আটোমেটিক্ পিস্তল আনতে গিয়েছি। অনুরূপদার সঙ্গে সেই আমার বুবুলে প্রথম দেখা। আমি যে যাবো তা তাঁকে আগে জানানো হয়নি। তাই একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হলেন তিনি। সন্দেহ দূর করলাম আমি সঙ্কেত বাক্য বলে—'খোকা'। নিশ্চিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—'কোন্ পিস্তলটা চাই তোমার ?'

—'জুলুদা বলেছেন ৭ সট্ অটোমেটিক পিস্তল, যাতে 'S + S' এই চিহ্ন আর একটা বাড়তি ম্যাগাজিন আছে।"

রিভলবার সংগ্রহের গোড়ার কথা।

জুলু সেন বিপ্লবীদলের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসার পর তাঁর কেবলমাত্র চিন্তা, কি করে রিভলবার সংগ্রহ করা যায়। কলকাতায় জুলু সেনের লণ্ড্রির ব্যবসা। তাঁর দোকানে অনেক মুসলমান খানসামা বড় বড় ইংরেজ সাহেবদের পোশাক ধোয়ানোর জন্য আসে। তিনি কয়েকজন খানসামার সঙ্গে ভাব করলেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

একদিন এক খানসামা লণ্ড্রিতে এসে একটি ·৪৫০ বোরের রিভলবার ও বারোটি কার্তুজ জুলু সেনকে এনে দিলো। খানসামাকে তিনি পঞ্চাশটি টাকা দিলেন।

জুলু সেন জিজ্ঞেস করলেন, "রিভলবারটি কি ভাবে সংগ্রহ করেছ ?"

খানসামা বললো, "আমার সাহেব সপরিবারে ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়ার সময় রিভলবারটি আমি সরিয়ে ফেলেছি।"

অনেকদিনের প্রচেষ্টায় জুলু সেন মাত্র একটি রিভলবার যোগাড় করেছেন। আরো অনেক রিভলবার প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে মাস্টারদার কাছ থেকে জরুরী চিঠি পেয়ে জুলু সেন চট্টগ্রাম চলে গেলেন। গিয়ে দেখেন, বিপ্লবীদলের মধ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে।

বিপ্লবীদের গোপন মীটিং। স্থান—চট্টগ্রাম শহরের কমিশনার পাহাড়ের পাদদেশ। যথাসময়ে মাস্টারদা জুলু সেন, অনন্ত সিংহ ও নির্মল সেন যথাস্থানে মিলিত হলেন। নির্মল সেন ও অনন্ত সিংহের মাঝখানে বসেছেন জুলু সেন।

অনন্ত সিংহ জুলু সেনকে বললেন, "জুলুদা, আপনার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটিও অস্ত্র যোগাড় করা হলো না। কলকাতায় গিয়ে হয়তো দলের কথা ভুলে গেছেন। এদিকে আমাদের মধ্যে কয়েকজন

অনুশীলন পার্টিতে যোগ দিতে চলেছেন। সংবিধান অনুযায়ী আপনি এবং সবাই একমত না হলে আমরা অন্য দলে যোগ দিতে পারছি না। তাই আপনাকে চট্টগ্রামে আসতে খবর পাঠানো হয়েছে।"

জুলু সেন অনন্ত সিংহের কথা মন দিয়ে শুনলেন। দলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন। জুলু সেন নীরব। অনন্ত সিংহের মুখে উত্তেজনার ছাপ। জুলু সেনকে নীরব দেখে অনন্ত সিংহ উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন।

অনন্ত সিংহ জুলু সেনকে বললেন, "আপনি অস্ত্র যোগাড়ের নাম করে কলকাতায় আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এদিকে আপনার জন্য দল ভেঙ্গে খান খান হতে চলেছে। আমরা আপনাকে খুন করবো।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক জুলু সেন। লম্বা ছ ফুট। গায়ের রঙ গৌরবর্ণ। ইস্পাতের ফলার মতো দেহের গড়ন। অনন্ত সিংহ কৈশোরের বেলাভূমি পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েছেন। পরিকল্পনা মতো জুলু সেনের ডানে-বাঁয়ে বসেছেন অনন্ত সিংহ ও নির্মল সেন। যথাসময়ে দুজনে মিলে জুলু সেনকে টুঁটি টিপে ধরবেন।

জুলু সেন সচেতন। তবুও তিনি নির্বিকার। নির্মল সেন ও জুলু সেন একই গ্রামের ছেলে। নির্মল সেন চুপচাপ বসে আছেন। জুলু সেনের ধারণা নির্মল সেন তাঁকে আক্রমণ করবেন না। নির্মল সেন যদিও তাঁর ওপর চড়াও হন, তা হলেও দুজনকে এক সঙ্গে ঘায়েল করার হাতিয়ার তাঁর সঙ্গে আছে।

বনভূমি কাঁপিয়ে অনন্ত সিংহ যেন সিংহের হুংকার দিয়ে চলেছেন। চরম মুহূর্ত আসার আগেই মাস্টারদা অশান্ত অনন্ত সিংহকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

মাস্টারদা বললেন, "অনন্তলাল, শান্ত হও।'

মাস্টারদার মধ্যে কি জাদু আছে—একমাত্র ভগবান জানেন। মাস্টারদার ডাকে দুরন্ত সিংহ যেন নিমেষে শান্ত হয়ে গেলো।

একক্ষণ পর জুলু সেন অনন্ত সিংহকে বললেন, "আমাকে খুন করার আগে কটি কথা বলতে দাও।"

"বলুন।"

জুলু সেনের কথা শোনার জন্য অনন্ত সিংহ উৎসুক হয়ে রইলেন।

জুলু সেন কোমর থেকে রিভলবার বের করে বললেন, "এটি কি দেখো। সাবধানে নাড়া-চাড়া করবে। লোডেড। রিভলবার চালাতে জানো ?"

অনন্ত সিংহ জুলু সেনের হাত থেকে রিভলবারটি লুফে নিয়ে বললেন, "আমি চারু দত্তকে খুন করবো।"

চারু দত্ত একজন বিচক্ষণ নেতা। ভালো লিখতে পারেন। ভালো বলতে পারেন। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' বইটি তাঁরই লেখা। তিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল থেকে বের হয়ে গিয়ে অনুশীলন দলে যোগ দেওয়ার আগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে অনন্ত সিংহ কি লিখেছেন দেখা যাক।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৬) গ্রন্থে অনন্ত সিংহ লিখেছেন :

"চারু বাবু আমাদের সকলের সঙ্গেই পৃথক ভাবে আলোচনা করে এই কথাটাই বোঝাতে

চেয়েছিলেন যে, সংগঠনের নীতি অনুযায়ী অন্য নেতারা চলছেন না। নানারকম কাহিনী ফেঁদে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মালেন যে, এরকম বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের জন্য অন্য পক্ষই দায়ী।

আবার অপরপক্ষ সংগঠনের নীতি বর্ণনা করে নানাভাবে দেখাচ্ছিলেন যে, চারুবাবুই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এইভাবে নেতাদের মধ্যে চলল পরস্পর দোষারোপ।

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ফলে সংগঠনের ঐক্য দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অস্বাভাবিক এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমরা কখনও হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি, কখন বা নেতাদের কাউকে কাউকে দোষী ভেবে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। এক কথায় পালছেঁড়া নৌকার মত সকলে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

মনে আছে একবার চারুবাবু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালেন যে জুলুদাই এ সমস্ত বিপত্তির মূল, আর আমি প্রায় মনস্থির করি যে জুলুদাকে খুন করে সংগঠনকে বাঁচাব। আবার জুলুদার কাছে চারুবাবুর বিশ্বাস ভঙ্গের কাহিনী শুনে সেটাই সত্য বলে মনে হল, তাঁকে আশ্বাস দিলাম যে চারুবাবুকেই আমার হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

শেষ পর্যন্ত চারু দত্ত অনুশীলন দলে চলে গেলেন। সংবিধানে লেখা ছিল সদস্যদের মধ্যে যে কেউ সংবিধানের মূলনীতি অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কিন্তু বিপ্লবীরা চারু দত্তকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিলেন।

বিপ্লবীদলের গোপন সংবিধানের শেষ লাইনটি এই রককম ঃ

"Anybody who will violet the fundamentals of the constitution shall be done away with."

সর্বপ্রথম পাঁচজন নেতা ও দশজন প্রথম সারির সদস্য নিয়ে যে বিপ্লবীদল গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে একজন নেতা ও একজন প্রথম সারির সদস্য প্রমোদ চৌধুরী চলে গেলেন। অন্য দিকে চারজন নেতা ও ন'জন প্রথম সারির সদস্য নিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল চলতে লাগলো।

জুলু সেন কলকাতা থেকে প্রায় ত্রিশটি রিভলবার সংগ্রহ করেছিলেন। অনন্ত সিংহ এবং বিপ্লবীদলের অনেক সদস্যকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিখিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ। তিনি উড়ন্ত পাখি শিকার করতে পারেন। জুলু সেনের দক্ষতা সম্বন্ধে মাস্টারদা অনন্ত সিংকে যা বলেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড পৃঃ ৭৪) বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন ঃ

"দেখ অনন্ত! আমি খুব ভাল করে চিন্তা করে দেখেছি। আমার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করছিলাম। তোদের মত যুবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরি হয়েছে, তার পরিচালনার দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতা কি আমার' আছে? জুলুর সে অধিকার আছে—শক্তিতে, সামর্থে, মিলিটারি শিক্ষায়—বিশেষতঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সে আমাদের দলের সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। সে খাটতে পারে, হঠাৎ দরকার হলে সামান্য কিছু টাকা অন্তত যোগাড় করতে পারে; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে সে, তোদের অস্ত্রচালনা শেখাচ্ছে। কিন্তু আমি কি করছি? এসব কোন গুণই আমার নেই। তবে আমি কেন সকলের ওপরে নেতা

হয়ে বসে আছি ? আমার মনে হয় জুলুর অনুপস্থিতিতে তুই কিংবা নির্মলবাবু দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে ভাল হয়।"

এবার বিপ্লবীদলে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর কাজ। এ কাজে সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। অনন্ত সিংহ তাঁর দাদা ও দিদিকে সর্বপ্রথম বিপ্লবীদলে টানলেন। তারপর বন্ধু গণেশ ঘোষের কথা ভাবলেন। কিন্তু মনে সংশয় দেখা দিলো। তাঁর কথা যদি গণেশ ঘোষ প্রত্যাখ্যান করেন ? অনেক ভেবেচিন্তে তিনি শেষ পর্যন্ত গণেশ ঘোষকে বিপ্লবীদলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলেন।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৩) গ্রন্থে গণেশ ঘোষ সম্বন্ধে অনন্ত সিংহ লিখেছেন ঃ

"গণেশ তো শুনে লাফিয়ে উঠলো। পারলে তখনি গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য, দেশের মুক্তি যুদ্ধে সৈনিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। আমি তাকে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করলাম মাত্র। তারপর যখন সে আমার দ্বিধার কথা শুনলো, তখন তার তিরস্কার ও অনুযোগে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বারবার ক্ষমা চাইলাম তার দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার প্রতি মনে সন্দেহ পোষণ করেছিলাম বলে।"

গণেশ ঘোষের জন্ম—২২ জুন ১৯০০ সাল। আদি নিবাস—বিনোদপুর গ্রাম। মাগুরা মহকুমা। জেলা—যশোহর।

গণেশ ঘোষের বাবার নাম বিপিনবিহারী ঘোষ। মায়ের নাম মুক্তকেশী।

বিপিনবিহারী ঘোষের দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের নাম কার্তিক ও গণেশ। মেয়ের নাম প্রভাবতী। তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রভাবতী সকলের বড়। ছোট গণেশ।

বিপিনবিহারী আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিতে কাজ করেন। কর্মস্থল—চট্টগ্রাম। তিনি সীনিয়র স্টেশন মাস্টার।

১৯২১ সাল। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিতে ধর্মঘট হলো। ধর্মঘটে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ধর্মঘটের পর অনেকে কাজে ফিরে যান। তিনি আর চাকরিতে ফিরে গেলেন না। পরিবার পালনের জন্য চট্টগ্রাম শহরে তিনি একটি খদ্দরের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন।

একদিন অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষকে নিয়ে গেলেন মাস্টারদার কাছে। রোগা-পটকা মাস্টারদাকে দেখে গণেশ ঘোষের মন ভরলো না।

মাস্টারদা গণেশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কর ?"

গণেশ ঘোষ বললেন, "আমি মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি।"

"ভবিষ্যতে কি করবে ?" মাস্টারদা আবার প্রশ্ন করলেন।

এভাবে মাস্টারদা প্রশ্ন করে চলেছেন। গণেশ ঘোষ উত্তর দিচ্ছেন। মামুলি কথা। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যেমন আলাপ হয় তেমনি কথাবার্তা হতে লাগলো। মাস্টারদার স্নেহপূর্ণ কথাগুলি গণেশ ঘোষের ভালো লাগলো। আসবার আগে মাস্টারদা গণেশ ঘোষের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মনে হলো—তিনি একজন দরদী হৃদয়ের সান্নিধ্যে এসেছেন।

মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম দেখা করে গণেশ ঘোষের প্রত্যাশা আদৌ পূরণ হয়নি। তাই তিনি চুপ মেরে গেলেন। আবার একদিন অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষকে সঙ্গে করে মাস্টারদার

কাছে গেলেন। সেদিন মাস্টারদার প্রতিটি কথা গণেশ ঘোষকে সম্মোহনী শক্তির মতো আকৃষ্ট করে। তিনি মুগ্ধ। তাঁর চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে কোন প্রভেদ রইলো না। তারপর থেকে তিনি নিজের গরজে মাস্টারদার সঙ্গে প্রায় সময় দেখা করতে লাগলেন।

১৯১৮ সালের শেষে অথবা ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে গণেশ ঘোষকে মাস্টারদা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারতবাসীরা পুরস্কারের প্রতীক্ষায়। কিন্তু ভারতের ভাগ্যাকাশে ঘনকালো মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে আসছে।

১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রথমে জার্মানী প্রতিটি যুদ্ধে জয়ের পর জয় করে চলে। কিন্তু জার্মানী শেষ রক্ষা করতে পারলো না। ১১ নভেম্বর। ১৯১৮ সাল। জার্মানী আত্মসমর্পন করে। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

সামরিক ও বেসামরিক মোট পঞ্চাশ লক্ষ ভারতীয়কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য নেওয়া হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধে ভারত থেকে ব্রিটিশ সরকার কি রকম সাহায্য পেয়েছিলেন তা ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু-র বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিলে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

'বাংলা দেশের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড. পৃঃ—১৬৪ , গ্রন্থে ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু-র উক্তির উল্লেখ করেছেন ঃ

"সমগ্র যুদ্ধে ১১,৬১,৭৮৯ জন নূতন ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল. ১২,১৫,৩২৮ জন ভারতীয় সৈন্য, বিদেশে যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং ইহার মধ্যে ১,০১,৪৩৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।"

ভারতবাসীরা নগদে দশ কোটি ডলার ব্রিটিশ সরকারকে 'দান' (?) করেছিল। এ ছাড়া ইংরেজ সরকার কত কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ। ভারতবর্ষ থেকে শোষণ করে নিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

১৯১৫ সাল। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা বর্ণবৈষম্যের ফলে নাগরিকের অধিকাংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। তাই গান্ধীজী জাতিবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। এ আন্দোলনে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

ভারতবর্ষে গান্ধীজীর আগমণ ভারতবাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য। তিনি ভারতে এসে বিশ্বযুদ্ধের জন্য ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে ইংরেজদের সাহায্য করেন।

বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ভারত রক্ষা আইন' কার্যকর করা হয়। যুদ্ধের পর দমনমূলক আইনটা আর বলবৎ থাকবে না।

ইংরেজ সরকার 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদকে' সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেন। বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতের 'সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদকে' টুঁটি টিপে মারার জন্য একটি কমিটি গঠিত হলো। লণ্ডনের বিচারপতি Sir Sidney Rawlat সভাপতি হন। সভাপতির নাম অনুসারে আইনের নাম হলো—রাওলাট আইন। 'ভারত রক্ষা আইন'-এর অনুরূপ 'কালাকানুন' ১৮ মার্চ ১৯১৯ সালে পাস হয়ে গেলো। এই আইনে বলে, ভারতবাসীর

ব্যক্তিগত অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার হ্রাস করা হলো। এ আইন চালু হওয়ার ফলে আগের সব আইন বাতিল হয়ে গেলো। আইন-আদালতের বাধানিষেধ আর রইলো না। সরকার যাকে যা খুশি করতে পারেন। সরকারের ইচ্ছাই সব।

রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ভারতবাসী মুখর। ভারত জুড়ে মিটিং আর মিছিলের স্রোত বয়ে চলেছে সমানে। ইংরেজ সরকার মোটেই আমল দিলেন না। ভাবলেন, কিছুদিন পর প্রতিবাদের ঝড় থেমে যাবে।

গান্ধীজী রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি ঘোষণা করলেন যদি এ বিল বিধান সভায় গৃহীত হয় তা হলে—"আমরা এ আইন এবং অন্যান্য কোন কোন আইন (যা পরে স্থির করা হবে) অমান্য করবো। কিন্তু আমরা কোন প্রকার বলপ্রকাশ বা হিংসামূলক কাজ করবো না।"

৬ এপ্রিল, ১৯১৯ সাল (৩০ মার্চ তারিখের পরিবর্তে)। সারা দেশে হরতাল পালিত হলো। এ হরতাল সব জায়গায় অহিংসনীতি অনুসরণ করা হয়নি। ঘরবাড়ি পোড়ানো, দোকান লুঠ টেলিগ্রাফের তার কাটা, নিরপরাধ বহু লোককে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। সংগ্রামের পটভূমি ঝড়ের বেগে পরিবর্তন হতে লাগলো। হরতাল সফল হয়েছে দেখে পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত। অমৃতসরে উত্তেজনা ক্রমে বাড়তে থাকে। এদিকে দেশের পরিস্থিতি অনুধাবন করে গান্ধীজী উদ্বিগ্ন। তিনি বোম্বে থেকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ৯ এপ্রিল পথের মধ্যে পালওয়ালে গান্ধীজিকে ট্রেন থেকে নামিয়ে গ্রেপ্তার করা হলো। কেননা দিল্লী ও পাঞ্জাবে গান্ধীজির প্রবেশ নিষেধ আদেশ জারি হয়েছে।

গান্ধীজির গ্রেপ্তারের খবর দেশে দিকি দিকে ছড়িয়ে পড়লো। দেশবাসী উত্তপ্ত। পাঞ্জাবের শাসকমহল ভাবলেন দেশের নেতাদের গ্রেপ্তার করলেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। ডঃ সফিউদ্দিন কিচলু ও ডঃ সত্যপালকে ডেপুটি কমিশনার মিঃ মাইলস্ আরভিং-এর বাংলোয় এসে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু কমিশনারের বাড়ির ভেতরে তাঁদের বন্দী করা হয়। দু নেতাকে বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো—কাংড়া জেলার ধরমশালায়। এতে ফল হলো, উলটো।

একদিকে গান্ধীজি গ্রেপ্তার। অন্যদিকে পাঞ্জাবের দুই নেতা গ্রেপ্তার। দেশ এখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি। দু জন নেতার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে এক বিরাট জনতা ডেপুটি কমিশনারের বাসভবনের দিকে এগোতে লাগলো। উদ্দেশ্য—তাদের নেতাদের মুক্তির দাবি জানানো। পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। ফলে জনতার মধ্যে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

মিছিলের ওপর গুলি চালনায় নিরস্ত্র জনতা খেপে যায়। তারা কয়েকটি সরকারী অফিস ও ব্যাঙ্কে আগুন লাগায়। পাঁচজন ইংরেজকে হত্যা করে। অমৃতসরের অবস্থা চরমে। তাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পড়লো জেনারেল ডায়ারের ওপর।

১৩ এপ্রিল সকাল ৯টায় সেনাবাহিনী নিয়ে জেনারেল ডায়ার শহর টহল দিতে বের হলেন। ঘোষণা করলেন ঃ

"শহরে কিংবা শহরের একাংশে বা বাইরে রাস্তায় কোন শোভাযাত্রা কোনসময় বের হতে দেওয়া হবে না। রাত ৮টার পর কাউকে পথে দেখা গেলে গুলি করা হবে।"

এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা শুরু হয়েছে। এ খবর শুনে জেনারেল ডায়ার রণসাজে সেজে সদলবলে বের হয়ে পড়লেন।

জেনারেল ডায়ার বীরদর্পে সৈন্যদল নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঢুকলেন। দেখলেন, মঞ্চের ওপর একজন বক্তৃতা করছেন। প্রায় ১০ হাজার জনতা শান্তভাবে বক্তৃতা শুনছে।

জেনারেল ডায়ার বাগের একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সৈন্যদের হাতে প্রায় পঞ্চাশটি রাইফেল। মিঃ ডায়ার লোকের ভিড় দেখে দেখে সৈন্যদের গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। গুলি চালনা শুরু হয় বিকেল ৫ টা থেকে ৫ টা ১৫ মিনিটের মধ্যে।

সেদিন জালিয়ানওয়ালবাগে মিটিং-এ উপস্থিত জনতার ওপর জেনারেল ডায়ার কিভাবে আক্রমণ রচনা করেছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী স্যার ভ্যালেনটাইন চিরোল তার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"স্বচক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখা না থাকলে কারো পক্ষে সম্ভবত সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা বোঝা সম্ভব হবে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ একটা পতিত জমি। প্রায়ই মেলা, জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হয়। জায়গাটার আয়তন হয় তো ট্রাফালগার স্কোয়ারের মতই হবে।

প্রায় পুরোটাই প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের বাইরের দিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির পিছন দিকগুলো উঁচু মাথা তুলে রয়েছে। সে সব বাড়ির সামনে শহরের জনাকীর্ণ পথ।

প্রায় পঞ্চাশটি রাইফেল নিয়ে জেনারেল ডায়ার যে সরু গলি দিয়ে সেখানে ঢুকেছিলেন, আমিও সেই পথে ঢুকলাম। জেনারেল যে উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সেখানেও উঠলাম।

ওখান থেকেই কোন রকম হুঁসিয়ারি না দিয়ে তিনি প্রায় একশ গজ রেঞ্জের মধ্যে ঘন ভিড়ের মধ্যে গুলি চালান ; মঞ্চে যেখানে বক্তৃতা হচ্ছিল, সেটা ঘিরেই জনতা বেশী ভিড় করেছিল। সে জায়গাটা আরো ভিতর দিকে।

জেনারেল ছয় হাজার লোকের ভিড় বলে অনুমান করেছিলেন অন্যরা অবশ্য ১০ হাজার বা তারও বেশী মানুষের জমায়েৎ হয়েছিল বলে মনে করেন। সে জনতা কার্যত নিরস্ত্র এবং আত্মরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। কিন্তু জেনারেল দশটা মিনিট উপর্যুপরি সেই ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত অসহায় উদ্বেলিত জনতার উপর নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ করে যান।"

[আনন্দ বাজার ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের ৫০ তম বার্ষিকী সংখ্যা ঃ ৩০ চৈত্র ১৩৭৫ সাল]

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বেদনায় অধীর হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন। এবং বড়লাটের Executive Council থেকে স্যর শঙ্করণ নায়ার পদত্যাগ করেন।

ভারতবাসীর অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার হান্টার কমিটি নিযুক্ত করেন। হান্টার কমিটি জেনারেল ডায়ারকে অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি দিলেন। কমিটি রিপোর্টের এক জায়গায় লিখলেন—"an error of Judgment" অর্থাৎ—জেনারেল ডায়ারের সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে।

নরমেধ যজ্ঞের হোতা কুখ্যাত জেনারেল ডায়ারকে ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা 'বীরত্বের' জন্য অভিনন্দন জানালেন। এবং ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মিঃ চার্চিল।
('ভারতবর্ষের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস'—সুকুমার রায়, পৃঃ—১৫৩) :
"জালিয়ানওয়ালাবাগের শোচনীয় ঘটনার মত ঘটনা বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কদাচ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আধুনিক ইতিহাসে এই ঘটনার তুলনা মিলে না। এই ঘটনা অতি অস্বাভাবিক অতি পাশবিক। স্বীয় বৈশিষ্ট্যে এই ঘটনা একক। জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত জনতার হস্তে যষ্টি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। জনতা কোনও জিনিষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় নাই। জনতা শুধু একটা সভা করিতেছিল। ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য যখন এই জনতার উপর গুলীবৃষ্টি করা হয়, তখন জনতা দৌড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পথ না পাইয়া একটা সঙ্কীর্ণ স্থানে এমন ভাবে ঠাসাঠাসি হইয়া পড়ে যে, একটি গুলি তিন চারজনকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। জনতা এদিক সেদিক দৌড়াইতে থাকে। বাগের মধ্যস্থলে গুলী চালনা করা হইলে লোক বাগের কিনারার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে থাকে। তখন কিনারার দিকে গুলী চালনা করা হয়। লোকে মাটির উপর শুইয়া পড়িলে শায়িত লোকদের উপর গুলী চালনা করা হয়। তারপর যখন দেখা গেল যে, সৈন্যদের হাতে মাত্র নির্বিঘ্নে ফিরিয়া যাইবার মত গুলি আছে, তখন তাহারা ৩৭১টি নিহত এবং ১২০০-এর অধিক আহত লোককে ফেলিয়া চলিয়া যায়। সৈন্যরা যখন ফিরিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের প্রতি একটি প্রস্তর খণ্ড পর্যন্ত নিক্ষেপ করা হয় নাই।"
জাতীয় কংগ্রেস একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করে সাক্ষ্য প্রমাণে জেনারেল ডায়ারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন—"for a cold blooded, calculated massacre of innocent, unoffending, unarmed men, women and children, unparalled for its heartlessness and cowardly brutality in mordern times."
বঙ্গভঙ্গ বাঙালিকে জাগিয়েছিল। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই ভারতবাসীকে রাতারাতি পরাধীনতার ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে দিলো।
জালিয়ানওয়ালাবাগের শোকস্মৃতি ভুলবার নয়, কিশোর উধমসিং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বদলা তিনি নেবেনই।
উধমসিং ইংলণ্ডে গেলেন। অনুসন্ধান করে জানলেন ডায়ার তখন পরলোকে। দীর্ঘ একুশ বছর পরও পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্ণর মাইকেলও ডায়ার জীবিত আছেন।
১৩ মার্চ ১৯৪০ সাল। উধমসিং-এর অব্যর্থ গুলিতে মাইকেলও ডায়ার নিহত হলেন। বিচারে উধমসিং-এর ফাঁসির আদেশ হয়। ১ জুন, ১৯৪০ সাল। বিলেতের পেণ্টনভৌল জেলে বীর উধমসিং-এর ফাঁসি হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডে আসমুদ্রহিমাচল শোকে উদ্বেলিত। এ শোকের তরঙ্গ ভারতের পূর্বপ্রান্তে সূর্য সেনের হৃদয়তটে আছড়ে পড়লো। তিনি গর্জে উঠলেন।
সূর্য সেনের পুরো নাম- সূর্যকুমার সেন। ডাক নাম কালু। বাবার নাম রাজমণি সেন। মায়ের নাম শশীবালা। রাজমণি সেনের দুই ছেলে, চার মেয়ে। সূর্যকুমার রাজমণি সেনের

চতুর্থ সন্তান। দুই ছেলের নাম—সূর্য ও কমল। চার মেয়ের নাম—বরদা সুন্দরী, সাবিত্রী, ভানুমতী ও প্রমিলা।

সূর্য সেনের জন্ম—২২ মার্চ, ১৮৯৪ সাল। বাড়ি রাউজান থানার নয়াপাড়া গ্রাম। জেলা চট্টগ্রাম। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন এ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

মাত্র পাঁচ-ছ বছর বয়সে সূর্য সেন তাঁর বাবাকে হারান। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের দায়িত্ব নেন তাঁর জেঠা গৌরমণি সেন। রাজমণি ও গৌরমণি সহোদর ভাই ছিলেন না।

সূর্য সেন নয়াপাড়া গ্রামের দয়াময়ী উচ্চ প্রাইমারি ইস্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এই ইস্কুলের শিক্ষা শেষ করে নয়াপাড়া হাই ইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েন। এবং প্রতি ক্লাসে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করনে। গ্রামের ইস্কুল থেকে তিনি চট্টগ্রাম শহরে 'ন্যাশানাল হাই ইস্কুলে' ভরতি হলেন এই ইস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯১৫ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেন। তারপর তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এ. পড়ার জন্য ভরতি হন।

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে সূর্য সেন এক আদর্শ অধ্যাপকের সান্নিধ্যে এলেন। তিনি সূর্য সেনকে দেখেই বুঝতে পারলেন, ছেলেটি কেবলমাত্র মেধাবী নয় যেন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। সূর্য সেন মুক্তি পথের সন্ধান করছিলেন। অধ্যাপক খুঁজছিলেন প্রতিভাদীপ্ত আধার। সূর্য সেনকে তিনি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলেন। শুদ্ধ আধারে তিনি সূর্য সেনকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। এই অধ্যাপকের নাম—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি 'যুগান্তর' বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত।

বি. এ. পাস করার পর সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হরিশ দত্তের প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশানাল হাই ইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর চট্টগ্রাম শহরে 'উমাতারা হাই ইস্কুলে' অঙ্ক শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

সূর্য সেন বি. এ পড়াকালীন, পড়ার খরচের জন্য কানুনগোপাড়ার কিশোরী দত্তের কাছ থেকে সূর্য সেনের অভিভাবক কিছু টাকা নেন। শর্ত ছিল কিশোরী দত্তের ভাইঝির সঙ্গে সূর্য সেনের বিয়ে দিতে হবে। ঘটনাচক্রে কিশোরী দত্ত টাকার জন্য কোর্টে কেস করেন। টাকা পরিশোধ দেওয়ায় মামলা তুলে নেন।

এ সম্বন্ধে 'চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা' গ্রন্থে 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি' প্রবন্ধে সূর্য সেনের জেঠতুতো দাদা চন্দ্রকুমার সেন লিখেছেন:

"বি. এ. পড়িবার সময় খরচ নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কানুনগোপাড়ার কিশোরী দত্তের নিকট হইতে তাহার (সূর্য সেনের) অভিভাবক কিছু টাকা গ্রহণ করে। কথা থাকে যে, ঐ টাকার পরিবর্তে সে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিবে। কিন্তু তিনি বিবাহ দেওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া ঐ টাকা আদায়ের জন্য কোর্টে উপস্থিত হন। কোর্টে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা মোকর্দ্দমা জয়ের আশা নাই বলিয়া তাহার (সূর্য সেনের) পক্ষের লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল, ইহাতে সে কোর্টে জবানবন্দী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। টাকা পরিশোধ দিয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করা হইল। মিথ্যাকে সে (সূর্য সেন) কি প্রকার ভয় করিত তাহা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।"

শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনে যোগ দেওয়ার পর সূর্য সেনের আত্মীয়-স্বজনেরা বিয়ের জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

সূর্য সেনের জেঠতুতো দাদা চন্দ্রকুমার সেনের বাসা চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ (দেওয়ানজীর পুকুরের উত্তর পাড়ে)। কানুনগোপাড়ার নগেন্দ্রলাল দত্তের বাসা চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজার। কাছাকাছি বাসা। উভয় পরিবারের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। এছাড়া চন্দ্র সেনের স্ত্রী বিরাজ মোহিনী নগেন্দ্র দত্তের খুড়তুতো বোন। একই বংশের মেয়ে।

নগেন্দ্রলাল দত্ত সরকারি রাজস্ব বিভাগের কর্মী। চন্দ্রকুমার সেন ইস্কুলের শিক্ষক।

নগেন্দ্রলাল দত্তের দু'ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের নাম পুষ্পকুন্তলা। নগেন্দ্রলালের সন্তানদের মধ্যে পুষ্পকুন্তলা সকলের ছোট। পুষ্পকুন্তলা শশিকলার মতো বেড়ে চলেছেন। পুষ্পকুন্তলাকে পাত্রস্থ করার জন্য নগেন্দ্রলাল অধীর হয়ে উঠলেন।

কন্যাদায় গ্রস্ত নগেন্দ্রলাল সূর্য সেনকে তাঁর কন্যার উপযুক্ত পাত্র হিসেবে মনে মনে স্থির করলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সূর্য সেনের অভিভাবককে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সূর্য সেন বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু বিয়ে না করার পক্ষে কোন জোরালো যুক্তি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে তিনি দিতে পারলেন না। বাড়ির গুরুজনদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পুষ্পকুন্তলাকে বিয়ে করলেন।

পুষ্পকুন্তলা ষোড়শী। সুন্দরী। ফরসা ও স্বাস্থ্যবতী। সে যুগে নারী শিক্ষার প্রচলন তেমন ছিল না। তবে তিনি ইস্কুলে কয়েক বছর লেখাপড়া করেছেন। বিদুষী না হলেও তিনি বুদ্ধিমতী। পুষ্পকুন্তলা বিরাজ মোহিনীর সমবয়সী। পুষ্পকুন্তলা খিলখিল করে হাসেন। তাই তাঁর ডাক নাম কটকটি। সূর্য সেনের সঙ্গে পুষ্পকুন্তলার বিয়ের মূলে রয়েছেন বিরাজ মোহিনী। পিসি ভাইঝিতে হলেন জা।

বিয়ের পর সূর্য সেন পুষ্পকুন্তলাকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দেন। পুষ্পকুন্তলা কালী মায়ের ভক্ত। সূর্য সেন মা-কালীর উপাসক। আধ্যাত্মিক দিক থেকে দুজনের মিলন যেন মণিকাঞ্চন যোগ। কিন্তু সমাজের প্রথা সিদ্ধ নিয়মে সূর্য সেন ও পুষ্পকুন্তলার দাম্পত্য জীবন মধুময় হয়নি।

সূর্য সেনের দাদা চন্দ্রকুমার সেন 'স্মৃতিভারে পড়ে আছি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

" সূর্য সেন) বি.এ. পাশ করিবার পর কিশোরীবাবুদের জ্ঞাতি নগেন্দ্রলাল দত্তের কন্যাকে বিবাহ করে। পাত্রী রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তাহা হইলেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার তেমন ছিল না। অভিভাবকগণের পীড়াপীড়িতে সে এই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। উভয়ের সে সম্বন্ধ তেমন মধুর হয় নাই। কারণ উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সংসারের প্রতি তাহার আগ্রহ ছিল না।"

শিক্ষক জীবনে সূর্য সেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের কাছে একজন আদর্শ শিক্ষকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাত্ররা তাদের প্রিয় মাস্টার মশায়ের ব্যবহারে মুগ্ধ। ফলে ছাত্ররা সূর্য সেনকে 'মাস্টারদা' বলে সম্বোধন করতে লাগলো। 'মাস্টারদা' সম্বোধনে তিনি খুব আনন্দ পান। ইস্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের রাজনীতির পাঠও দিতে লাগলেন।

৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সাল। কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন

হয়। এ অধিবেশনে তুরস্কের প্রতি অবিচার পাঞ্জাবের অত্যাচার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির প্রতিকার কল্পে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দেলনের প্রস্তাব দেন। বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট পড়ে ১৮,৮৩৬ এবং বিপক্ষে মাত্র ৮৮৪ ভোট। ভোট গ্রহণের তারিখটি হলো ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ সাল।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাবটি পুনরায় অনুমোদন লাভ করে। অসহযোগ আন্দোলন ভারতের বুকে কী উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছিল সে বিষয়ে প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ 'বিপ্লবী সূর্য সেন' গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ৪০-৪১)

"১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগের প্রস্তাব বিপুল ভেটাধিক্যে গৃহীত হয় এবং ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর এই অসহযোগের প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন লাভ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই আরম্ভ হয়ে যায় 'শয়তান ইংরেজ সরকারের' সাথে ভারতের জনগণের অসহযোগ এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন। গান্ধীজী বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২১ সালের মধ্যেই যদি এক কোটি ভারতবাসী কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করে এবং যদি এক কোটি টাকা কংগ্রেস ভাণ্ডারে জমা পড়ে তা হলে 'স্বরাজ' আসবে। নাগপুর কংগ্রেসের পরেই দেশের সর্বত্র, একমাত্র রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর জাতীয় ইংরেজ সরকারের অনুচরগণ ব্যতীত, সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল নূতন উৎসাহ, নূতন আশা, নূতন কর্মোদ্যম এবং নূতন চাঞ্চল্য। কংগ্রেসের আহ্বানে বহু আইন ব্যবসায়ী আদালত বর্জন করলেন, কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী কাজ ছাড়লেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোকাল বোর্ডের বহু সংখ্যক সদস্য পদত্যাগ করলেন, অগণিত ছাত্র স্কুল কলেজ অর্থাৎ গান্ধীজীর ভাষায় 'গোলামখানা' ত্যাগ করলেন।

"সমগ্র ভারতবর্ষ যেন রাতারাতি জেগে উঠল ; সমগ্র দেশের মানুষ নূতন প্রত্যয়ে, জাতির দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ করবার নূতন সঙ্কল্প এবং নূতন দৃঢ়তা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের এ এক নূতন চেহারা, এক নূতন রূপ। ভারতবর্ষের এই রূপ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। কোটি কোটি মানুষ নির্ভয়ে এবং প্রকাশ্যে সরকার - বিরোধী হ'য়ে উঠেছে ; তাদের কণ্ঠে সংগ্রামের ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্'।"

গান্ধীজীর অনুরোধে বাঙলার বিপ্লবীরা তাঁদের কর্মসূচী এক বছরের জন্য বন্ধ রাখলেন। এবং গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিপ্লবীরা আন্দোলনে যোগ দিলেন।

ভারতবর্ষ জুড়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছে পূর্ণ উদ্যমে। মাস্টারদা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। ছেড়ে দিলেন 'উমাতারা ইস্কুলের' মাস্টারি। এখন পুরোটা সময় বিপ্লবীদল গঠনের কাজে লেগে গেলেন।

মাস্টারদার সুযোগ্য শিষ্য অনন্ত সিংহ ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য প্রবল উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে বাড়িতে তাঁর বাবা নানা যুক্তি দিয়ে ছাত্র ধর্মঘটে যোগ না দেওয়ার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বাবার যুক্তি তিনি সানন্দে মেনে নিতে পারলেন না।

অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ছাত্র ধর্মঘট পরিচালনা করার জন্য অনন্ত সিংহ ইস্কুল থেকে বহিস্কৃত হলেন। এখন অনন্ত সিংহ যেন মুক্ত বিহঙ্গ।
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম (প্রথম খণ্ড) বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন (পৃঃ ১৭) ঃ
"ছাত্র ধর্মঘট সফল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি তখন। আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার স্বর্গীয় দুর্গামোহন গুহ মহাশয় আমার বাবাকে চিঠি লিখে জানালেন যে, আমার নাম যেন স্কুল থেকে কাটিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর মতে আমিই ছাত্র ধর্মঘটের রিং-লিডার' বা 'প্রধান নেতা'।"
অনন্ত সিংহের বাবা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ঃ
"My son Ananta Lal Singh joined Non-co-operation movement in the year 1921. Left study from Matriculation class, Municipal School, Chittagong."
বর্তমান লেখক, অনন্ত সিংহের দাদা নন্দলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে নন্দলাল সিংহ বললেন, তাঁদের আদি নিবাস লক্ষ্ণৌ জেলা। আনুমানিক ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে তাঁর ঠাকুরদা রামবক্স সিং বাঙলাদেশে আসেন।
ছোটবেলায় রামবক্স সিং-এর বাবা মারা যান। তাঁর নিকট আত্মীয় পঞ্চম সিং-এর সঙ্গে তিনি প্রথমে ঢাকা আসেন। তারপর তিনি কুমিল্লা যান। পূর্ববঙ্গেই তিনি লেখাপড়া করেন।
১৮৭৬ সাল। লেখাপড়া শেষ করে রামবক্স সিং সরকারী চাকরি নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। সেই সময় থেকেই তিনি চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে বাস করেন। রামবক্সের স্ত্রীর নাম ভবানী দেবী। ১৯২০ সালে ভবানী দেবীর মৃত্যু হয়।
রামবক্স সিং-এর ছেলের নাম গোলাব সিং। রাজপুত। ক্ষত্রিয়। গোলাব সিং-এর স্ত্রীর নাম রাজকুমারী দেবী।
গোলাব সিং উকিল। চট্টগ্রাম শহরে আইন ব্যবসা করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম—নন্দলাল ও অনন্তলাল। মেয়ের নাম ইন্দুমতী। গোলাব সিং-এর সন্তানদের মধ্যে ইন্দুমতী সকলের বড়।

অসহযোগ আন্দোলন তীব্র ভাঙ্গা ঢেউয়ের মতো চট্টগ্রামের বুকে আছড়ে পড়েছে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে দাঁড়িয়ে যে সব বীর সন্তান আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—কাজেম আলি সাবে, মহিম দাস ও ত্রিপুরা চৌধুরী প্রমুখ। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন।
এই আন্দোলন চলাকালীন চট্টগ্রামে এক ইংরেজ স্টীমার কোম্পানিতে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হলো। একজন জনপ্রিয় কর্মীকে বরখাস্ত করায় ধর্মঘটের সূত্রপাত। বিলাতী কোম্পানিটির নাম—'বুলক্ ব্রাদার্স'। ছাঁটাই কর্মচারীটির অপরাধ—তিনি ইউনিয়ন গঠন করছিলেন।
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'বুলক্ ব্রাদার্স' শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। ইংরেজ সরকার ধর্মঘটের গতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ধর্মঘটের তেরো দিনের দিন প্রায় বারো জন নেতা গ্রেপ্তার হলেন। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কংগ্রেসের

শান্তিপূর্ণ মিছিল বের হলো। শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ নির্মম আক্রমণ চালায়। এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সহ আরো কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে বন্দী করে।

ইংরেজ সরকার চাইলেন তাদের বন্দী করে আন্দোলন বন্ধ করবেন। কিন্তু ফল হলো উলটো। চট্টগ্রামবাসীরা তাদের প্রিয় নেতা বন্দী হওয়ার খবর পেয়ে কাতারে কাতারে থানার সামনে এসে হাজির হলেন। সারা রাত থানার সামনে ঠায় বসে রইলেন। সকাল-বেলা বন্দীদের গাড়িতে করে আদালতে নিয়ে গেলো। জনতা গাড়ির পিছু পিছু আদালতে গিয়ে জড়ো হলেন।

আদালত প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গা নেই। অনেক লোক গাছের ডালে উঠে গেছেন। কেউ বা মোটর গাড়ির মাথায় উঠে পড়েছেন। বিশাল জনতা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছেন—'বন্দে মাতরম্' 'আল্লা হো আকবর।'

চট্টগ্রামের জেলা-শাসক মিঃ স্ট্রং। নামে স্ট্রং হলেও দৈহিক গড়ন—রোগা, লম্বা ও কুঁজো। কিন্তু তিনি একজন দক্ষ শাসক। জনতার ধ্বনি শুনে তিনি পরিস্থিতি অনুধাবন করলেন। জেলা-শাসকের আপোস-মীমাংসায় 'বুলক ব্রাদার্স' বরখাস্ত কর্মীটিকে পুনরায় কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য হলো। ধর্মঘটকারী শ্রমিকেরা জয়ী হলেন। বন্দী নেতারা সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

'বুলক ব্রাদার্স' স্টীমার কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘট সাফল্য লাভ করার পর কিছুদিনের মধ্যে আর একটি ধর্মঘটের ডাক এলো।

এ সময়ে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলের অনেক-গুলি চা বাগান থেকে কয়েক হাজার শ্রমিক দেশের পথে পা বাড়ালো। শ্রমিকেরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চাঁদপুর রেল স্টেশনে ও স্টীমারঘাটে হাজির হলো। শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই বিহারী।

চা বাগানের মালিক ইংরেজ। ফলে চা বাগানের শ্রমিকদের স্টীমারে উঠতে ইংরেজ সরকার বাধা দেন। অগত্যা শ্রমিকেরা সপরিবারে স্টীমারঘাটে বসে রইলো। তবুও তারা চা বাগানে ফিরে যেতে নারাজ। চার-পাঁচ দিন পর এক গভীর রাতে সরকার কয়েক শত গুর্খা সৈন্যকে শ্রমিকদের ওপর লেলিয়ে দেন।

কতো শিশু, গুর্খা সৈন্যের বুটের তলায় প্রাণ দিলো তার কোন হিসাব নেই। কতো নারী ও পুরুষ বেয়নেটের আঘাতে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার হিসাব কোন দিন মিলবে না। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সৈন্যরা মৃতদেহ গুলিকে পদ্মা নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। রাতের আকাশভরা তারাই মানুষের করুণ আর্তনাদের একমাত্র সাক্ষী।

চাঁদপুরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং বাগানের শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট শুরু হলো।

এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। জেলার আপামর জনসাধারণ এই ধর্মঘটকে পূর্ণ সমর্থন জানালো। সূর্য সেন ও তাঁর বিপ্লবীদলের সদস্যরা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এবং ধর্মঘটীদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন।

ধর্মঘট সম্বন্ধে গান্ধীজী "Young India" পত্রিকায় লিখলেন ঃ
"Chittagong is in the fore of the movement." অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনে চট্টগ্রাম পুরোভাগে।
আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট চললো প্রায় তিন মাস। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ব্যর্থ হলো। সরকার কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন। বন্দী হলেন—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কাজেম আলি মিয়া, ত্রিপুরা চৌধুরী, মহিম দাস এবং আরো কয়েকজন।

অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, মাস্টারদা 'উমাতারা ইস্কুলের' শিক্ষকের পদ ত্যাগ করলেন। তারপর চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ান বাজারে 'সাম্যাশ্রম' নাম দিয়ে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সাধু-সন্তদের আশ্রম নয়। সাম্যাশ্রমে কয়েকজন বিপ্লবী যুবক ও মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ দু-একজন বন্ধু বাস করেন। এ বাড়িতে বেআইনী কোন কাজ তিনি করেন না। এমন কি অপরিচিত কোন যুবকের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন না। অসহযোগ আন্দোলনের কাজকর্ম এ বাড়ি থেকে করেন। সেদিক থেকে বাড়িটি কংগ্রেসের আর একটি কর্মকেন্দ্র বলা চলে।
'সূর্য সেন স্মৃতি' বইতে 'মাস্টারদার জীবনের ঘটনাপঞ্জী'-তে লিখেছেন ঃ
"সাম্যাশ্রম প্রকাশ্যে কংগ্রেস কর্মকেন্দ্র এবং গোপনে বিপ্লবী কর্মীদের যোগসূত্রের স্থানরূপে ব্যবহৃত হত।"
অসহযোগ আন্দোলন একবছর চলার পরও স্বরাজ এলো না। ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলছে।
৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সাল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা গ্রামে একটি মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর পুলিশদল একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশ যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশদল ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসে। মারমুখো জনতা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। ফলে বাইশ জন পুলিশের মৃত্যু হয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কারাগারে। তিনি এ খবর শুনে দুঃখ পেলেন।
দেশবন্ধু বলেন, "এত বড় বৃহৎ দেশে চৌরীচৌরা ঘটবেই। তার জন্য সমস্ত প্রদেশে আন্দোলন বন্ধ করবার কোন মানে হয় না।"
অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশের পর ইংরেজ সরকার সুযোগ বুঝে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করলেন।
১৮ মার্চ, ১৯২২ সাল। আহমদাবাদ আদালতে গান্ধীজীর বিচার হয়। বিচারে ছ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেলো। এবার সূর্য সেনের বিপ্লবীদল অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করলেন। অস্ত্র কিনতে হলে চাই অর্থ। অর্থ যোগাড়ের উপায় হিসাবে রাজনৈতিক ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজনৈতিক ডাকাতির সিদ্ধান্ত নিলেই তো আর হলো না। তাকে কার্যকরী করা আর এক সমস্যা। ডাকাতি করবার পর কি ধরনের বিপদ আসতে পারে তার ভাবনায় বিপ্লবীদলের নেতারা অধীর হয়ে উঠলেন। পুলিশ যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ডাকাতিটা সূর্য সেনের দলের কাজ তা হলে দলকে দল গ্রেপ্তার হয়ে যাবে।

সূর্য সেনের বিপ্লবীদল ঠিক করে ফেলেছেন অর্থের প্রয়োজনে ডাকাতি করতেই হবে। তাই মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও জুলু সেন নিজে অথবা বিশ্বস্ত লোক মারফত বিভিন্ন গ্রামের ধনীদের সম্বন্ধে গোপনে খবর নিতে লাগলেন। সংবাদ সংগ্রহের পর ডাকাতির স্থান ও সময় ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তাঁরা সংকল্প থেকে পিছিয়ে পড়েন। কেননা একটা অজানা ভয় তাঁদের যেন তাড়া করে ফিরছে।

শেষ পর্যন্ত সূর্য সেনের বিপ্লবীদল ডাকাতির জন্য বদ্ধপরিকর। ডাকাতি হবে পরৈকোড়া গ্রামের সরসী মহাজনের বাড়ি।

গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যে সাতটা। চট্টগ্রাম শহরের ফিরিঙ্গি বাজারে বিপ্লবীরা নির্মল সেনের বাসায় এসে হাজির হলেন। সেখান থেকে কর্ণফুলি নদী পার হয়ে তাঁদের প্রায় দশ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

শুরু হলো যাত্রা। সঙ্গে নিলেন—তিনটি রিভলবার, চারটি পিস্তল আর একটি ব্রীচলোডার বন্দুক। সিন্দুক ভাঙ্গার কাজে ব্যবহারের জন্য হাতুড়ি, ছেনি, লোহা কাটার করাত ইত্যাদি নিলেন। ডাকাতির সময় ছদ্মবেশ নেওয়ার জন্য নিলেন মুসলমানের পোশাক—লুঙ্গি, টুপি, কুর্তা, দাড়ি ও গোঁফ প্রভৃতি। ঘরের মধ্যে মাটির নীচে কোন ধনদৌলত লুকানো আছে কিনা খুঁড়ে দেখার জন্য নিলেন কোদাল। তা ছাড়া কিছু শক্তিশালী পটকা।

রাত আটটা। বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে দীর্ঘ দশ মাইল পথ হাঁটতে শুরু করলেন। বিপ্লবীদের মুখে কোন কথা নেই। চলার সময় তাঁদের কথা বলা বারণ। কেননা বিপ্লবীদের সঙ্গে চলেছেন একজন দলের বাইরের লোক। লোকটি সরসী মহাজনের বাড়ির সন্ধান দিয়ে ছিলেন।

রাত একটা। বিপ্লবীদলটি পরৈকোড়া গ্রামের প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছলেন। সামনেই পুকুর। সকলে হাত-মুখ ধুয়ে মুসলমানের ছদ্মবেশ নিলেন। প্রত্যেকের হাতে জোরালো টর্চ। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র।

সাতজন বিপ্লবীকে নিয়ে দলটি গঠিত। ডাকাতি দলে বিপ্লবীদের মধ্যে আছেন—জুলু সেন অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, প্রেমানন্দ দত্ত, কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত, সুধাংশু দাসগুপ্ত এবং আরো একজন।

ডাকাতি করার জন্য বিপ্লবীরা পোশাক বদলাচ্ছেন। এমন সময় প্রেমানন্দের পকেট থেকে একটা পটকা মাটিতে পড়ে গেলো। শক্তিশালী পটকার বিকট আওয়াজে নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিলো।

পটকাটা প্রেমানন্দের হাত, পা ও চোখে আঘাতের চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলো। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বমি করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্গীরা তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। এ সব ঘটনা সরসী মহাজনের বাড়ির দুশ' গজের মধ্যে।

সরসী মহাজনের বাড়ির ফটকের কাছে এসে তিনজন বিপ্লবী 'পজিশন' নিলেন। জুলু সেন, অনন্ত সিংহ এবং আরো দুজন বিপ্লবী বাড়ির ভেতরের উঠানে এসে দাঁড়ালেন।
গরমের জন্য বাইরে বারান্দায় সরসী মহাজন মশারির ভেতর অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।
বিপ্লবীদের মধ্যে একজন ডাকলেন, "সরসীবাবু! উঠুন! উঠে পড়ুন!"
গৃহকর্তা ঘুম ভাঙার পর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কারা?"
গৃহকর্তা ডাকাত বুঝতে পেরে পলকে চোঁচা দৌড়। বিপ্লবীদের খেয়াল হলো গৃহকর্তা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি রিভলবার গর্জে উঠলো। হাঁটুতে গুলি লেগে সরসী মহাজন' মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এবং চিৎকার করে প্রতিবেশীদের জানাতে লাগলেন তাঁর বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। প্রতিবেশীরা যেন সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।
সরসী মহাজনের নিকটতম প্রতিবেশী জমিদার যোগেশ রায়ের বাড়ি। পাকা বাড়ি। বড় জমিদার। বাড়িতে সাতটি বন্দুক এবং একটি রিভলবার আছে। ডাকাতির সময় একটি বন্দুকও ব্যবহার করলেন না। কিন্তু গ্রামের লোকজন মশাল, লাঠি, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে জড় হয়েছে। বন্দুকের গুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা ডাকাত তাড়াতে চেষ্টা করলো।
এটি গেলো বাইরের দৃশ্য। বাড়ির ভিতরের দৃশ্য অন্য। ডাকাতের ভয়ে বাড়ির মেয়ে ও শিশুরা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে কান্নার রোল উঠছে। এ এক করুণ দৃশ্য।
এদিকে চারজন বিপ্লবী দু ঘণ্টা ধরে গুপ্তধনের আশায় ঘরের মেঝে খুঁড়ে মাটি উলট-পালট করে চলেছেন। বিপ্লবীরা ভেবেছিলেন সরসী মহাজনের বাড়ি ডাকাতি করলে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো নগদে ও সোনাদানায় পাবেন। ডাকাতি করে যা পেলেন তাতে তাঁদের হতাশ হয়ে ফিরতে হলো। বিপ্লবীরা ডাকাতি করে জিনিস-পত্রে মাত্র ছ শ টাকার মতো পেলেন।
এ ডাকাতির জন্য সূর্য সেনের দলের কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন না। বন্দী হলেন চারুবিকাশ দত্ত এবং তাঁর দলের কয়েকজন সদস্য। আর সিরাজুলহক।
রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য পুলিশের সন্দেহ যাতে সূর্য সেনের বিপ্লবীদলের ওপর না পড়ে, প্রয়োজনীয় সতর্কতা হিসেবে ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের নির্দেশ দেওয়া হলো।
দলের নির্দেশ অনুসারে জুলু সেন সুবোধ বালক সেজে কলকাতায় পারিবারিক ব্যবসা দেখতে লাগলেন। মাস্টারদা 'নর্মাল ইস্কুল' নামে একটি হাই ইস্কুলে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। নির্মল সেন পড়াশুনায় মন দিলেন।
অনন্ত সিংহের বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী গণেশ ঘোষ কলকাতায় 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে (বর্তমানে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ) পড়েন। বন্ধু গণেশ ঘোষের অভাব অনন্ত সিংহকে ব্যথিত করে তুললো। অনন্ত সিং স্থির করলেন তিনিও 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে' পড়বেন।
গণেশ ঘোষ পড়েন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড মিক্যানিক্যাল—এর সেকণ্ডারি কোর্স। অনন্ত

সিংহ পড়বেন প্রাইমারি কোর্সে। ইতিমধ্যে কলকাতায় পড়ার জন্য অনন্ত সিংহ অতিকষ্টে তাঁর বাবা ও মাকে রাজি করিয়েছেন।

বি টি ইনস্টিটিউশনের প্রাইমারী কোর্সে সীট্-এর ব্যবস্থা করে গণেশ ঘোষ অনন্ত সিংহকে টেলিগ্রাম করলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা এলেন।

মহানগরীর আনন্দ স্রোতে অনন্ত সিংহ গা ভাসিয়ে দিলেন। কলকাতা আসার উপলক্ষ লেখাপড়া হলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য বিপ্লবের রাজপথে পরিভ্রমণ করা।

অনন্ত সিংহ জুলু সেনের মাধ্যমে কলকাতার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে হলেন—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভূপেন দত্ত ও অনুকূল মুখার্জি প্রমুখ।

জুলু সেন কলকাতার প্রত্যেক বিপ্লবীদলের নেতাদের কাছে সুপরিচিত। চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দলের পক্ষে কলকাতায় অন্যান্য বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করছেন। তিনি অনন্ত সিংহকে বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই পরিচয় অনন্ত সিংহের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী জীবনে প্রভূত সাহায্য করেছে। অনুকূল মুখার্জি, অনেক আগ্নেয়াস্ত্র 'স্মাগলারদের' কাছ থেকে কিনে দিয়ে সূর্য সেনের দলকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে আপ্রাণ সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া কলকাতার বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানির আগ্নেয়াস্ত্র অপহরণে এই মহান নেতার অবদান অসামান্য।

অনুকূল মুখার্জির সঙ্গে অনেক স্মাগলারদের পরিচয় ছিল। অনন্ত সিংহকে তিনি স্মাগলারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুকূল মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে অনন্ত সিংহ 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ-৭৯-৮১) ঃ

"এই সময় অনুকূলদার সঙ্গে জুলুদা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাংলার সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অনুকূলদার দান সর্বোত্তম। জুলুদা নিজের অজ্ঞাতে আমার যে উপকার করলেন, তা ভবিষ্যতে আমার বিপ্লবী জীবন গড়ে তুলতে কতখানি সাহায্য করবে তা হয়ত তিনি সেদিন কল্পনাও করতে পারেন নি।...

"বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ দাদাদের মধ্যে আমি অনুকূলদাকেই সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম। ১৯২১-২৪ সালে আমাদের জন্য তিনি স্মাগ্‌লারদের কাছ থেকে অস্ত্র এনে দিতেন—জুলুদা কলকাতায় ওঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এর সাত বছর পরে অনুকূলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হল। তিনি আমাদের যে সাহায্য করলেন তার তুলনা নেই। সেটা অন্য গল্প। তবে, সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই অনুকূলদার অন্তরের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমার মনকে স্পর্শ করেছিল।...আমাকে তিনি কি চোখে দেখেছিলেন জানি না,—কেন অতটা বিশ্বাস করেছিলেন তাও জানি না—আমাকে ১৯৩০ সালে বহু স্মাগ্‌লারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।"

পরৈকোড়া গ্রামে ডাকাতির পর চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য স্বাভাবিক জীবনে মনোযোগ দিলেন। এ সময়ের মধ্যে সন্তোষ মিত্রের দল কলকাতা ও

তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল কোনা, উল্টাডাঙ্গা পোস্ট অফিস, গড়পারে একটা তেলের কারখানা শাঁখারীটোলা পোস্ট অফিস এবং আরো কয়েকটি জায়গায় ডাকাতি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতোগুলি ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার ফল যা হবার তাই হলো।

সন্তোষ মিত্র ও তাঁর দলের অনেক সদস্য বন্দী হলেন। দেবেন দে (খোকা) ও গোপীনাথ সাহা পলাতক। তাঁদের দুজনকে সূর্য সেনের বিপ্লবীদল কলকাতায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন।

বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। অনেক বিপ্লবী নেতা বন্দী হয়েছেন। অনেকে আত্মগোপন করে আছেন। এ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জুলু সেন কলকাতায় গোপন মিটিংয়ে বসলেন। মিটিংয়ে উপস্থিত বিপ্লবীরা হলেন— জুলু সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ এবং যশোদারঞ্জন পাল।

গোপন মিটিং চলছে। জুলু সেন দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "সরকার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে চান। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। এখুনি অস্ত্র চাই। অস্ত্র কেনার জন্য চাই টাকা। এ মতো অবস্থায় ডাকাতির কথা ভাবাই যায় না। পুলিশের দৃষ্টির বাইরে থেকে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।"

অনন্ত সিংহ সদর্পে বললেন, "আমি আমার বাড়ি থেকে অস্ত্র কেনার টাকা এনে দেবো।"

মিটিং শেষ। অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম যাত্রা করলেন। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছলেন। তাঁর উপস্থিতিতে বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। তারপর তাঁর মা কলেজ ছুটির আগে বাড়ি আসার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তর তৈরি।

অনন্ত সিংহ বললেন, "মা, ছুটির আগেই আমাদের সিলেবাসের পড়া শেষ। তাই আগেই ক্লাস ছুটি দিয়েছে। হোস্টেলে থাকলে চার্জ লাগবে। তাই চলে এলাম। গণেশও দুসপ্তাহের মধ্যে এসে পড়বে।"

কলকাতা থেকে হটাৎ চট্টগ্রাম আসার উদ্দেশ্য অনন্ত সিংহ তাঁর দিদি ও দাদাকে বললেন। বাড়ি থেকে টাকা সরানোর ব্যাপারে তাঁর দাদা ও দিদি তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অনন্ত সিংহের বাবা গোলাব সিং আইন ব্যবসা ছাড়াও বন্ধকী ব্যবসা করেন। তাঁর বাবার অনুপস্থিতিতে এ কাজ সমাধা করতে হবে। ইন্দুমতী সিংহ বন্ধকী ব্যবসাতে তাঁর বাবাকে সাহায্য করেন। আলমারীর মধ্যে কোন থলিতে কত টাকা আছে তাঁর সব জানা।

সুযোগ এসে গেলো। গোলাব সিংহ তাঁর বড় ছেলে নন্দলালের বিয়ের পাকা কথা বলার জন্য বরিশাল শহরে গেছেন। পরদিন সকাল ন'টা অনন্ত সিংহের মা স্নান করতে গেছেন। ঘর ফাঁকা। দিদি ইন্দুমতী ভাইয়ের হাতে আলমারীর চাবির গোছা তুলে দিলেন। এক লহমায় আলমারী খুলে দুটি থলি নিয়ে তিনি সাইকেলে উধাও। পরিকল্পনা মতো অম্বিকা চক্রবর্তী টাকার থলি নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর হাতে থলি দুটি দিয়ে অনন্ত সিংহ বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়ে চলে গেলেন সাইকেলে।

দুটি থলির মধ্যে টাকা এবং অনন্ত সিংহের মায়ের কিছু সোনার গয়না ছিল। গোলাব

সিংহ তাঁর Diary-তে কেবল টাকার কথা লিখেছেন—"Ananta took from home Rs. 1381/-."

ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় নন্দলাল সিংহ ইউরোপীয়ান পল্টনের মাঠে এসে ভাই অনন্তলালের সঙ্গে দেখা করলেন।

নন্দলাল অনন্তলালকে বললেন, "পিসেমশাই তোর ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। তিনি পুলিশকে জানাতে চেয়েছিলেন। মা বারণ করলেন। শিগ্‌গির বাড়ি ফেরার জন্য বাবাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে।"

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের পিসেমশাই চন্দ্রশেখর রায় চট্টগ্রাম শহরের বাইরে চলেছেন অনন্ত সিংহের খোঁজে। গণেশ ঘোষ 'টাকা চুরির' কথা আগে থেকে জানেন। কিন্তু ভান করে আছেন।

একই ট্রেনে অনন্ত সিংহেরও কলকাতা রওনা হবার কথা। অনন্ত সিংহের কাছে খবর পাঠানো হলো, তিনি যেন তাঁর প্রোগ্রাম বাতিল করেন। অনন্ত সিংহ পরের ট্রেনে কলকাতা চলে গেলেন।

অনন্ত সিংহের খোঁজে গণেশ ঘোষ ও চন্দ্রশেখর রায় চাঁদপুর গিয়ে পৌঁছলেন। অনন্ত সিংহের বাবা তার পেয়ে বরিশাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে চাঁদপুর স্টেশনে গণেশ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

গণেশ ঘোষের মুখে অনন্তলালের কাণ্ডকারখানা শুনে গোলাব সিং বললেন, "আমি মনে করবো সে মরে গেছে।"

অনন্ত সিংহ বাড়ির টাকা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় তালতলার গোপন আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন। এ আশ্রয়ে দেবেন দে ও গোপীনাথ সাহা আছেন। কয়েকদিনের মধ্যে জুলু সেনও তালতলার আস্তানায় এসে হাজির হলেন। এখন তাঁরা চারজন।

চারজন বিপ্লবী মিলে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—গোপীনাথ সাহা মিঃ টেগার্টকে হত্যা করবেন। তাঁকে সাহায্য করবেন—অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও জুলু সেন। প্রত্যেকের হাতে রিভলবার থাকবে। এ ছাড়া দেবেন দে ও অনন্ত সিংহের হাতে থাকবে একটি করে টাইম বোমা। সাইকেলে জুলু সেন ঘুরে ঘুরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে বিপ্লবীদের সাহায্য করবেন।

মিঃ টেগার্ট হত্যা পরিকল্পনার কথা গণেশ ঘোষ জানতেন। একদিন গণেশ ঘোষ গোপীনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ টেগার্টকে চিনতে ভুল হবে না তো?"

গোপীনাথ জোর দিয়ে বললেন, "এতে আমার কোন ভুল হবে না।"

গোপীনাথ বহুদিন ধরে মিঃ টেগার্টের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছেন। মিঃ টেগার্ট রোজ সকালে কীড্ স্ট্রীটের বাংলো থেকে বের হয়ে হেঁটে চৌরঙ্গীতে হাওয়া খেতে যান। সঙ্গে থাকে একটি ছোট্ট টেরিয়র কুকুর।

শীতের সকাল। পরিকল্পনা মতো চারজন বিপ্লবী তালতলা আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বের হলেন। গোপীনাথের মুসলমানের পোশাক। তাঁর পরনে লুঙ্গি মাথায় ফেজ টুপি এবং

গালের কাটা দাগ ঢাকার জন্য উলের স্কার্ফ। দেবেন দে-র সাহেবী পোশাক। অনন্ত সিংহের পোশাক বাঙ্গালির।

গোপীনাথ এগিয়ে গেলেন। অনন্ত সিংহ প্রায় সত্তর গজ দূরে দাঁড়িয়ে চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। এমন সময় জুলু সেন সাইকেলে এসে অনন্ত সিংহের কাছে হাজির।

জুলু সেন অনন্ত সিংহকে বললেন, "প্রোগ্রাম বাতিল। এখুনি গোপন আশ্রয়ে ফিরে যাও। দেবেন দে-র গায়ে আগুন লেগেছে।"

আগুন লাগার হেতু হলো—দেবেন দে বোমাতে আগুন লাগানোর জন্য শিশির মধ্যে লোশন নিয়েছিলেন। শিশি থেকে লোশন গড়িয়ে জামা, কাপড়ে লাগে। কার্বন-ডাইসালফাইড উড়ে যাওয়ার পর ফস্‌ফরাসে বাতাসের অক্সিজেন লাগার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে।

দেবেন দে বুদ্ধির জোরে বেঁচে যান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার জল দেওয়া হাইড্রেণ্ট থেকে জল দিয়ে আগুন নিবিয়ে ফেলেন। মিঃ টেগার্টের নিধন পর্ব আপাততঃ স্থগিত রইলো।

সেই রাতেই চারজন বিপ্লবী গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে মিটিংয়ে বসলেন। জুলু সেন জানতেন, অনন্ত সিংহ রেলওয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার প্ল্যান দেড় বছর আগে করেছিলেন। এতোদিন পর্যন্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়নি। অনন্ত সিংহ তাঁর বাড়ি থেকে যে টাকা চুরি করে এনে দলকে দিয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। অস্ত্র কেনার জন্য আরো টাকা চাই।

মিটিংয়ে স্থির হলো—মিঃ টেগার্টকে হত্যার জন্য গোপীনাথ ও জুলু সেন থাকবেন কলকাতায়। এ ষড়যন্ত্রের নায়ক হলেন জুলু সেন। জুলু সেনের নির্দেশে অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে যাবেন চট্টগ্রাম। সেখানে মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে এবং মাস্টারদার আদেশ অনুসারে তাঁরা টাকা যোগাড় করবেন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা জুলু সেন। জুলু সেনের আদেশ পেয়ে অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম রওনা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে আছে—একটি ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের মধ্যে আছে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য, বিস্ফোরক, গুলি, বারুদ, একটি ব্রীচলোডার বন্দুক ইত্যাদি। হোল্ড্‌-অল-এ বিছানার ভেতর আছে একটি আর্মি রাইফেল। তাঁদের সাহেবী পোশাকের তলায় মোট দুটি রিভলবার।

অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে নিরাপদে চট্টগ্রাম পৌঁছলেন। তাঁরা সতীভূষণ সেনের বাসায় গিয়ে উঠলেন। সতীভূষণ সেন 'ন্যাশনাল স্কুলের' দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। ক-দিন পর শহর থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে শহরতলীতে একটি ঘর ভাড়া করলেন। বাড়িটি 'বাহাদ্দার হাটের' কাছে। বাড়িটি বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পোড়ো বাড়ি।

বাড়িটির নাম—'সুলুক বাহার'। এটি বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টারস। এখানে স্থায়িভাবে থাকেন—অনন্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস, উপেন ভট্টাচার্য ও নির্মল সেন। এ ছাড়া মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী সময়-সময় এসে থাকেন।

রেলওয়ের টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অনন্ত সিংহ সুধাংশু দাসগুপ্তের কাছে বিশদভাবে খোঁজ নিলেন। এ. বি রেলওয়ে কোম্পানির কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় প্রতি মাসে দুবার। প্রথমে এক-দুই তারিখ, পরে চৌদ্দ-পনের তারিখ।

রেলওয়ে কোম্পানির টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে বার বার মিটিং হয়। শেষ পর্যন্ত পাঁচজন বিপ্লবী মিলে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। মাস্টারদা প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলেন। অনন্ত সিংহকে দলের নেতা নির্বাচন করা হলো। দলের পাঁচজন হলেন—অনন্ত সিংহ, (নেতা) নির্মল সেন, দেবেন দে, রাজেন দাস ও উপেন ভট্টাচার্য।

ঘটনার দিন সকাল সাতটায় নির্মল সেন অনন্ত সিংহের অনুমতি নিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে শহরে গেলেন। নির্মল সেন ঘটনাস্থলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে হাজির থাকতে পারলেন না।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল। সকাল দশটা বাজার দশ মিনিট আগে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর মোড়ে চারজন বিপ্লবী 'পজিশন' নিয়ে দাঁড়ালেন।

এমন সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে হেড অফিসের কর্মী মিঃ মোকলাস রহমানের সঙ্গে অনন্ত সিংহের দেখা। রহমান সাহেব প্রায় দশ বছর আগে অনন্ত সিংহের প্রতিবেশী ছিলেন। এখন চলেছেন অফিসে। তিনি অনন্ত সিংহকে চেনেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন কথা হলো না।

দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে আসছে। ঘোড়ার গাড়িতে আছে রেলওয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের বেতনের টাকা। অনন্ত সিংহের সঙ্গে আছে সাইকেল। সাইকেলটা রাস্তায় ফেলে দিলেন। এক লাফে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ডান হাতে রিভলবার। চিৎকার করে অনন্ত সিংহ কোচম্যানকে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিলেন।

বুক লক্ষ্য করে রিভলবার উঁচিয়ে আছে দেখে কোচম্যান হতভম্ব হয়ে গাড়িটা থামাতে চেষ্টা করলো। পলকে ডাকাতের হাতে পড়েছে বুঝতে পেরে গায়োয়ান ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক কষালো। ঘোড়া ছুট দিলো। অনন্ত সিংহ লাফ দিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। অনন্ত সিংহের পরাক্রমের কাছে ঘোড়া দুটি হার মানলো। ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়লো।

অনন্ত সিংহের চিৎকার শুনে এবং উদ্যত রিভলবার দেখে প্রমাদ গুনলো আরোহীরা। ততক্ষণে দেবেন দে ঘোড়ার গাড়ির কাছে এসে পড়েছেন। তিনি রিভলবার দেখিয়ে গাড়ির আরোহী ও কোচম্যানকে গাড়ি থেকে নামতে আদেশ দিলেন।

দুজন পে-ক্লার্ক ও দুজন পিয়ন ভয়ে জড়সড় হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। কোচম্যানকে জোর করে নামানো হলো। দেবেন দে গাড়োয়ানের আসনে বসে পড়লেন। হেড পে-ক্লার্ক তাঁর অফিসের পিয়নকে গাড়ি থেকে টাকার থলিগুলি নামিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। পিয়ন কয়েক পা এগোতেই অনন্ত সিংহ গুলি করবেন, এই বলে ভয় দেখালেন। পিয়ন বেচারা ভয়ে কাঠ।

এই সময়ের মধ্যে দেবেন দে টাকা সমেত ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। চলন্ত গাড়িতে রাজেন দাস ও উপেন ভট্টাচার্য লাফিয়ে উঠে পড়লেন।

ডাকাতির পর বিপ্লবীরা ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে সরকারী কলেজের কাছে এলেন। ঘটনাস্থল থেকে সরকারী কলেজের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল। এখানে তিনটি রাস্তা এসে মিশেছে। পাশেই পাহাড়। বিপ্লবীরা কোন দিকে গেছেন যাতে বুঝতে

না পারে অরজন্য ঘোড়া দুটির লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। গাড়ি পড়ে রইলো নির্জনে।

টাকা ভরতি চারটি থলি। দুটি থলিতে নোট অন্য দুটি থলিতে কাঁচা টাকা ও খুচরো পয়সা। রূপোর টাকার থলিটি বেজায় ভারি। থলি চারটি নিয়ে বিপ্লবীরা 'সুলুক বাহার' বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

রূপোর টাকার থলিটি নিয়েছেন দেবেন দে। ভারি থলি বহন করতে তিনি অক্ষম। তাই পথ চলতে মাঝে মাঝে হাত থেকে থলিটি পড়ে যাচ্ছে।

রূপোর টাকার থলিটি মাটিতে পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনে অনেক পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলো।

একজন পথিক রসিকতা করে বললো, "বাবু অনেক টাকা না? আমাদের কিছু দিয়ে যান।"

বিপ্লবীরা গোপন আশ্রয়ে গিয়ে উৎসাহভরে সঙ্গে সঙ্গে টাকাগুলি গুনে ফেললেন। প্রায় সতেরো হাজার টাকা।

নোট হলো পনোরা হাজার। নোটগুলি একটি সুটকেশে ঢোকানো হলো। টাকাগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। পরিকল্পনা মতো অম্বিকা চক্রবর্তী টাকা ভর্তি সুটকেশটি নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন উপেন ভট্টাচার্য।

মাস্টারদা ইস্কুলে বসে রেলওয়ের টাকা ডাকাতির কথা ছাত্রদের কাছে শুনেছেন। তবে ভাসা ভাসা। প্রকৃত ঘটনা তাদের মধ্যে কেউ দেখে নি। তাই মন তাঁর উচাটন।

সন্ধ্যেয় 'সুলুক বাহার' গোপন আশ্রয়ে ফিরে মাস্টারদা অনন্ত সিংহ ও তাঁর সাথীদের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানলেন। বিনা রক্তপাতে এ জয় সম্ভব হয়েছে জেনে মাস্টারদা বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানালেন।

দুদিন পর অম্বিকা চক্রবর্তী 'সুলুক বাহার' বাড়িতে ফিরে এলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেলো, পুলিশ অনন্ত সিংহের বাড়ি সার্চ করেছে। তার কারণ রাস্তায় যে সাইকেলটা অনন্ত সিংহ ফেলে এসেছিলেন সেই সূত্র ধরে পুলিশ অনুসন্ধান চালায়।

সাইকেলটা দেড় বছর আগে উপেন সেনের বাড়ি থেকে চুরি যায়। চুরি করেন বিপ্লবী-দলের সদস্য সুকুমার বিশ্বাস। উপেন সেন সাইকেলটা একটা দোকান থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন। তখন গুজব রটে যায় অনন্ত সিংহ সাইকেলটা চুরি করেছেন। রেলওয়ে কোম্পানীর টাকা ডাকাতির পর পুলিশ তদন্ত করতে সাইকেলের দোকানে যায়। তখন দোকানের মালিক এ বিবরণ দেয়।

ডাকাতির টাকা দুভাগে বিভক্ত করে অম্বিকা চক্রবর্তী ও মাস্টারদার প্রিয় ছাত্র দলিল রহমান কলকাতায় নিয়ে গেলেন। দশ দিনের দিন সকাল বেলা অম্বিকা চক্রবর্তী ও মাস্টারদা 'সুলুক বাহার' আস্তানায় এলেন। অম্বিকা চক্রবর্তী কলকাতায় টাকা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

অম্বিকা চক্রবর্তী কলকাতার খবর পরিবেশন করলেন। কলকাতার খবর হলো—চট্টগ্রাম শহরে রেলওয়ে কোম্পানির টাকা ডাকাতির পর তৃতীয় দিনের দিন পুলিশ জুলু সেনের ডাইং ক্লিনিং সার্চ করে। জুলু সেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক। তাঁর দেহের গড়ন যেন

কোষ মুক্ত তরবারি। তিনি অতর্কিতে একজন পুলিশকে আক্রমণ করলেন। পুলিশ ধরাশায়ী। জুলু সেন উধাও। এখন তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে আত্মগোপন করে আছেন।
পুলিশের দৌড় এখানেই শেষ নয়। কলকাতায় গণেশ ঘোষের হোস্টেল সার্চ হলো। তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে পুলিশ। গণেশ ঘোষ মেধাবী ছাত্র। শিক্ষকদের সুপারিশের জোরে তিনি এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন।

অম্বিকা চক্রবর্তীর কলকাতার খবর বলা শেষ হলো। তার কিছুক্ষণ পরে নাটকীয় দৃশ্যের মতো পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আবদুল মজিদ 'সুলুক বাহার' বাড়ির সামনে এসে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন।
বেলা দশটা। পুলিশের সঙ্গে কৌতূহলী জনতাও বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্রে এসে ভিড় করেছে। পুলিশ অফিসার বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডাকলেন। ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন—মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস। অনন্ত সিংহ ঘরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন।
পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপ্লবীরা তালগোল পাকিয়ে দিলেন। এমন কি মাস্টারদাও যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না। পুলিশের জেরার উত্তরে মাস্টারদা বললেন তিনি 'বুলক ব্রাদার্স কোম্পানিতে' কাজ করেন। কিন্তু সেই কোম্পানির বড় সাহেবের নাম বলতে পারলেন না।
বিপ্লবীরা মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন না। বিপদের ওপর বিপদ। পাড়ার একজন লোক বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে অনন্ত সিংহকে দেখতে পেলো।
অনন্ত সিংহকে দেখেই লোকটা তারস্বরে চিৎকার করে বললো, "ডাকাত ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।"
লোকটার নাম ঠাণ্ডা মিঞা। বিপ্লবীরা 'ডাকাত' কথাটার জোর প্রতিবাদ জানালেন। পুলিশ অফিসার আবদুল মজিদ নিমিষে বুঝে নিলেন, তিনি সিংহের গুহায় এসে। পড়েছেন। এখন জান নিয়ে বাঁচা দায়।
মজিদ সাহেব সঙ্কটময় অবস্থা বুঝতে পেরে বিপ্লবীদের ডাকাত বলার জন্য জনতার উদ্দেশ্যে জোর বকাবকি করলেন। গ্রামবাসীর অজ্ঞতার জন্য গ্রামবাসীর পক্ষে পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। এবং বিপ্লবীদের কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা উপহার দিলেন। চলে যাওয়ার সময় নমস্কার জানালেন।
পুলিশ অফিসার চলে গেলেন। যাওয়ার সময় চৌকিদার ও দফাদারদের গোপনে বলে গেলেন কৌশলে তারা যেন ডাকাতদের ঘেরাও করে রাখে। পুলিশ বাহিনী এলো বলে। বিপ্লবীদের শিয়রে শমন। এদিকে স্থানীয় লোকজন মাছ ধরার জন্য জাল যোগাড় করে বাড়ির কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়লো। বিপ্লবীদের নিষেধ তারা মানলো না। আর ওদিকে ঘটনাস্থলে তাড়াতাড়ি পুলিশবাহিনী পাঠাতে পুলিশ অফিসার স্থানীয় এক জমিদার বাড়ি থেকে টেলিফোনে থানায় নির্দেশ পাঠালেন।

এর মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তী একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি একটি কলসি নিয়ে জল আনার ছলনায় বাড়ি থেকে বের হলেন। দু মিনিট পর মাস্টারদা একটি ঘটি হাতে বের হয়ে পড়লেন। মাস্টারদা সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন।

ঘরে ঢুকে মাস্টারদা বললেন, "অম্বিকাবাবুকে কয়েকজন লোক ঘিরে রেখেছে। যেতে দিচ্ছে না।"

শীতকাল। পলকে বিপ্লবীরা চাদর দিয়ে গা ঢাকলেন পোশাকের তলায় টোটা রাখার থলি, অস্ত্রশস্ত্র আর গোলা-বারুদ নিয়ে নিলেন। বিপ্লবীরা সারিবদ্ধভাবে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন। সবার আগে মাস্টারদা। সবার পেছনে অনন্ত সিংহ। মাঝখানে দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস।

কয়েকজন লোক মাস্টারদার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। মাস্টারদা রিভলবার বের করে পথ ছাড়ার আদেশ দিলেন। মাস্টারদার জ্বলন্ত চোখ দেখে গ্রামবাসীরা ভয়ে পথ ছেড়ে দিলো। কিন্তু জনতা বিপ্লবীদের পিছু তাড়া করলো।

বিপ্লবীরা নিরুপায় দেখে রিভলবারে ফাঁকা আওয়াজ করলেন। জনতা বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। এবং তারা গুলির ভয়ে নিরাপদ দূরত্বে রইলো। জনতা ইতিমধ্যে বন্দুক যোগাড় করে ফেলেছে।

এবার বিপ্লবীরা 'মশার পিস্তল' ব্যবহার করে জনতার থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। মশার পিস্তলের গুলি আধ মাইল সক্রিয় থাকে।

সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় জনতা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত জনতার তাড়া খেতে খেতে বিপ্লবীরা বারো মাইল পথ অতিক্রম করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সামনেই পাহাড়ের সারি। ভয়ে জনতা আর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে সাহস পেলো না।

বিপ্লবীরা দেখলেন পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটি খাল ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। তাঁরা প্রাণভরে জল খেলেন। বিশ্রাম নিলেন। তারপর পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন।

পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা পার হয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়ের উপর উঠবেন পাহাড়টির নাম —'নাগারখানা'। রাস্তা পার হবার সময় বন্দুকধারী একজন চৌকিদারের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো।

চৌকিদার আগন্তুকদের দেখে হাঁক দিলো। অনন্ত সিংহ চৌকিদারের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন। চৌকিদারে প্রশ্ন গুলি হলো—তোমরা কারা ? কোথায় থাক ? কোথায় যাচ্ছ ইত্যাদি। উদ্দেশ্য—চৌকিদারকে ব্যস্ত রাখা ? এ সময়ের মধ্যে মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, রাজেন দাস ও উপেন ভট্টাচার্য পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন।

অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে এক পা করে চৌকিদারের দিকে এগোতে লাগলেন। চৌকিদারের কাছাকাছি পৌঁছে অনন্ত সিংহ এক ঝটকায় ডান হাতে রিভলবার বের করে নিলেন। বাঁ-হাতে চৌকিদারের বন্দুক ধরে কেড়ে নিতে চেষ্টা করলেন। দু জনের মধ্যে চললো ধস্তাধস্তি। ফলে বন্দুক ও রিভলবার থেকে একটি করে গুলি বের হয়ে গেলো। প্রাণভয়ে চৌকিদার বন্দুক ফেলে পালালো। অনন্ত সিংহ বন্দুকটা ভেঙ্গে দু টুকরো করে দিলেন।

বেলা দুটা। অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে উঠছেন খাড়া পাহাড় বেয়ে। দু জনের শারিরীক অবস্থা একেবারে কাহিল। অনন্ত সিংহ পাহাড়ের অনেকটা উঠে গেছেন। দেবেন দে নিচে।

দেবেন দে হঠাৎ করুণ কাতর ডাক দিলেন, "অনন্ত, অনন্ত! আমার পায়ে গুলি লেগেছে। হাঁটতে পারছি না। নেমে এসো তাড়াতাড়ি। আমাকে নিয়ে যাও। আমি যেতে পারছি না।"

অনন্ত সিংহ নেমে এসে দেখলেন, দেবেন দে-র গায়ে কোথাও গুলির দাগ নেই। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। আর হাঁপাচ্ছেন। প্রকৃত পক্ষে দেবেন দে-র দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। তাই এ দশা। আরো একটা কারণ হলো—অনন্ত সিংহ ও চৌকিদারের মধ্যে ধস্তাধস্তি দেখে আতঙ্কগ্রস্ত তিনি।

অনন্ত সিংহ দেবেন দে-কে পিঠে চাপিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। অতিকষ্টে তিনি দেবেন দে-কে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেন। বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছেন। কারো চলার শক্তি নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশবাহিনী পাহাড় ঘিরে ফেললো। হুইসেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিপ্লবীরা রিভলবার ও পিস্তল হাতে নিয়ে তৈরি।

পুলিশবাহিনী 'জানের কি পরোয়া' ধ্বনি দিতে দিতে পাহাড়ের ওপর উঠে আসছে। অনন্ত সিংহ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে ওতপেতে রইলেন। রিভলবারের পাল্লার মধ্যে পেয়ে তিনি পর পর দু রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লেন। দুই গুলিতে দুজন সিপাই খাড়া পাহাড় থেকে পাথর খণ্ডের মতো গড়াতে গড়াতে নিচে পড়তে লাগলো। অন্য সেপাইরা বীরদর্পে পশ্চাদপসরণ করলো। একটি গুলি লেগেছে সেপাই বীরমোহন বড়ুয়ার হাঁটুতে। অন্যটি আলি হোসেনের কণ্ঠ-অস্থিতে।

অগ্নিযুগের কিংবদন্তী পুরুষ অনন্ত সিংহ। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। তাঁর অস্ত্রগুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক জুলু সেন। তিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের দ্রোণাচার্য। অনন্ত সিংহ হলেন—অর্জুন।

অনন্ত সিংহ সেপাইদের হটিয়ে দিয়েও দলের মনোবল ধরে রাখতে পারলেন না। বিপ্লবীরা চলৎশক্তি রহিত। মাস্টারদা অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পরামর্শের বিষয়বস্তু হলো—শরীরকে বহন করবার শক্তি যখন বিপ্লবীদের নেই তখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে বিষ খাওয়া শ্রেয়। এবং গৌরবের।

অনন্ত সিংহ পুলিশ বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিয়ে শিবিরে পৌঁছলেন। মাস্টারদা অনন্ত সিংহকে বললেন, "আমি. অম্বিকাবাবু ও রাজেন পটাসিয়াম সায়ানাইট খেয়েছি।"

দেবেন দে ও উপেন ভট্টাচার্য বিষ খান নি।

দেবেন দে অনন্ত সিংহকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি করবে?"

অনন্ত সিংহ বললেন, "এখান থেকে পালাতে পারলে ভালো। নতুবা লড়াই করেই প্রাণ দেবো।"

মাস্টারদাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে রাজেন দাস বিষ খাওয়া অবস্থায় অনন্ত সিংহের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। পা কাঁপতে কাঁপতে তিনি পড়ে গেলেন। দেহ স্থির হয়ে গেলো।

অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও উপেন ভট্টাচার্য চললেন অজানার পথে। পথের শেষ প্রান্তে কি

আছে কে জানে। পাহাড়ের তিনদিকে তাঁরা পালাতে চেষ্টা করলেন। শত্রু পক্ষ বিপ্লবীদের বন্দুকের গুলিতে অভ্যর্থনা জানালো। বিপ্লবীরাও গুলিতেই তার জবাব দিলেন। বিপ্লবীরা তিন দফায় প্রায় আধ ঘণ্টা গুলি বিনিময় করলেন। কিন্তু পালানো সম্ভব হলো না।

সূর্য অস্ত গেলো। পৃথিবীর বুকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বিপ্লবীরা রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পাহাড় অতিক্রম করে সমতল ভূমিতে এসে পড়লেন। তারপর রেললাইন ধরে এগোতে লাগলেন। সামনেই ট্রাঙ্ক রোড। ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা ভাটিয়ারী সমুদ্র তীরে যান।

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে বিপ্লবীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

অদূরেই বস্তি। শেষ পর্যন্ত একজন সহৃদয় নাপিতের বাঁড়িতে তাঁরা আশ্রয় পেলেন। সেখানে চার-পাঁচ দিন বিশ্রাম নিয়ে অনন্ত সিংহ, দেবেন দে ও উপেন ভট্টাচার্য নৌকায় সন্দ্বীপ গেলেন। সন্দ্বীপ থেকে স্টীমারে তাঁরা বরিশাল হয়ে খুলনা এলেন। খুলনা থেকে ট্রেনে কলকাতা।

মাণিকতলা বি. টি. ইনস্টিটিউশন হোস্টেলে গণেশ ঘোষ আছেন। গণেশ ঘোষকে ডাকতে উপেন ভট্টাচার্যকে পাঠানে হলো। অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। অনন্ত সিংহকে দেখে গণেশ ঘোষ আনন্দে আত্মহারা।

মাণিকতলা থেকে বিপ্লবীরা গেলেন ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীটে যশোদা পালের বাসায়। যশোদা পাল কলকাতা পোর্টে চাকরি করেন। তিনি একা একটি বাসা ভাড়া করে থাকেন।

যশোদা পাল বিপ্লবী তিনজনকে হাওড়ার এক গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন। সেখানে আত্মগোপন করে আছেন বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী, জুলু সেন ও গোপীনাথ সাহা।

অগ্নিযুগের বিপ্লবের আকাশে যশোদা পাল একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। যশোদা পাল জুলু সেনের বন্ধু। জুলু সেনের সমবয়সী। যশোদা পালের জন্মস্থান—ইব্রাহিমপুর। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা। জেলা—ত্রিপুরা (বাংলাদেশ)। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে "বাঙ্গালি পল্টনে" যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলের যুবকদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেন। ১৯২৪ সালে মাণিকতলায় বোমা প্রস্তুতের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এ রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম সন্ধিক্ষণে যশোদা পাল চলে গেলেন।

•

মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস বিষ খেয়েছিলেন। তাঁদের কি হলো ? পুলিশ তাঁদের সন্ধান পেয়েছে কি ?

বিষ খেয়ে মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস 'নাগারখানা' পাহাড়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রইলেন। রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন রাজেন দাস জ্ঞান ফিরে পেলেন। তাঁর স্মৃতিপটে গতদিনের সব ঘটনা ধীরে ধীরে ভেসে উঠলো তিনি উঠে বসলেন।

ভোর হয়ে এলো। রাজেন দাস আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নেমে পড়লেন। দেখতে পেলেন পাহাড়ের ধারে পুলিশ ক্যাম্প করেছে। তাঁর পরনে খাঁকী সার্ট। পুলিশবাহিনী হয়তো

ভাবলো তিনি তাদেরই সহকর্মী। পুলিশ তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে কলকাতায় গিয়ে পৌঁছলেন।

মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী চেতনা ফিরে পেলেন। পটাসিয়াম সাইনাইড খুব শক্তিশালী বিষ। খেলেই মৃত্যু। তবে কি বিষে ভেজাল ছিল? ভেজাল বা খাঁটি যাই হোক বাস্তবে বিপ্লবীরা বেঁচে গেলেন। এটিই দেশবাসীর পরম সৌভাগ্য। এও ঠিক অঘটন আজো ঘটে। অথচ এ ঘটনার পরে বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা পটাসিয়াম সাইনাইড খেয়েছেন তাঁরা কেউ বাঁচেন নি!

মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী জ্ঞান ফিরে পেলেও দাঁড়াবার শক্তি মোটেই নেই। পরদিন সকালে পাহাড়ের ওপরে পুলিশ মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করলো। বিপ্লবীদের বন্দী করার পর পুলিশের আনন্দ আর দেখে কে। মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়ার এক মাসের মধ্যে আর একজন বিপ্লবী কলকাতায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন।

১২ জানুয়ারি, ১৯২৪ সাল।

শ্রীরামপুরের গোপীনাথ সাহা মিঃ টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলে মিঃ আর্নেষ্ট ডে-কে হত্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। ১ মার্চ, ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়।

অনন্ত সিংহের বিপ্লবী সাথী গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেলো। ইটখোলার কাছে একটি বাসা ভাড়া করে অনন্ত সিংহ আত্মগোপন করে আছেন। একা থাকেন। গণেশ ঘোষ সময়—সময় অনন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করেন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ যৌথ উদ্যোগে নানারকমের বিস্ফোরক বস্তু তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিলেন।

এ সময় পরৈকোড়া ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী সদস্য প্রেমানন্দ দত্ত চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় এলেন। অনন্ত সিংহ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে তিনি গোপন আস্তানায় নিয়ে যান। এবং বিস্ফারক বস্তু তৈরির পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করলেন। কিছুদিন ধরে গণেশ ঘোষ বোমার জন্য ঢালাই লোহার খোল তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। এখন বারুদের প্রয়োজন।

অনন্ত সিংহ প্রেমানন্দকে বারুদের জন্য চট্টগ্রাম পাঠালেন। প্রেমানন্দ অনন্ত সিংহের দাদা নন্দলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন। চট্টগ্রাম শহরে যে সব দোকানে বাজি তৈরি করে সেখান থেকে নন্দলাল ও প্রেমানন্দ মিলে প্রায় একমন বারুদ যোগাড় করলেন। বারুদ পার্শেলে কলকাতা এলো। প্রেমানন্দ ফের কলকাতা এলেন। প্রেমানন্দ রেলওয়ে পার্শেল ছাড়ালেন। তারপর সেই বারুদ তিনি অনন্ত সিংহের হাতে পৌঁছালেন।

পরের ঘটনা বড়ই সংক্ষিপ্ত। একদিন আটটায় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে অনন্ত সিংহ মুসলমান পোশাকে বড়বাজার চলেছেন। পরনে লুঙি, খাকী সার্ট তার ওপর খাকী কোট। পায়ে জুতো। তার গন্তব্যস্থল অগ্নিযুগের বোমা-শিল্পের গুরু হরিনারায়ণ চন্দের বাসা। হরিনারায়ণ চন্দ বড়বাজার থাকেন।

শালকিয়া বাঁধাঘাট। সেখান থেকে স্টীমারে অনন্ত সিংহ গঙ্গা পার হবেন। এমনি ভাগ্যের

পরিহাস অনন্ত সিংহকে বন্দী করার জন্য আই. বি. সাব-ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল রায় জাহাজ ঘাটে জাল পেতেছেন। তিনি অনন্ত সিংহকে ধরার জন্য চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা এসেছেন। শালকিয়া বাঁধাঘাটে অনন্ত সিংহ বন্দী হলেন।

অনন্ত সিংহকে দুরাত লালবাজারে লক্-আপ-এ রাখা হলো। তারপর তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে গেলেন। চট্টগ্রাম জেলে স্নানের ঘরে অনন্ত সিংহের সঙ্গে মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তীর দেখা হলো। তাঁদের দেখে অনন্ত সিংহ আনন্দে অভিভূত।

পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী কি করে বাঁচলেন তা অনন্ত সিংহ জানতে চাইলেন। জবাবে মাস্টারদা তাঁকে পরে বিস্তারিত বলবেন এ আশ্বাস দিলেন। এবং ওয়ার্ডার ও জেলের অফিসারদের সঙ্গে বিনয় ব্যবহার করতে উপদেশ দিলেন।

মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তীর মামলা আগে থেকে চলছে। এবার শুরু হলো অনন্ত সিংহের বিচার।

অনন্ত সিংহের নামে তিনটি কেস্।

প্রথম—নাগারখানা পাহাড়ে লড়াই।

দ্বিতীয়—সুলুকবাহার হাউসে সশস্ত্র আক্রমণের ষড়যন্ত্র।

তৃতীয়—রেলওযের অর্থ অপহরণ।

মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহের বিচার চলল ডিস্ট্রিক্ট জজ মিঃ স্টর্কের কোর্টে স্পেশ্যাল জুরীর সাহায্যে। বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করার জন্য এগিয়ে এলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং আরো কয়েকজন জুনিয়ার ব্যারিস্টার।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মামলা পরিচালনার অসাধারণ দক্ষতায় মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহ সসম্মানে মুক্তি পেলেন।

মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহ জেলে থাকতেই প্রেমানন্দ দত্ত সাব-ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল রায়কে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন। প্রেমানন্দ বন্দী হলেন।

প্রেমানন্দ প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করলেন কেন ? এর একটা কারণ আছে। প্রেমানন্দ প্রফুল্ল রায়ের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে পলাতক অনন্ত সিংহের সন্ধান দিয়েছিলেন। তারপর প্রফুল্ল রায় হাওড়ার শালকিয়া বাঁধাঘাটে অনন্ত সিংহকে গ্রেপ্তার করেন। পরে এ জঘন্য কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করেন। এ কথা যশোহর জেলে প্রেমানন্দ তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে স্বীকার করেছেন।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪) বইতে অনন্ত সিংহ প্রেমানন্দের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"...আমি (প্রেমানন্দ দত্ত) প্রফুল্লকে বলে অনন্তকে ধরিয়ে দিয়েছি। আবার তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমিই প্রফুল্লকে হত্যা করে ফাঁসি যেতে চেয়েছি। কিন্তু এতেও আমার মনে শান্তি নেই। ভয় হচ্ছে এখনো আমার বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করে।"

রেলওয়ে কোম্পানির টাকা ডাকাতিয় মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে মাস্টারদা চট্টগ্রাম শহরে দেওয়ান বাজারের বাসায় থাকেন। মাস্টারদার বাসায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন।

১৯২৪ সাল। ইস্কুল-কলেজে পূজার ছুটি। সকালবেলা। মাস্টারদা তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বাসায় হালকা গল্প-গুজব করছেন। সেখানে উপস্থিত আছেন—অম্বিকা চক্রবর্তী নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ এবং আরো কয়েকজন।

স্নিগ্ধ-সুন্দর পরিবেশ। মাস্টারদা জেলের বিবর্ণ দিনগুলোকে যেন ভুলে যেতে চান—প্রিয় সহকর্মীদের গভীর সান্নিধ্যে জীবনকে সরস ও সতেজ করে ভাবী কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

বৈঠকে নানারকম গল্পের মাঝখানে একজন বললেন, "এখন দেখছি পুলিশের সতর্কতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। ধরপাকড় শুরু হতে পারে।"

মাস্টারদা বললেন, "ধরপাকড় হওয়া বিচিত্র নয়। যে কোন মুহূর্তে হতে পারে।"

উপস্থিত সহকর্মীদের মধ্যে আর একজন হাসতে হাসতে বললে,"মাস্টারদা, আপনি রোগা-পটকা মানুষ। পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বেন। কেননা আপনি ছুটতে পারবেন না। পালাতেও পারবেন না।"

মাস্টারদা হেসেই জবাব দিলেন, "তোমরা যারা দৌড়তে পারো তারাই আগে ধরা পড়বে। আমি যথাসময়ে সরে পড়তে পারবো।"

এ আলোচনার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পালে বাঘ পড়লো।

২৫শে অক্টোবর, ১৯২৪ সাল। ভোরবেলা। চট্টগ্রামে বন্দী হলেন—গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ এবং আরো কয়েকজন। মাস্টারদা তাঁর কথা রেখেছেন। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করার পর তিনি বাড়ির খাটা পায়খানার ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

সেদিন সারা বাঙলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীসহ প্রায় ২০০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এ'দের মধ্যে সুভাসচন্দ্র বসুও আছেন। বাংলার লাট বাহাদুর লর্ড লিটন যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করেছেন এটি তারই ফল।

অনন্ত সিংহের বাবা তাঁর Diary-তে লিখেছেন: "On 25th October 1924 (৮ কার্তিক ১৩৩১ বাং, ১২৮৬ মঘি শনিবার) morning he (Ananta Singha) was arrested at home under the audinance No. I of 1924 and was detained in Jail."

মাস্টারদা পলাতক। ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় এসে বিপ্লবী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা দুটি গোপন ঘাঁটি তৈরি করেছেন। একটি দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতিপাড়ায় জীর্ণ দোতলা বাড়ি। অন্যটি কলকাতার চার নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীট। শোভাবাজারের বিপ্লবী আস্তানাটি খুব বড় বাড়ি। অনেক ভাড়াটিয়া লোকের বাস। তিন তলায় বিপ্লবীরা থাকেন। দক্ষিণেশ্বরের গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছেন—বিপ্লবী নায়ক হরিনারায়ণ চন্দ, চট্টগ্রামের রাখাল দে, অনন্তহরি মিত্র, রাজেন লাহিড়ী প্রমুখ এবং আরো অনেকেই। এ বাড়িতে বসে বিপ্লবীরা জোর কদমে বোমা তৈরি করে চলেছেন।

১০ নভেম্বর, ১৯২৫ সাল। দক্ষিণেশ্বরে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পুলিশ হানা দেয়। বিপ্লবী নায়ক হরিনারাণ চন্দ সহ প্রায় সকলে গ্রেপ্তার হলেন।

এ বাড়িটি বিপ্লবীদের বোমা তৈরির কারখানা। এখানে পাওয়া গেলো—যথেষ্ট পরিমাণে বোমা তৈরির উপকরণ, বন্দুক, রিভলবার, ব্যাটারি ইত্যাদি। এ ছাড়া তল্লাসীর ফলে উপরি লাভ হিসাবে পুলিশ পেলো শোভাবাজার বিপ্লবী ঘাঁটির সন্ধান।

দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী ঘাঁটিতে যখন পুলিশের তল্লাসী চলছে তখন বিপ্লবী সদস্য চৈতন্যদেব চ্যাটার্জি পাশের বাড়িতে ছিলেন। তাই তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তিনি শোভাবাজারের বিপ্লবী ঘাঁটিতে খবর দিতে ছুটে গেলেন। সতর্কতামূলক খবর আর দেওয়া হলো না। তাঁর পৌঁছানোর আগেই পুলিশ বাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে।

শোভাবাজার আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন—মাস্টারদা, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী আর অনন্ত কুমার চক্রবর্তী। বিপ্লবীরা যখন বুঝতে পারলেন পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে তখন মাস্টারদা চাকরের বেশে একহাতে চায়ের কেটলি, অন্য হাতে চা কেনার পয়সা মুঠোয় করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে বোকা বানিয়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন। প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্তী পুলিশের হাতে বন্দী হলেন।

শোভাবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে পুলিশ তল্লাসী চালানোর পর পেলো রিভলবার, দু মাপের কার্তুজ ও বিপ্লব সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র।

দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার মোট আসামী এগারোজন। বিচারে হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্তহরি মিত্র ও রাজেন লাহিড়ীকে দেওয়া হলো দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্তীর পাঁচ বছর। বাদবাকি সকলের তিন বছর।

মামলা শেষে বিপ্লবী বন্দীদের নিয়ে গেলো আলিপুর জেলের বম্ব ইয়ার্ডে। সেখানে গিয়ে বিপ্লবীরা দেখলেন, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটার্জি প্রায়ই জেলে ঢুকে রাজবন্দীদের সঙ্গে কথা বলেন। উদ্দেশ্য—বিপ্লবীদের গোপন খবর জানা। সুদক্ষ গোয়েন্দা। দেশের অনেক সর্বনাশের হোতা। ইংরেজ সরকার তাই খুশি হয়ে তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেছেন।

বন্দী বিপ্লবীদের খতমের তালিকায় ভূপেন চ্যাটার্জির নাম উঠে গেলো। সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে বিপ্লবীরা বিলম্ব করলেন না। পরিকল্পনা মতো বিপ্লবীরা তাঁকে আক্রমণ করেন। এবং প্রমোদ চৌধুরী লোহার ডাণ্ডা দিয়ে ভূপেন চ্যাটার্জিকে সজোরে আঘাত করেন। ডাণ্ডার ঘা খেয়েই রায়বাহাদুরের ভবলীলা সাঙ্গ হলো।

প্রমোদ চৌধুরী মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল ইস্কুলের ছাত্র। ক্লাসের সেরা ছাত্রদের অন্যতম। অনন্ত সিংহের সহপাঠী ও বন্ধু। অনন্ত সিংহকে তিনিই সর্বপ্রথম মাস্টারদার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলার পর শুরু হলো—ভূপেন চ্যাটার্জি হত্যা মামলা। বিচারে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসির আদেশ হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সাল। আলিপুর জেলে প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের ফাঁসি হয়।

মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে প্রমোদ চৌধুরীই প্রথম শহিদ।

পুলিশকে বার বার ফাঁকি দিয়েও মাস্টারদা গ্রেপ্তার এড়াতে পারলেন না। প্রায় দু' বছর পর তিনি কলকাতার রাস্তায় বন্দী হলেন।

মাস্টারদা কিভাবে ধরা পড়লেন তা তিনি লিখে গেছেন। লেখাটি প্রখ্যাত সাংবাদিক শচীন দত্তের পুরানো সংগ্রহ থেকে পাওয়া। 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা'র প্রকাশিত 'সূর্য সেন স্মৃতি' গ্রন্থে 'কলকাতার রাস্তায়' প্রবন্ধে সূর্য সেনের লেখাটি সংকলিত হয়েছে (পৃঃ ৭-৮):

"১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর। প্রায় দু' বছর হল abscond করেছি। ঐদিন সকালবেলা ৮টার সময় Shelter থেকে বেরিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের উপর খানিক দূর গিয়ে একটি লেনে ঢুকতে যাব, এমন সময় দেখলাম একজন লোক গলির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। তার হাবভাব দেখে spy বলে সন্দেহ হল। মনে করলাম, কলকাতার spy আমাকে কি করে চিনবে। সে গলির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল, আমি গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে আমার প্রয়োজনীয় বাসায় ঢুকে কথাবার্তা শেষ করে shelter-এ ফিরবার সময় ঐ গলিটা দিয়ে না ফিরে ঘুরে আর একটা গলির মধ্য দিয়ে shelter-এ ফিরলাম, কারণ ভাবলাম যদি আগের গলিটা দিয়ে ফিরি তা হলে ঐ spyটা আমায় mark করতে পারে। খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা আবার সেই বাসায় যাওয়ার কথা। তাই স্নান করে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে পৃথক আর একটি গলি দিয়ে উক্ত বাসায় গেলাম। পথে সন্দেহজনক কিছুই দেখলাম না। সেখানে ঘরের মধ্যে বসে কথাবার্তা বলছি—এমন সময় দেখলাম, একজন যুবক বাসার সামনে blind lane-টা দিয়ে বাসাটা pass করে চলে যাচ্ছে। দেখেই সন্দেহ হল। কারণ blind lane দিয়ে সে যাবে কোথায়? বাসাটির পরেই blind lane বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বাসা pass করে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে spy বলে সন্দেহ হল। ২।১ মিনিট পরেই দেখি, সে আবার ফিরে আমরা যে room-এ বসেছি তার জানালার ধারে এসে একজন লোকের নাম করে সে ওই বাসায় থাকে কি না জিজ্ঞাসা করল। ও নামের লোক সে বাসায় থাকত না—আমরা 'না' উত্তর দিলে সে চলে গেল। তার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গী দেখে আমাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল। একটু পরে আমি বাসার একটি ছেলেকে বাইরে রাস্তাটা দেখে আসতে বললাম। সে দেখে এসে বলল, 'রাস্তার ২।৩ জায়গায় দু' তিন batch plain dress-পরা লোক দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—I. B.-র লোক বলে মনে হচ্ছে'—শুনে মনে করলাম, বাসার পর যেখানে lane-টা শেষ হয়েছে সেখানকার ছাদ-দেওয়াল টপকে বেরিয়ে চলে যাব। দেরি না করে দেওয়াল টপকে অন্য ধারের রাস্তায় পড়ে ছাতাটা খুলতে যাচ্ছি, যে লোকটি জানালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেই লোকটি আমার ৩০।৪০ হাত পেছনে। সে ইতিমধ্যে বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে। আমি ছাতাটি খুলে চলতে লাগলাম। ঐ লোকটি এক পা দু' পা করে আমার ঠিক পেছনে এসে বলল, 'দাঁড়ান মশায়'। আমি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে সাধারণ গতিতে চলতে লাগলাম। সে আবার আমাকে দাঁড়াতে বলল। আমি কেন দাঁড়াব, জিজ্ঞেস করলে সে কোন জবাব দিল না এবং হঠাৎ আমার একটা হাত জোরে ধরে ফেলল। আমি হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করছি, এমন সময় সে চেঁচিয়ে রাস্তার পাশের লোকদের বলল, 'এ একজন ডাকাত, একে ধরুন।'

আর কেউ তাকে সাহায্য করল না, কিন্তু তার হাত আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। ইতিমধ্যে সে হাত নেড়ে কি একটা ইশারা করল, আর ৪।৫ জন plain dress-পরা লোক এসে আমায় ভালোরূপে ধরে ফেলল।

"ঠিক সে সময় রাস্তা দিয়ে একটা মোটর যাচ্ছিল। তারা মোটর ডেকে আমায় তার উপর তুলল। বুঝতে পারলাম, তারা সবাই I. B. Department-এর লোক। মোটরে তুলে তারা দু'জন আমার দু' হাত ধরে রেখে কোমর এবং পকেট search করল। বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে incriminating কিছুই ছিল না। পকেটে কয়খানা Forward পত্রিকার Cuttings আর একটি ক্ষুদ্র slip-এ ২।৩টি রেলওয়ে স্টেশনের time table লেখা ছিল। দু' হাত ধরে search করবার সময় তাদের অভদ্র, ইতর ইত্যাদি ডেকে খুব গাল দিলাম। তারা বিনা বাক্যব্যয়ে search করে নিল। আমি গাল দিতে দিতে বললাম, 'তোমরা যে পুলিশের লোক, তারই বা নিদর্শন কি? শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে পথের মধ্যে অপমান করছ কেন?' এর উত্তরে তাদের মধ্যে একজন একটু অবহেলা এবং গর্বের ভাব দেখিয়ে শার্টের নীচে কোমরে ঝুলান revolverটা চাপড়ে বলল, 'এই পুলিশের নিদর্শন'।"

বন্দী হবার পর মাস্টারদাকে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হলো। মেদিনীপুর জেলে আছেন—গণেশ ঘোষ, সতীশ পাকড়াশি ও বরিশালের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ যুবনেতারা। জেলে নিরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে গণেশ ঘোষের বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। গণেশ ঘোষের দেখাদেখি নিরঞ্জন সেনগুপ্তও সূর্য সেনকে 'মাস্টারদা' বলে ডাকতে লাগলেন।

একদিন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত গণেশ ঘোষকে বললেন "তোমাদের মাস্টারদার চালচলন দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না তিনি একজন বিপ্লবী নেতা।"

গণেশ ঘোষের নীরবতা দেখে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মাস্টারদা সম্বন্ধে ফের জানতে চাইলেন। গণেশ ঘোষ বললেন, "মাস্টারদা আমাদের প্রকাশ করার সুযোগ করে দেন। সব কাজেই তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্নে রাখেন।"

ইংরেজ সরকার মাস্টারদাকে বাঙলাদেশে রাখতে সাহস পেলেন না। তাই মেদিনীপুর জেল থেকে মাস্টারদাকে বোম্বের রত্নাগিরি জেলে পাঠালো। কিছুদিন পর সেখান থেকে পাঠালো বেলগাঁও জেলে।

বোম্বের রত্নাগিরি জেল। জেলে মাস্টারদার সঙ্গে আছেন অনুশীলন দলের সদস্য নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। জেলসীমানার মধ্যে একটা উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় বসে বিশাল আরব সাগর দেখা যায়। মাস্টারদা প্রায় সময় পাহাড়ের মাথায় বসে আরব সাগরের শোভা দেখেন। অনন্ত পথের যাত্রী মাস্টারদা সাগরের রূপ দেখতে দেখতে সময় সময় গুন্‌গুন্ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ান। তাঁর প্রিয় কবিতাটি হলো—

'এবার ফিরাও মোরে'

কবিতার প্রতি অনীহা দেখে একদিন মাস্টারদা নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে বললেন, "কবিতাকে ভালোবাসলে তুমি অবিপ্লবী হয়ে যাবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিপ্লবীদের জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে।"

রত্নাগিরি জেল থেকে আবার মাস্টারদা ও নিরঞ্জন সেনগুপ্তকে পাঠানো হলো বেলগাঁও

জেলে। জেল-জীবনে মাস্টারদা কিভাবে সময় কাটাতেন সে বিষয়ে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত 'বীর বিপ্লবী সূর্য সেন' প্রবন্ধে লিখেছেন (বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'সূর্য সেন স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থ পৃঃ ৬৭) ঃ

"বন্দী-জীবনে মাস্টারদা পড়াশুনা করে সময় কাটাতেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি তাঁর তখন থেকেই ছিল গভীর অনুরাগ—যদিও তখনকার দিনে বিপ্লবী মহলে সাহিত্যিক রুচিবোধকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত না।

মাস্টারদা রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গর্বিত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনের কত বড় সম্পদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন।"

জেলের মধ্যে মাস্টারদা যখন জ্ঞানের তপস্যায় রত তখন বাড়িতে তাঁর স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা স্বামীর মঙ্গল কামনায় বিভোর। জীবনের এই পান্থশালায় পুষ্পকুন্তলাকে কেবল প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছে। বিবর্ণ ধূসর জীবনে তাঁর দেহে নেমে এলো ক্লান্তির ছায়া।

পুষ্পকুন্তলার জীর্ণ দেহ দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার ধকল সইতে পারলো না। তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। পুষ্পকুন্তলার মা মেয়ের কঠিন অসুখের খবর পেয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ছুটলেন। পুষ্পকুন্তলার মায়ের সঙ্গে গেলেন তাঁর ছোট দেওর ভুবনমোহন দত্ত।

পুষ্পকুন্তলার মা নয়াপাড়া গ্রামে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি পৌঁছেই দেখেন তাঁর মেয়ে প্রবল জ্বরে প্রলাপ বকছেন। বুঝলেন, মেয়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মা মেয়ের বুকে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

মায়ের কান্না শুনে জ্বরের ঘোরে পুষ্পকুন্তলা কয়েক বার মায়ের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন। মা দেখলেন, মেয়ের চোখ দুটি যেন জবা ফুলের মতো লাল।

পুষ্পকুন্তলা মরমর। জেলে বন্দী মাস্টারদাকে এ খবর জানানো হলো। ইংরেজ সরকার মৃত্যু পথযাত্রী পুষ্পকুন্তলার কাছে মাস্টারদাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সুদূর বেলগাঁও জেল থেকে মাস্টারদা চট্টগ্রামে পৌঁছলেন। মাস্টারদা বাড়ি পৌঁছানোর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পুষ্পকুন্তলা মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন। মৃত্যুশয্যায় স্বামীর কোলে মাথা রেখে এয়োতির পূর্ণগৌরবে পুষ্প লা চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিলেন। এতোদিন পুষ্পকুন্তলা স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক সুন্দর হয়ে ফুটে উঠলো।

জীবনসঙ্গিনীকে অকালে হারিয়ে মাস্টারদা শোকে কাতর। শোকাবেগ সংবরণ করার জন্য তিনি মৌন হয়ে রইলেন।

পুষ্পকুন্তলার বাবা ও কাকারা ছ' ভাই। ভুবনমোহন দত্ত সকলের ছোট। পুষ্পকুন্তলার সমবয়সী। তিনি এখনো জীবিত আছেন। দুর্গাপুরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয় হয়েছে।

পুষ্পকুন্তলার শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হতে না হতেই শেকলের টান পড়লো। মাস্টারদা ফের জেলে চলে গেলেন।

মাস্টারদা সুদূর বোম্বের বেলগাঁও জেলে বন্দী। জেলে বসে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তায় ধ্যানস্থ।

উত্তর প্রদেশের চৌরীচৌরা গ্রামে ক্রুদ্ধ জনতা কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলায় গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন। ফলে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ ও গভীর হতাশা দেখা দিলো। এই হতাশার কালো মেঘ ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উত্তরোত্তর জমাট বাঁধতে থাকে।

৮ নভেম্বর ১৯২৭ সাল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট, সাইমন কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে। উদ্দেশ্য—এ কমিশন ভারতবাসীর রাজনৈতিক যোগ্যতা বিচার করবে। স্যার জন সাইমন পরিচালিত কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবাসীকে কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যায় তা বিবেচনা করবে। কমিশনের সব সদস্যই ইংরেজ। এতে কোন ভারতীয় প্রতিনিধির স্থান হয়নি দেখে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ ও অপমান বোধ করলো। তাই ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। মতিলাল নেহেরু এ অধিবেশনের সভাপতি। মাদ্রাজ কংগ্রেসে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হলো।

সাইমন কমিশন ভারতে এলো। এ কমিশন ভারতের যে প্রান্তে যাচ্ছে সেখানেই হরতাল ও কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে। সর্বত্র একই ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগলো—"Go back Simon Commission".

রক্ত ঝরা পথ মাড়িয়ে কমিশনের সমীক্ষার কাজ চললো।

৩০ অক্টোবর ১৯২৮ সাল। সাইমন কমিশন লাহোরে গিয়ে পৌঁছলে লাহোরে হরতালের ডাক দেওয়া হয়। বের হয় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিল পরিচালনা করছেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। সকলের হাতে কালো পতাকা। নিরস্ত্র মিছিলের ওপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চালায়। প্রায় আশি বছরের বুড়ো লালা লাজপৎ রায় গুরুতরভাবে আহত হন। এই আঘাতেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতাকে হারিয়ে ভারতবাসী শোকে মুহ্যমান। বিপ্লবীরা ভাবলেন এর বদলা নিতেই হবে। সুযোগ এসে গেলো।

১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ সাল। লাহোরের পুলিশ অফিসার মিঃ স্যাণ্ডার্সকে বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং গুলি করে হত্যা করেন এবং চকিতে উধাও হয়ে যান।

১৯২৮ সালের শেষ ভাগে সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষ জেল থেকে মুক্তি পান। তার প্রায় এক বছর আগে অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন জেল থেকে খালাস পেয়েছেন। এখন বিপ্লবীদলের প্রায় সকল নেতা ও কর্মী মুক্ত।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব ভাবলেন, দলকে শক্তিশালী করে গড়তে হবে। সংকল্পকে বাস্তব রূপদানের জন্য মাস্টারদা বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় সকলকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় স্থির হলো—বিপ্লবীদলকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করতে হবে। গাছের মূল যেমন মাটির গভীরে ঢুকে রস সংগ্রহ করে তেমনি বিপ্লবীদলকে জনসেবার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে ঢুকতে হবে। তবেই হবে অভীষ্টসিদ্ধি।

বিপ্লবীদলের সকল সদস্যাই কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাব্যস্ত হলো—নিজেদের প্রচেষ্টায় যতো সংখ্যায় সম্ভব শহর ও গ্রামে ব্যায়াম-কেন্দ্র গড়ে তোলা। ব্যায়াম-কেন্দ্রে যে সব যুবক যোগদান করবে সেখান থেকে তরুণদের দলে টানতে সুবিধে হবে। বিপ্লবীদলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক হওয়ার পর আসন্ন কলকাতা জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে দলের নেতৃস্থানীয় সকলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হলো।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাস। কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসলো। অধিবেশনের সভাপতি—মতিলাল নেহেরু, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রধান সম্পাদক—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রদর্শনী সম্পাদক—নলিনীরঞ্জন সরকার এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন—সুভাষচন্দ্র বসু।

বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র বসু, গড়ে তুললেন বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স বাহিনী। সকলের খাকি পোশাক। তাঁদের সামরিক বাহিনীর মতো ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের গড়া সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত বাহিনী দেশবাসীকে যেন হঠাৎ চমকিয়ে দিলো। দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে দেখলো—সুসজ্জিত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মধ্যে আছে অশ্বারোহী দল, মোটর-সাইকেলবাহিনী ও এ্যাম্বুলেন্সবাহিনী প্রভৃতি। দেশের তরুণদের মনে নূতন প্রাণের সাড়া জাগালো। সুভাষ যেন পরাধীন ভারতবাসীর শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলো। নেহেরু কমিশনের সিদ্ধান্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status)। সুভাষচন্দ্র নেহেরু কমিশনের একজন সদস্য। তবুও তিনি কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল-কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন।

ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রস্তাব নিয়ে কলকাতা কংগ্রেসে প্রবল মতপার্থক্য দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণ করা হয়। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গণেশ ঘোষ যোগদান করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কি বলেন দেখা যাক।

'বিপ্লবী সূর্য সেন' গ্রন্থে গণেশ ঘোষ লিখেছেন (পৃঃ ৫৭-৫৮) ঃ

"সুভাষবাবু একবার মতিলাল—কমিশনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করায় এবং পরে কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে স্বাধীনতার প্রস্তাব আনায় গান্ধীজী সুভাষবাবুর প্রস্তাবকে অস্থির মনের, অব্যবস্থিত চিত্তের এবং লঘু চিন্তার পরিণতি বলে আখ্যা দিয়ে ঐ প্রস্তাবের গুরুত্ব প্রতিনিধিদের কাছে হ্রাস করে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একথা খুব সঠিক এবং সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, যে ভাবে এবং যে রূপ সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে সন্ধ্যা ৮।৯ টার সময় ঐ প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ আরম্ভ করে নানা অজুহাতে বার বার গৃহীত ভোট বাতিল করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড শীতের রাতে প্রায় ২½টার সময়ের গণনা গ্রহণ করা হোল, এরকম সাধারণতঃ কখনই করা হয় না। এবং নিশ্চিত ভাবেই মনে হয় সুপরিকল্পিতভাবে এই পদ্ধতি অনুসৃত না হোলে দেখা যেত সুভাষবাবুর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবই বহু ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অনুমোদন করেছে।

"অবশ্য গান্ধীজী, মনে হয়, সব বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং নিশ্চয়ই তিনি প্রতিনিধিদের মনোভাব এবং দেশের মানুষের চিন্তাধারা এবং ইচ্ছা খুব সঠিক ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আপোস করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, এক বছরের মধ্যে যদি বৃটিশ সাম্রাজবাদ আমাদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের (Dominion Status) দাবি গ্রহণ না করে, তাহলে এক বছর পরে ভারতীয় জণগণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-দাবি পেশ করবার অধিকার থাকবে। গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করে ছিলেন।"

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সর্বোচ্চ প্রায় সব নেতাই কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন। দুটি দলের নেতারা দুটি দল ভেঙ্গে একটি সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করার জন্য আলোচনায় বসলেন, তারজন্য ছকও তৈরি হয়। এর প্রস্তুতি চলছিল বহুদিন আগে থেকে। উভয় দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ যখন জেলে ছিলেন তখন তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা চলে। নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সেই প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা হয়। আলোচনার মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে সম্মিলিত দল গঠিত হয়।

দু দলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে মাস্টারদা স্বাগত অভিনন্দন জানালেন। এবং পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দল ফের আলাদা হয়ে গেলো।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে এসে জুলু সেনের সঙ্গে এক ঘরোয়া মিটিং-এ বসলেন। এ মিটিং-এ জুলু সেন বিপ্লবীদলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন—তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদল গড়া অসম্ভব। পুলিশের ধারণা হবে যখন তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন তখন হয়তো কাজে নামতে পারেন।

মাস্টারদার বিপ্লবীদল কংগ্রেস অধিবেশনের পর চট্টগ্রামে ফিরে গেলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে সৈন্যবাহিনীর মতো কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দেখে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সামনে নূতন দিগন্ত খুলে গেলো। তাঁরা চট্টগ্রাম শহরের উৎসাহী যুবকদের নিয়ে এক মাসের মধ্যেই একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুললেন।

২৬ জানুয়ারি ১৯২৯ সাল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল সমারোহের সঙ্গে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন করলেন।

বিপ্লবীদলের সিদ্ধান্ত অনুসারে সব বিপ্লবী সদস্য চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সংগঠনে যোগ দেন। সূর্য সেন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ফলে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাতে চলে আসে।

পরের অধ্যায়ে ঝড়ের বেগে বিপ্লবীদলের শক্তি বৃদ্ধির কাজ চলতে থাকে। বিপ্লবী যুব নেতাদের প্রত্যেককে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো। অনন্ত সিংহকে দেওয়া হলো—জেলার যুবকদের ব্যায়ামকেন্দ্র পরিচালনার ভার। ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে রইলেন লোকনাথ বল। যুবপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভার পড়লো গণেশ ঘোষের ওপর। একই

সঙ্গে গড়ে উঠলো সামরিক বাহিনীর অনুকরণে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। চট্টগ্রামের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী হলো প্রকাশ্য নাম। প্রকৃতপক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো এটি সূর্য সেনের "Indian Republican Army, Chittagong Branch" রূপেই গড়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে চট্টগ্রাম শহরের পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলি ব্যায়ামকেন্দ্র গড়ে উঠলো। ব্যায়ামকেন্দ্রগুলিতে শরীর-চর্চা করে অনেক সদস্যের শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী সভ্যরা শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীতে মোটর গাড়ির গতি-রোধ, ভার উত্তোলন, বুকের ওপর দিয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানো ইত্যাদি খেলা দেখান। যাঁরা খেলা দেখান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—লোকনাথ বল, নরেশ রায়, রজত সেন, বিধু ভট্টাচার্য, জীবন ঘোষাল এবং আরো অনেকে।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন (পৃঃ ২৫৭) ঃ

"এই সব প্রদর্শনী সে যুগের সাধারণ লোক এবং উৎসাহী যুবকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হত। শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে দেখান হত মোটর গাড়ির গতি-রোধ, ভার উত্তোলন, বুকের ওপর দিয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানো ইত্যাদি।"

ব্যায়ামকেন্দ্রগুলিই পক্ষান্তরে বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র। ব্যায়ামকেন্দ্রগুলি থেকেই বিপ্লবী সদস্য গ্রহণের প্রধান মাধ্যম। প্রথমে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় শহরের শরীর চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি ব্যায়াম সমিতির উন্নতিকল্পে মুগুর, ডাম্বেল, ডেভেলেপার ইত্যাদি কেনার জন্য টাকা মঞ্জুর করে। এবং অনন্ত সিংহকে মোটরগাড়ি ব্যবহারের জন্য পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাতা দেয়।

মাস্টারদা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মাস্টারিতে ফিরে গেলেন না। বিপ্লবীদলকে শক্তিশালী করাই হলো তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। থাকেন আস্কার খাঁ-র দিঘির পাড়ে কংগ্রেস অফিসে। মাস্টারদা চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক হওয়ার পর জেলা কংগ্রেস অফিস বিপ্লবীদলের ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

মাস্টারদার একমাত্র আয়, বাসায় কয়েকজন ছাত্রকে পড়ান। তাতেই তাঁর দিন চলে যায়। বনবিহারী দত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মাস্টারদার কাছে পড়েন। একদিন বনবিহারী মাস্টারদার ঘরে বসে পড়ছেন। ঘরের দরজা ভেজানো। দরজায় হঠাৎ বাইরে থেকে টোকা পড়লো।

মাস্টারদা বললেন, "বনবিহারী শুয়ে পড়।"

শিক্ষকের আদেশে বনবিহারী সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লেন। মাস্টারদা বনবিহারীর আপাদমস্তক একটা কম্বলে ঢেকে দিলেন। আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন। দুজনের মধ্যে ফিসফিস করে কথা হলো। আগন্তুক চলে গেলেন। মাস্টারদা পুনরায় ছাত্রকে পড়াতে শুরু করলেন। বিপ্লবী কাজকর্ম কতো গোপনে সারতে হয় এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯২৬ সালে শ্রীপুর গ্রামের দ্বিজেন পালের প্রভাবে বনবিহারী মাস্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ দেন। মাস্টারদা তখন পলাতক। তারপর বনবিহারী নেতা নির্মল সেনের সংস্পর্শে আসেন।

১৯২৮ সালে মাস্টারদা জেল থেকে ফিরে আসার পর নির্মল সেন মাস্টারদার সঙ্গে বনবিহারীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলেন।
নির্মল সেন বনবিহারীকে বললেন, "বিপ্লবীদলে শেষ স্তরের পরীক্ষা তোমার। আগামীকাল রাত তিনটায় পল্টন মাঠে মাস্টারদার সঙ্গে তুমি দেখা করবে। পৌঁছতে একমিনিট দেরি করলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।
রাত তিনটা। বনবিহারী পল্টন মাঠে পৌঁছলেন। চারদিক অন্ধকার। কেবল রাতের আকাশে তারা গুলি মিটমিট করে জ্বলছে।
অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"
বনবিহারী গুপ্ত সমিতির দেওয়া নাম বললেন। মাস্টারদা তাঁকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করলেন। বনবিহারী এক লহমায় বুঝে নিলেন তিনিই মাস্টারদা। বনবিহারী মাস্টারদার পায়ের ধুলো নিতে চাইলেন। মাস্টারদা বাধা দিলেন।
শীতের রাত। মাস্টারদা বনবিহারীকে তাঁর চাদরে জড়িয়ে নিলেন। মাস্টারদার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি আপার আনন্দ উপভোগ করলেন। দু জনে ঝোপের আড়ালে বসে অনেক কথা হলো।
মাস্টারদা পকেট থেকে ঘড়ি বের করলেন। টর্চ জ্বেলে দেখলেন চারটে বাজে। এবার মাস্টারদা বনবিহারীকে বিদায় দিলেন। কিছুদূর গিয়ে বনবিহারী পেছন ফিরে তাকালেন। দেখেন, মাস্টারদা আর একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। বনবিহারী ভাবলেন, মাস্টারদা হয়তো এভাবে সকল বিপ্লবীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন।
বনবিহারীর বাবার নাম দ্বারিকামোহন দত্ত। মায়ের নাম বাঁশিশ্বরী। দ্বারিকামোহন পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায়ের নায়েব। চট্টগ্রাম শহরে থাকেন।
দ্বারিকামোহনের চার ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের নাম—নকুলেশ্বর, হিমাংশু, বিজয় ও বনবিহারী। মেয়ের নাম প্রিয়বালা।
বনবিহারীর জন্ম—১ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সাল। বাড়ি - শ্রীপুর (খরন্দীপ)। থানা—বোয়ালখালি।
গৃহশিক্ষক হিসেবে বনবিহারী খুব কাছ থেকে সূর্য সেনকে দেখেছেন। আবার বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেনকে তিনি প্রতিনিয়ত দেখেছেন। এতো কাছ থেকে তাঁকে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য খুব কম বিপ্লবীর ভাগ্যে জুটেছে। এদিক থেকে বনবিহারী পরম সৌভাগ্যের অধিকারী।
লেখকের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী বনবিহারী দত্তের পরিচয় হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে লেখককে অনেক কথা বলেছেন। এবং লিখেও জানিয়েছেন। তাতে মাষ্টারদা সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া গেলো।
"১৯২৯ সাল। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। তখন মাস্টারদা ছিলেন আমার গৃহশিক্ষক। তাঁর অতি নিকট সান্নিধ্যে একটি ছোট ঘরে বসে দিনের পর দিন তাঁর কাছে পড়তাম। ফলে তাঁর মহান চরিত্রের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আমার জীবনে ঘটেছিল।
"অতি ছোটখাটো বিষয়ে মাস্টারদার দেশপ্রেমের গৌরব উজ্জ্বল আদর্শ বৈপ্লবিক নিষ্ঠা এবং

ব্যক্তিগত জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এক কথায় বলা যায়—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।' মহৎ ব্যক্তির জীবনে হয়তো দু-একটা ছোটখাটো ত্রুটি দেখা যায়। কিন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম, কোনদিন তাঁর কোন ত্রুটি দেখতে পাইনি।...তাঁর এই চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও আদর্শ নিষ্ঠার জন্যই অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রমুখ মহান নেতারা তাঁকে বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক পদে বরণ করে নিয়েছিলেন।"

বনবিহারী যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন, সেই সময় মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার মাস্টারদার সঙ্গে মনোরঞ্জন রায়ের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার মনোরঞ্জন রায়ের সহপাঠী ও বন্ধু।

বিকেলের পড়ন্ত বেলা। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের নির্দেশ মতো মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রাম শহরের বেশ উঁচু পাহাড় 'বাটালী পাহাড়ে' গেলেন। যথাসময়ে মাস্টারদার সঙ্গে মনোরঞ্জন রায়ের দেখা হলো। পাহাড়ের চূড়ায় বসে মাস্টারদা ও মনোরঞ্জন রায়ের মধ্যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিষয়ে নিভৃতে আলোচনা চলছে।

মনোরঞ্জন রায় বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। মাস্টারদা অঙ্কের সুদক্ষ শিক্ষক। ছাত্র জটিল বিষয়ের সমাধান চান। শিক্ষক প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর অঙ্কের মতো মিলিয়ে দিচ্ছেন।

বাটালী পাহাড়ের কাছেই আসাম—বেঙ্গল রেলওয়ের সবচেয়ে বড় ওয়ার্কসপ। ১৯২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর এই পাহাড়ের পাশ দিয়ে রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মীদেয় বেতনের টাকা কারখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় অনন্ত সিংহ, দেবেন দে, রাজেন দাস ও উপেন ভট্টাচার্য মিলে লুঠ করেছিলেন। ঘটনাটি মনোরঞ্জন রায়ের স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো।

পাহাড়ে বসে মাস্টারদা ও মনোরঞ্জন রায়ের মধ্যে গভীর আলোচনা চলছে। তখন রেলওয়ে ওয়ার্কসপ ছুটি হয়েছে। শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বের হয়ে আসছে দলে দলে।

মনোরঞ্জন রায় মাস্টারদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ যে হাজার হাজার শ্রমিক কারখানা থেকে বের হয়ে আসছে, তাদের আমরা দলে টানবো না কেন ?

মাস্টারদা বললেন, "সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। এদের অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে পরবর্তী অধ্যায়ে। এটি পরবর্তীকালের নেতারা করবেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেশের সামনে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করে যেতে চাই। অহিংস আন্দোলনের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই তা সম্ভব। আমরা দেশবাসীর মনে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আস্থা নিয়ে আসিতে চাই। দেখাতে চাই আমরাও সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনে সক্ষম। এই দৃষ্টান্ত, স্থাপনই হবে আমাদের কাজ। গণবিপ্লবের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার কাজ পরবর্তী কালের লোকেরা সমাধা করবে।"

মাস্টারদা বুঝলেন, মনোরঞ্জন রায় ভাবীকালে নেতা হওয়ার গুণ নিয়ে জন্মেছেন। মাস্টারদার সান্নিধ্য মনোরঞ্জন রায়ের জীবনে এক স্বর্ণঅধ্যায় রচনা করেছে। জীবনের এক এক সোপান পার হয়ে তিনি একজন সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

এ পর্যন্ত মনোরঞ্জন রায় যে সব পদ অধিকার করেছেন বা করছেন তা নীচে দেওয়া গেলো :

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (১৯৬০)।

সি. আই. টি. উ-র জন্মের পর হতে সি. আই. টি. উ-র পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

বিধানসভার সভ্য

রাজ্যসভার সভ্য

সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক

বর্তমানে এ সংগঠনের সহসভাপতি।

কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য।

এ ছাড়া মনোরঞ্জন রায় মে দিবস উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের আমন্ত্রণে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে রাশিয়া যান। এবং এ. আই. টি. উ. সি-র প্রতিনিধি হিসেবে হাঙ্গেরীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেড ইউনিয়নের মহাসম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনের পর যুগশ্লাভাকিয়ার কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে যুগশ্লাভাকিয়া ভ্রমণ করেন। সে বছরই সোভিয়েটের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রণে মস্কো শহরে নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

সূর্য সেনের বিপ্লবীদলে সদস্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি হলো– ব্যায়াম সমিতি, ইস্কুল ও কলেজ সমূহ। এ সংগঠন চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা ও কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপ্লবী যুব সংগঠনকে জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা বিপ্লবী মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব দিলেন পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ওপর। মহিলা সংগঠনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে সহযোগিতা করছেন মনোরঞ্জন রায়। এবং চট্টগ্রাম জেলার গ্রাম সংগঠনের দায়িত্বে রইলেন অম্বিকা চক্রবর্তী।

গ্রাম সংগঠনের একজন বিপ্লবী সদস্য শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী। বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার পাঠানীকোঠা গ্রাম। থানা—আনোয়ারা। তাঁর বাবার নাম—দুর্গাকুমার চৌধুরী। মায়ের নাম—প্রমদা সুন্দরী।

পটিয়া থানার ছনহরা গ্রামের জমিদারের ছেলে সুখেন্দু দত্ত শশাঙ্ক শেখরকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন। সুখেন্দু দত্ত তাঁর মামাতো দাদা। মামার বাড়ি থেকেই তিনি লেখাপড়া করেন।

১৯২৬ সালে শশাঙ্ক শেখর পটিয়া হাই ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। নেতা সুখেন্দু দত্ত তাঁকে ম্যাট্রিক পাস করার পর চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে গেলেন। এবং মাস্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১৯২৬ সালে সুখেন্দু দত্ত শশাঙ্ক শেখর চৌধুরীকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। সুখেন্দু দত্ত মাস্টারদার একান্ত প্রিয় সহকর্মীদের অন্যতম। মাস্টারদা তখন পলাতক। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী বন্দী।

কলকাতায় এসে নানান জায়গায় ঘোরাঘুরির পর শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী মীর্জাপুর স্ট্রীটে (সূর্য সেন স্ট্রীট) আমেরিকান লন্ড্রির পরিচালক নিযুক্ত হন। এ দোকানের মালিকের

নাম—জিতেন বসু। রেঙ্গুন ও কলকাতায় তাঁর ব্যবসা। তিনি নেতা নির্মল সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফলে বন্ধুর লন্ড্রিটিই হলো—চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের একটি অফিস।

লন্ড্রি পরিচালক শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট কর্মী। জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন। এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দলের সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সংযোগ রক্ষাকারী। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে শশাঙ্ক শেখর রিভলবারের পরিবর্তে পুটলিতে লোহার টুকরাও পেয়েছেন।

আমেরিকান লন্ড্রির মালিক জিতেন বসু চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মাস্টারদা কলকাতায় এলে, অনেক কংগ্রেস নেতা তাঁর সঙ্গে এই লন্ড্রিতে এসে আলোচনা করতেন। সম্ভবতঃ এ জন্যই মীর্জাপুর স্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে সূর্য সেন স্ট্রীট রাখা হয়েছে।

'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' বইতে শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী লিখেছেন (পৃঃ ৪০-৪১) ঃ

"জিতেন বসুর অর্থানুকুল্যে মীর্জাপুরে আমেরিকান লন্ড্রি ক্রয় করা হয়। মালিক জিতেন-বাবু, আমি তত্ত্বাবধায়ক (মালিকের মতো) হই। আই. বি-র চোখে আমি লন্ড্রি রক্ষক। তালতলার জাহাজী কর্মী ও মেছুয়াবাজারে স্মাগলারদের আমার সঙ্গে দোকানে দেখা করা সহজ হইল। খালাসীদের জামা প্যাণ্ট ধোলাই করা হইত—পুটুলি করিয়া দিয়া যাইত, জাহাজ আসিবার সম্ভাব্য সময় ও অন্যান্য সত্য-মিথ্যা খবর জানিতাম। পাঁচশো টাকার বিনিময়ে এক পুটুলিতে দুটি R (রিভলবার) ডেলিভারি দেওয়ার নামে একটি R ও একটি লোহ খণ্ড দিয়া গেল। তজ্জন্য মাস্টারদা আমাকে নিরুৎসাহিত করিলেন না। বলিলেন যে, এরকম জুয়াচুরি একটু হইবেই।

এই আমেরিকান লনড্রিতে গ্রাহক হিসাবে সবাই আসিয়া যোগাযোগ করিতেন। বি পি. সি সি-র মিটিং-এ মাস্টারদা আসিতেন—রাত্রির বেশির ভাগ সময় থাকিতেন। দিনে যাহা আয় হইত দফে দফে মাস্টারদা, অম্বিকাদা, লোকনাথ, অনন্ত সিংহ নিয়া হোটেলে আহার করিতেন। রাত্রিতে অম্বিকাদা ছাড়া কেহ থাকিতেন না। আর্যাশ্রম পাইস হোটেলে তাঁহারা আহার করিতেন। ঐ হোটেলের মালিক বৈদ্যনাথবাবুও একজন রাজনৈতিক দলের লোক ছিলেন। তাঁহার সম্পর্ক ছিল শ্রমিক নেতা শিবনাথ ব্যানার্জীর সাথে। এই লন্ড্রির আলমিরার পিছন দিকে একটু জায়গা করিয়া মাস্টারদা বসিতেন। কলিকাতায় মাস্টারদা আসিলে বিপিনদা, মধুদা (সুরেন ঘোষ), সতীশদা, চারু দত্ত, নাম-না-জানা অনেক কংগ্রেস নেতা তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিতেন।"

শশাঙ্ক শেখর যখন আমেরিকান লন্ড্রির পরিচালক হয়ে বিপ্লবীদলের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন তখন তাঁর মামাতো দাদা সুখেন্দু দত্তের গ্রেপ্তারের দিন আসন্ন।

সুখেন্দু দত্তের বাড়ি ছনহরা। জেলা চট্টগ্রাম। বাবার নাম যোগেন্দ্রলাল দত্ত। ১৯২৭ সালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় সুখেন্দু দত্ত বন্দী হলেন।

একটি দৃশ্যের পরিসমাপ্তির পর যেন নাটকের অন্য একটি দৃশ্যের অবতারণা শুরু হতে চলেছে।

সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে বিপ্লবীদল কতটা শক্তি ধারণ করেছে তার প্রকৃত মূল্যায়ন

করার প্রয়োজন। এবং জনসাধারণকে বৈপ্লবিক কাজের ধ্যান-ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সূর্য সেনের দল জেলা কংগ্রেস সম্মোলন আহ্বান করার কথা ভাবলেন।

সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। কংগ্রেসের নামাবলী গায়ে দিয়ে তাঁর দল ভিতরে ভিতরে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিপ্লবীদলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের ব্যবস্থা হলো। জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে— যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের পৃথক পৃথক কন্‌ফারেন্স।

১১, ১২ ও ১৩ মে, ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে জেলা কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু হলেন রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি। যুব সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বিপ্লবী নেতা প্রফেসর জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রী হলেন—বিখ্যাত মহিলা নেত্রী লতিকা বসু।

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সুভাষচন্দ্র বসুকে খাকি পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান। কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করে তিনি মুগ্ধ। কেননা সুভাষচন্দ্র কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশকালীন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেছিলেন। চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেস তাঁর স্বপ্নকে সার্থক রূপ দিয়েছেন। তা দেখে তিনি অভিভূত।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর প্রস্তুতি দেখে সুভাষচন্দ্র বসু আঁচ করে নিলেন এঁরা অনেকটা পথ এগিয়ে গেছেন। সেই ধারণাকে পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য সেই দিন দুপুরবেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপনকক্ষে সুভাষচন্দ্র এক মিটিংয়ে মিলিত হলেন। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত হলেন—গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও ত্রিপুরা সেন। এ গোপন আলোচনায় সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁদের কি আলোচনা হয়েছিল তা অনন্ত সিংহের লেখা থেকে দেখা যাক।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড) বইতে অনন্ত সিংহ লিখেছেন (পৃঃ ২৬৯) ঃ

"সুভাষচন্দ্র সেই রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। আমাদের সামরিক কায়দায় শিক্ষিত ও সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানায়। তিনি দেখে খুশি হন। তারপর দুপুরবেলা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে তিনি গণেশ, ত্রিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে ভলান্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যতদূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে দিয়েছিলাম যে, আমরা মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভলান্টিয়ার হয়েই কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না। সুভাষবাবুকে আমাদের মত জানালাম যে, কংগ্রেসের নন্‌-ভায়োলেন্স নীতি আমরা কখনই অন্তর দিয়ে সমর্থন করি না। আমরা মাত্র কৌশল হিসাবে নন্‌-ভায়োলেন্স নীতি সাময়িকভাবে মেনে চলি এবং এই নন্‌-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে চাই। বলা বাহুল্য, সুভাষবাবু আমাদের দৃঢ় মনোভাবের আভাস পেয়ে আমাদের যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে তাঁর নৈতিক সমর্থন জানান।"

১২ মে বিকালবেলা। জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সমস্যাগুলি আলোচনার পর গান্ধীজীর নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা

ও আস্থা রেখে বললেন, "তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, অহিংস পন্থায় কেমন করে জাতীয় মুক্তি আসবে।"
(Printed Judgement of 1st. Armoury Raid Case Page-6)
এ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে চট্টগ্রাম জেলা যুব সংগঠনের তরফ থেকে কয়েকটি প্রচার-পত্র সমগ্র জেলায় প্রচার করা হয়েছে। লীফ্‌লেটগুলির কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেলো :
"শিকলদেবীর ঐ যে পূজা বেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া ?"
"পাগলামী তুই আয়রে দুয়ার ভেদি ঝড়ের মাতন বিজয় কেতন নেড়ে।"
"আগে দেশ, ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরে।"
সম্মেলনে প্যাণ্ডেলে নানা রকম প্ল্যাকার্ড ঝোলানো হয়েছে। "ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরে।" অংশটি বিপক্ষ দলের কোন সভ্য ছিঁড়ে ফেলে। অনন্ত সিংহের মতে অনুশীলন দলের একজন সভ্য লেখাটি ছিঁড়েছে। সম্মেলনের প্রথম দিনই এ ঘটনাটা ঘটে। এবং সন্ধ্যের পর থেকে কন্‌ফারেন্সে ইট পাটকেল পড়তে লাগলো। পরিণতি মোটেই সুখাবহ নয়। বিপ্লবীদলের আক্রমণের ফলে রাধিকা দত্ত আহত হন। ফলে সম্মেলনে পুলিশ মোতায়েন হলো। ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। পরদিন বিপ্লবীদলের কয়েকজন যুব-নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এবং ব্যক্তিগত জামিনে তাঁদের মুক্তি দেয়।
২৩ অক্টোবর। ১৯২৯ সাল। মামলার রায় দেওয়া হলো। বিচারে অনন্ত সিংহের চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড। লোকনাথ বল, নরেশ রায় ও ত্রিপুরা সেন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অনন্ত সিংহ জেলে গেলেন। অম্বিকা চক্রবর্তী কলকাতা হাইকোর্টে অনন্ত সিংহের জন্য আপীলের ব্যবস্থা করেন। আপীল নামঞ্জুর হলো। আরো অনেক চেষ্টার পর "Motion accepted" হয়। অনন্ত সিংহ জজকোর্টে আপীলের সুযোগ পেলেন। বন্দী হবার ছদিন পর তিনি জামিনে জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সম্মেলন মহাসমারোহে শেষ হবার পর মাস্টারদা বিপ্লবীদলের শক্তি সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ভাবলেন। এ বিষয়ে মাস্টারদা একটি আলোচনা সভার প্রয়োজন অনুভব করলেন। আলোচনা সভা আহ্বান করা হলো। সেই সভায় উপস্থিত হলেন—মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের প্রায় দু'মাস পর।
এই পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত হলো কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কাউন্সিল। দলটির নাম দেওয়া হলো—ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা। প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলেন মাস্টারদা — সূর্য সেন।
বিপ্লবীদল সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তাঁরা চট্টগ্রাম জেলাতেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তৈরি হবেন। এখন দলের প্রথম ও প্রধান কাজ—পরিকল্পনা রচনা করা।
বর্তমান লেখকের সঙ্গে প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষের কয়েকবার দেখা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে।

লেখক গণেশ ঘোষের কাছে জানতে চাইলেন, কিভাবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্ল্যান তাঁর মাথায় এলো ?

গণেশ ঘোষ লেখককে পালটা প্রশ্ন করলেন, "আমি যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল প্ল্যানের স্রষ্টা তা কি করে জানলেন ?"

লেখক জবাব দিলেন, "অনন্ত সিংহের লেখা 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড) বই পড়ে জেনেছি।"

গণেশ ঘোষ মৃদু হেসে বললেন, "আমি যখন জেলে ছিলাম তখন বিশ্বের প্রায় সব দেশের বিপ্লবের ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। অনেক চিন্তা করে দেখলাম—আইরিশ বিপ্লবের সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক মিল আছে। তাই আইরিশ বিপ্লবের ধাঁচে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচনা করি।" অনন্ত সিংহও একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তা গণেশ ঘোষকে শুনালেন। এবার গণেশ ঘোষ তাঁর প্ল্যানের খসড়ার কথা অনন্ত সিংহকে বললেন। গণেশ ঘোষের পরিকল্পনাটি শুনে অনন্ত সিংহ মুগ্ধ।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড) বইতে অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখেছেন (পৃঃ ২৮২) ঃ

"আমার পরিকল্পনাটি মন দিয়ে শুনল গণেশ। তারপর তার নিজস্ব পরিকল্পনা আমাকে বলল—

(১) অতর্কিতে অস্ত্রাগার অধিকার করা।
(২) অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হওয়া।
(৩) রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করা।
(৪) আভ্যন্তরীণ টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করা।
(৫) টেলিগ্রাফের তার কাটা।
(৬) বন্দুকের দোকান অধিকার।
(৭) দলে দলে ইউরোপীয়ানদের হত্যা করা।
(৮) অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করা।
(৯) তারপর শহর অধিকার করে নিয়ে ওখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা।

বাঃ, কী চমৎকার প্রস্তাব। শেষ কথাটি আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিল, 'পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে আর কাউকে দলত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ দেব না। একত্রে থাকব সকলে। মুখোমুখি যুদ্ধ করব। কোন গোপনীয়তা থাকবে না, বন্দী হবার ভয় থাকবে না। সম্মুখ যুদ্ধ করে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করব। একসাথে এসেছি একসাথে যাব' আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে গণেশের হাত জড়িয়ে ধরলাম। সমস্ত প্রোগ্রামই খুব ভাল হয়েছে, অনেক বেশি বাস্তবপন্থী হয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছি ওর প্রস্তাব।"

এ সময়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঘনকালো মেঘ জমতে সুরু করেছে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দী যতীন দাস সরকারি আইনের প্রতিবাদে জেলে দীর্ঘদিন অনশন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। যতীন দাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারা ভারত

উত্তাল। যতীন দাসের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম শহরেও এক বিরাট মিছিল বের হলো। যতীন দাস গণেশ ঘোষের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের অন্যতম।

সেই মিছিল চট্টগ্রামের জে. এম সেন হলের মাঠে এসে হাজির হয়। সেই সভায় অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

গণেশ ঘোষ যুবকদের আহ্বান করে তাঁর ভাষণে বললেন, "যতীন দাসের রক্ত আমাদের শিরা-উপশিরায় বয়ে যাক। সৃষ্টি হোক শত-সহস্র যতীন দাস। এবং অত্যাচারী সরকারের হৃদয়ে প্রচণ্ড ভীতির সঞ্চার করুক।"

যতীন দাসের মৃত্যু চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলকে প্রবলভাবে নাড়া দিলো। বন্ধুর মৃত্যুতে গণেশ ঘোষ প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। চরম আঘাতই চিন্তার উৎসমুখ খুলে গেলো। তারই ফলশ্রুতি চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ ও ক্ষমতা দখল পরিকল্পনা গণেশ ঘোষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

যতীন দাসের মৃত্যুর ক-দিন পরেই গণেশ ঘোষ প্ল্যানটি রচনা করেন। তারপর গণেশ ঘোষের বাড়িতে এক আলোচনা সভায় উপস্থিত হলেন— মাস্টারদা ও অনন্ত সিংহ। পরিকল্পনাটি মাস্টারদার হাতে তুলে দেওয়া হলো। ডুবুরির মতো তিনি পরিকল্পনার গভীরে ডুব দিলেন।

এতোক্ষণ মাস্টারদা যেন ধ্যানস্থ ছিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধির চাবিকাঠি হাতে পেয়ে তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। আনন্দে তিনি অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠলো। মাস্টারদার মনে আনন্দের ঢল নেমেছে। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে লক্ষ্য করে মাস্টারদা যা বললেন. তা অনন্ত সিংহের লেখা থেকে দেখা যাক ('অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩) ঃ

"এটাই কি কার্যকরী করতে পারব আমরা ? তোরা কি মনে করিস এটা করা সম্ভব হবে ? অন্তত একটা জেলায়ও আমরা কি এরকম, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার কায়েম করতে পারব ? ভারতবর্ষের একটা জায়গাও যদি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গড়ে তুলতে পারি, তাই করব। তোদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে, নিশ্চয়ই পারব আমরা। ঠিক আছে, তাই হোক। এটাই হোক আমাদের প্রাথমিক ক্ষুদ্রতম প্রোগ্রাম— একটা জেলায়ও অন্তত অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট তৈরি করা। আমার খুব মত আছে।"

দেখতে দেখতে জেলা কংগ্রেস নির্বাচনের সময় এসে গেলো। এ উপলক্ষে বিপ্লবীদলের কর্মীরা প্রবল উৎসাহে নির্বাচনের প্রচার কার্যে নেমে পড়লেন। বিপ্লবী সদস্যরা চট্টগ্রাম শহরের প্রায় প্রতি অঞ্চলের মানুষদের কংগ্রেস সভ্য করতে লাগলেন।

১৯২৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন। তাই বাংলার প্রত্যেক জেলায় জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবং নূতন জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে। নূতন জেলা কমিটিই প্রাদেশিক কমিটির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। সমগ্র বাংলাদেশে ভোট যুদ্ধের জন্য সাজো সাজো রব।

সেপ্টেম্বর। ১৯২৯ সাল। বাংলার প্রতি জেলার মতো চট্টগ্রাম শহরেও জেলা কংগ্রেস নির্বাচনী সভার আয়োজন হলো। স্থান— চট্টগ্রাম শহরের যাত্রামোহন সেন হল প্রাঙ্গণ। নির্বাচনে বিপ্লবীদল যে জয়যুক্ত হবে তা ভোটের আগেই বিপক্ষদল আঁচ করে নিয়েছে।

মাস্টারদা ও আশঙ্কা করছেন। বিপক্ষদল নির্বাচনী সভা পণ্ড করে দিতে পারে। তাই মাস্টারদার নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা নরেশ রায় প্রস্তুত।

যথাসময়ে নির্বাচনী সভা শুরু হলো। জেলা সম্পাদক সূর্য সেনের প্রস্তাবিত নামের তালিকা বহু ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলো। বিরোধী পক্ষের শোচনীয় পরাজয়ে সভাস্থলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেলো। বিরোধী দলের কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক লাঠি-ছুরি নিয়ে নির্বাচনী সভা আক্রমণ করে বসলো। ভয়ে সভা ছেড়ে কিছু লোক পালিয়ে গেলো। আক্রমণকারীরা পরিত্যক্ত লোহার চেয়ার নিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়তে থাকে। ফলে মাস্টারদা সহ আরো কজন আহত হন। স্বেচ্ছাসেবকদের পালটা আক্রমণে সমাজবিরোধীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সমাজবিরোধীরা পালিয়ে যাওয়ার পর আরো এক ঘণ্টা সভার কাজ চলে।

সন্ধ্যে উতরে গেছে। নির্বাচনী সভার কাজ শেষ করে স্বেচ্ছাসেবকদল কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত হলেন। স্বেচ্ছাসেবকদল সংখ্যায় প্রায় একশ। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, বাখারি ইত্যাদি রয়েছে। মাস্টারদার কপালের ক্ষতস্থান থেকে তখনো রক্ত ঝরছে। আহত মাস্টারদাকে দেখে উত্তেজিত স্বেচ্ছাসেবকদল ধ্বনি তুললেন—"প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ চাই।"

মাস্টারদা ভাবলেন এ বুঝি প্রলয় কাণ্ড ঘটাবে। এখুনি সামাল না দিলে নয়। মাস্টারদা ধীর পায়ে স্বেচ্ছাসেবকদলের সামনে এগিয়ে এলেন। রক্তমাখা মাথায় তিনি সামনে একখানি টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

মাস্টারদা স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশে বললেন, নির্বাচনে জয়লাভ তাঁদের আসল লক্ষ্য নয়। শত্রু চিনতে ভুল করলে চলবে না। তা না হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। আসল শত্রু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ। এ কথা তারা যেন ভুলে না যান। মাস্টারদার ভাষণ শুনে স্বেচ্ছাসেবকেরা মন্ত্রমুগ্ধ।

স্বেচ্ছাসেবকদের এবার বাড়ি ফেরার পালা। আক্রমণকারীরা মার খেয়ে রাতের অন্ধকারে বদলা নেওয়ার জন্য অলিগলিতে ওত পেতে আছে।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ইস্কুলের ক্লাস টেনের কৃতী ছাত্র সুখেন্দু দত্ত। বিপ্লবীদলের সদস্য তিনি। নির্বাচনের কাজ শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরছেন। তাঁর মা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। বাড়ি ফেরার পথে সুখেন্দুকে কে যেন পেছন থেকে ছুরি মারল।

সুখেন্দুর কাতর চিৎকার নেতা নির্মল সেন দুর থেকে শুনতে পেলেন। সুখেন্দুকে সাহায্যের জন্য তীরবেগে ছুটলেন তিনি। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলেন না। সমাজ বিরোধীরা নির্মল সেনকে একা পেয়ে ছুরি দিয়ে মাথায় আক্রমণ করল। ছুরির আঘাতে নির্মল সেনের মাথা ক্ষতবিক্ষত। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদলের কজন সদস্য ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। আক্রমণকারীরা অন্ধকারে পালিয়ে গেলো।

সুখেন্দুর আঘাত গুরুতর। ছুরির আঘাতে সুখেন্দুর মেরুদণ্ডের ডান পাশের স্নায়ু বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে ভরতি হলেন—সুখেন্দু, মাস্টারদা ও নির্মল সেন। এক ঘণ্টার মধ্যে সুখেন্দুর কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেলো।

চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের সিভিল সার্জেন সুখেন্দুকে দেখে বুঝলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে

আসছে। বাঁচার আশা মোটেই নেই, শেষ চেষ্টা হিসেবে সুখেন্দুকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে আসার ব্যবস্থা চলছে।

এবার বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন আর ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ নয়। এতে ঝক্কি পোহাতে হয় অনেক। বিপ্লবী সদস্যরা নিজেদের বাড়ি থেকে টাকাকড়ি, সোনাদানা অতি গোপনে সংগ্রহ করে বিপ্লবের অর্থভাণ্ডারে দান করবেন। সেই অর্থ দিয়েই বিপ্লব সংগঠিত হবে।

মাস্টারদা তখনও হাসপাতালে ভরতি। হাসপাতালেই মাস্টারদার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের বিষয়ে অনন্ত সিংহের দীর্ঘ আলোচনা হলো। মাস্টারদা আগ্নেয়াস্ত্র কেনার অনুমতি দিলেন।

অস্ত্র কেনার অনুমতি পেয়ে অনন্ত সিংহ টাকার কথা ভাবলেন। প্রথমে অনন্ত সিংহের মনে পড়লো সরোজ গুহের কথা। বড়ই নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী সদস্য সরোজ। তাঁর বাবার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল।

সরোজ গুহের বাবার নাম নন্দলাল গুহ। মায়ের নাম—কুসুম কামিনী। নন্দলাল গুহ চট্টগ্রাম কোর্টের একজন উকিল। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন। নন্দলাল গুহের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। সরোজ তাঁর ছেলেদের মধ্যে বড়। কোয়েপাড়া গ্রাম। থানা—রাউজান।

নন্দলাল গুহের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের গৃহশিক্ষক। চট্টগ্রামে দেশপ্রিয়ের মিটিংয়ে তিনি একজন বিশিষ্ট বক্তার আসন অলঙ্কৃত করেন।

সরোজ গুহ ক্লাস টেনের ছাত্র। সকালবেলা পড়তে বসেছেন। এমন সময় অনন্ত সিংহ সরোজ গুহের কাছে লোক পাঠালেন। অনন্ত সিংহের ডাকে সরোজ সাড়া দিয়ে হাসপাতালে হাজির হলেন।

অনন্ত সিংহ সরোজ গুহকে বললেন, "সুখেন্দুকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যেতে হবে। এবং কিছু অস্ত্র কিনতে হবে। বেশ কিছু টাকার দরকার। আপাতত দু' শ টাকার মতো প্রয়োজন। দেখিস, বাড়িতে যাতে অপ্রিয় হয়ে উঠতে না হয়।"

সরোজ গুহ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন। কিছুক্ষণ পর সরোজ গুহের সামনে একখানি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলেন সরোজের মাসিমা হেমনলিনী দত্ত ও বড়দি চামেলি প্রভা। তাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁদের আগমন। মাসিমার শ্বশুরবাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হয়। ছনহরা গ্রামের জমিদার গিন্নি হেমনলিনী। হেমনলিনী তাঁর দেওরপো নরেন দত্তের সঙ্গে বোনঝি চামেলি প্রভার বিয়ে দিয়েছেন। নরেন ফরেস্টারের চাকরি করেন।

হেমনলিনী পূজার আগে ক'-রকম সোনার গহনাগাটি তৈরি করালেন তা বাক্স খুলে তাঁর দিদি কুসুম কামিনীকে দেখালেন। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সরোজ মাসির গহনাগুলির দীপ্তিময় রূপ দেখলেন।

সরোজের চিন্তা অন্য দিকে মোড় নিলো। তিনি ভাবলেন, মাসির সোনার গহনাগুলি চুরি করতে পারলে বিপ্লবীদল অনেক রিভলবার ও পিস্তল কিনতে পারবে। মাসিমা সরোজকে তাঁদের সঙ্গে ছনহরা গ্রামে যেতে নিমন্ত্রণ করলেন।

সরোজ গুহ অনন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর পরামর্শ চাইলেন।

অনন্ত সিংহ সরোজ গুহকে বললেন, "বড় মোমবাতিতে চাবির ছাপ নিয়ে বক্সীহাটের তালাচাবি মেরামতকারীকে বললে—চাবি তৈরি করে দেবে। তবে পয়সা দুটি বেশি নেবে। মাসিমা যখন তোকে সঙ্গে নিতে চান তখন চলে যা। যদি বলিস ছনহরা গ্রামে দলের ছেলে পাঠিয়ে দেবো। অলঙ্কার চুরি করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবি না। তা হলে তোকে সন্দেহ করবে।"

সেদিন বিকেলেই হেমনলিনী, চামেলি প্রভা ও সরোজ নৌকো করে নদীপথে চলেছেন ছনহরা গ্রামে। নৌকোয় বসে তাস খেললেন তিনজনে। সন্ধ্যের পর তাঁরা পৌঁছলেন ছনহরা গ্রামের নদীর ঘাটে। সরোজ গুহকে যে ঘরে শুতে দিয়েছে সেই ঘরে হেমনলিনীর গহনার বাক্স সযত্নে রাখা। সরোজের মন আনন্দে ভরে গেলো। এই তো সুযোগ।

গভীর রাতে গহনার বাক্স খুলে সরোজ গুহ হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। বাক্সে একটি গহনাও নেই। ভাবলেন, তিনি যখন রাতে পুকুর ঘাটে হাত-পা ধুতে গেছেন তখন তাঁর মাসিমা অলঙ্কার গুলি অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর একি পরীক্ষায় ফেললে। বিপ্লবীদলের সদস্যরা ভাববেন, মাসির সোনা চুরি করতে সরোজের মায়া হয়েছে। দেশের জন্য প্রাণ দেবে কি করে? প্রাণের মায়া—বড় মায়া।

মাসির গহনা চুরি করতে না পেরে সরোজ সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। সকালবেলা শহরে ফিরে যাওয়ার জন্য ছলনার আশ্রয় নিলেন।

সরোজ তাঁর মাসিকে বললেন, "খুব পেট খারাপ আমার। পেট ব্যথা করছে। অসুখের সময় মায়ের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে। এখুনি মায়ের কাছে চলে যাবো।"

হেমনলিনী বললেন, "বাবা, তুমি আমার ঘরে গিয়ে ঘুমাও। তোমার জন্য ডাব আর ওষুধের ব্যবস্থা করছি। মায়ের জন্য এতো ছটফট করছো কেন? এখানে তোমার বড়দি আর আমি আছি। চিন্তা কিসের?"

জমিদার বাড়ির একদল মহিলা সরোজের মাসির ঘরে ঢুকলেন, সিন্দুক খুলে মাসিমা গহনাগুলি তাঁদের দেখালেন। গহনা যথাস্থানে রেখে সিন্দুক বন্ধ করলেন। মাসিমার সঙ্গে মহিলারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

এবার ঘরে এলো সরোজ গুহের পাঁচ বছরের ভাগনী। তার পরনে শাড়ির আঁচলে এক গোছা চাবি। ভাগনী মামা—মামা বলে সরোজ গুহের বিছানায় উঠলো। সরোজ গুহ আদর করার ছলে ভাগনীর অজানতে শাড়ির আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিলেন। কিছু পয়সা হাতে দিয়ে তার মাকে ডাকতে পাঠালেন।

ভাগনী চলে গেলো। সরোজ গুহ দরজায় খিল দিলেন। চাবি লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক খুলে গেলো। সোনার গহনাগুলি সিন্দুকের মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সিন্দুকের ভেতর একটি কাপড়ের থলি দেখতে পেলেন। থলিটিতে সব গহনাগুলি ভরতি করলো সরোজ। তারপর গহনা ভরতি থলিটি চাদরের তলায় ঢুকিয়ে নিলেন।

ভাগনী তার মাকে খুঁজে না পেয়ে মামার কাছে ফিরে এলো। একই কায়দায় সরোজ গুহ ভাগনীর শাড়ির আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে দিলেন।

কাজ হাসিল। গহনা নিয়ে সরোজ গুহ মাসির ঘর থেকে চুপিসারে বের হয়ে পড়লেন। নিরাপদ দূরত্বে এসে তিনি প্রায় ছুটতে শুরু করলেন।

ছনহরা গ্রাম থেকে কালারপোল। দীর্ঘ পথ। এ দীর্ঘ পথ সরোজ গুহ হেঁটে এলেন। তারপর কালারপোল থেকে ফের নৌকা পথে সদরঘাট ক্লাবে এসে অনন্ত সিংহের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। সূর্য তখন অস্তাচলে।

'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' (প্রথম খণ্ড) বইতে অনন্ত সিংহ সরোজ গুহের সোনার গহনা চুরির বিষয়ে লিখেছেন (পৃ-২৬৬):

"মাত্র দুদিন সময় দেওয়া হয়েছিল সরোজকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সরোজ অনেকগুলি গয়না নিয়ে এল। তাঁকে বলেছিলাম দু'শ টাকার মত গয়না আনতে, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে সে যা নিয়ে এল তা বিক্রি করে প্রায় হাজার টাকা পাওয়া গেল।"

সরোজের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে মাসি হেমনলিনী দত্ত তাঁর চাকরকে চট্টগ্রাম শহরে খবর আনতে পাঠালেন। অসুস্থ সরোজের চিন্তায় মাসি অধীর হয়ে উঠেছেন। চাকরটি শহরের বাসায় গিয়ে সরোজের মায়ের সঙ্গে দেখা করলো। সরোজ নিরাপদে বাড়ি পৌঁছানোর খবর নিয়ে চাকরটি কালবিলম্ব না করে ছনহরা গ্রামে ফিরে গেলো।

যেদিন সরোজ মাসির সোনার গয়না নিয়ে পালিয়ে এলেন সেদিন দুর্গাপূজার পঞ্চমী। তিনি অষ্টমীর দিন অলঙ্কার পরার জন্য সিন্দুক খুললেন। দেখেন সিন্দুক ফাঁকা। গহনা একটিও নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেলো।

বাড়িতে দৈবজ্ঞকে ডাকা হলো। স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না, সরোজ তাঁর মাসির অলঙ্কার চুরি করতে পারেন।

খড়ি পেতে দৈবজ্ঞ বললেন, "খুব নিকট আত্মীয়ই গয়না চুরি করেছে।"

হেমনলিনীর সব সন্দেহ গিয়ে পড়লো বাড়ির মহিলাদের ওপর। কেননা কদিন আগে তাঁর ঘরে ঢুকে সমস্ত গয়না তাঁরা দেখে গেছেন। ফলে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

মাস্টারদার বিপ্লবীদলের দুই সুখেন্দু দত্তের জীবন দুদিকে বেঁকে গেছে।

ছনহরা গ্রামের জমিদার যোগেন্দ্রলাল দত্তের ছেলে সুখেন্দু দত্ত দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হয়ে মুক্তির প্রতীক্ষায়।

সারদাচরণ দত্তের ছেলে সুখেন্দু দত্ত চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনের দিন গুণ্ডাদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

সুখেন্দুকে চিকিৎসার জন্য স্ট্রেচারে করে কলকাতায় নিয়ে এলেন ; নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী সদস্য। সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় তাঁকে কলকাতার বেলগাছিয়া হাসপাতালে ভরতি করা হলো। সুভাষচন্দ্র রোজ দুবেলা সুখেন্দুকে হাসপাতালে দেখে যান।

আহত সুখেন্দু দত্তের পৌঁছানোর পরদিন অনন্ত সিংহ আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্য কলকাতায় এলেন। উপযুক্ত দাম দিয়ে অনুকূল মুখার্জীর কাছ থেকে একটি সাতশটের রিভলবার পেলেন। অনন্ত সিংহের জীবনে এটিই প্রথম কেনা আগ্নেয়াস্ত্র।

নেতা অনুকূল মুখার্জী অনন্ত সিংহকে অনেক 'স্মাগলার'দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অনুকূল মুখার্জীর সহায়তায় অনন্ত সিংহ পাঁচ-ছ মাসে মোট চৌদ্দটি আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে সক্ষম হলেন।

প্রথম রিভলবার সংগ্রহ করে অনন্ত সিংহ বেলগাছিয়া হাসপালের কেবিনে গিয়ে সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা করলেন। সুখেন্দু বিছানায় শুয়ে আছেন। সুখেন্দুর সামনে জননীর কাতর দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন নেতা নির্মল সেন। সুখেন্দুর জীবন দীপ নিবুনিবু। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে রোগ শয্যায় সুখেন্দু পড়ে আছেন হাইফেনের মতো। মৃত্যু তাঁকে আলিঙ্গন করতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে।

খালি রিভলবারটি অনন্ত সিংহ সুখেন্দুর হাতে দিলেন। কি করে গুলি ছুঁড়তে হয় এবং টোটা ভরতে হয় তা দেখিয়ে দিলেন। রিভলবার হাতে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন সুখেন্দু।

সুখেন্দু প্রবল উৎসাহে অনন্ত সিংহকে বললেন, "আমার বিপ্লবী জীবন সার্থক। যাওয়ার আগে আমার আরাধ্য বস্তু পেলাম আমি। তোমরা সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলো। আমার আত্মা সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকবে।"

দেশের বড়ো দুর্ভাগ্য প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন বিপ্লবী সুখেন্দু মাসখানেক মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পর কলকাতার বেলগাছিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শত চেষ্টা করেও সুখেন্দুকে বাঁচাতে না পেরে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র অন্তরে নিদারুণ আঘাত পেলেন। সুভাষচন্দ্রের আঘাতের পরিমাপ তাঁর কর্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায়।

'বিপ্লবী সূর্য সেন' বইতে গণেশ ঘোষ লিখেছেন (পৃঃ ৬৯) ঃ

"সুভাষচন্দ্র সেইদিন (সুখেন্দু দত্তের মৃত্যুর দিন) সকালে খালি পায়ে সুখেন্দুর খাটিয়ার একধার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সারা পথ হেঁটে বেলগাছিয়া হাসপাতাল থেকে সুখেন্দুর দেহ ক্যাম্পবেল হাসপাতালে তুলে দিয়েছিলেন। একবারও তিনি বিশ্রামের জন্য ঐ খাটিয়া ছেড়ে দেন নি। দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়েছে, সকলেই অবাক্ হয়েছে।"

এর পরের অধ্যায়—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রার্থী দুজন। নির্বাচন প্রার্থীরা হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র মাত্র পাঁচ ভোটে জয়ী হলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচনে চট্টগ্রাম জেলা থেকে পাঁচজন নির্বাচিত প্রতিনিধি কলকাতায় এসেছিলেন। এবং পাঁচজন প্রতিনিধিই এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। চট্টগ্রাম জেলার সেই পাঁচজন ভোটদাতাদের অন্যতম ছিলেন গণেশ ঘোষ। এ বিষয়ে তিনি কি বলেন দেখা যাক।

'বিপ্লবী সূর্য সেন' বইতে (পৃঃ ৬৯) গণেশ ঘোষ লিখেছেন ঃ

"যথাসময়ে বউবাজারস্থিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে নূতন নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটির সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি নির্বাচনে সুভাষ চন্দ্র ৫ ভোট বেশী পেয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ পাঁচটি ভোটই দিয়েছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের নির্বাচিত ৫ জন সদস্য।"

বর্তমান লেখক প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষের কাছে জানতে চাইলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে ভোট না দিয়ে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন তাঁরা ভোট দিলেন?

কেননা—দেশপ্রিয়র বাড়ি চট্টগ্রাম। এবং আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের টাকা ডাকাতির মামলায় যতীন্দ্রমোহন বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেশপ্রিয়ের অসাধারণ মামলা পরিচালনায় মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংহ সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন।

লেখকের বক্তব্য গণেশ ঘোষ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। পরিশেষে বললেন, "সুখেন্দুকে বাঁচানোর যে প্রচেষ্টা সুভাষবাবু করেছিলেন এবং সুখেন্দুর মরদেহ তিনি খালি পায়ে দীর্ঘ পথ কাঁধে নিয়ে একটানা বয়ে চলে ছিলেন, তা দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তা ছাড়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের সঙ্গে সুভাষবাবুর ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘ দিনের। তিনি মাস্টারদার বিপ্লবীদলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপোষণ করতেন।

১৯২৯ সালের অক্টোবর। যুগবিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রথমে একটি দিন মোটামুটি ভাবে স্থির করেন।

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্বে মাস্টারদা বিপ্লবীদলের যুব-নেতাদের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ কেনার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কালোবাজার থেকে সেগুলি কিনতে হবে। জলস্রোতের মতো টাকা ঢালতে হবে। তবেই আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব।

বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন ডাকাতি আর নয়। তাতে সময়ের অপচয়। পুলিশের সঙ্গে খেলতে হয় লুকোচুরি। তা ছাড়া ডাকাতির অনেক টাকা চলে যায় মামলা-মকদ্দমায়। ফলে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়।

মাস্টারদার বিপ্লবীদলে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেই বেশি ধনী পরিবারের ছেলে মাত্র ক-জন। বিপ্লবী সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হলো—দলের প্রতি আনুগত্য স্বরূপ প্রত্যেক সদস্যকে নিজের বাড়ি থেকে চুপিসারে টাকা যোগাড় করে বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে দিতে হবে।

বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে কে কতো টাকা বা সোনাদানা দান করতে পারে তারজন্য সভ্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গেলো। লোকনাথ বলের ছোট ভাই হরিগোপাল বল। ডাকনাম টেগ্‌রা। বয়স বছর পনের। ক্লাস নাইনের ছাত্র। গায়ের রঙ খুব ফরসা। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সুদর্শন কিশোর।

বাবা-মায়ের বড্ড আদরের দুলাল টেগ্‌রা। টেগ্‌রার জন্ম চট্টগ্রাম শহরে। টেগ্‌রার ষষ্ঠী পূজোয় তাঁর বাবা বাড়িতে ব্যাণ্ডপার্টি এনেছিলেন।

বিপ্লবীদলে টাকা দেওয়ার জন্য টেগ্‌রা এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন।

নিত্য পোশাক বদলানোর প্রতি টেগ্‌রার খুব ঝোঁক। তাঁর বড়দা ভোলানাথের বিয়ে হয়েছে। বেশিদিন হয় নি। দাদা ও বৌদি শহরের বাড়িতে তাঁদের সঙ্গে থাকেন। বৌদির গা ভরতি গয়না।

একদিন টেগ্‌রা তাঁর বৌদি স্বর্ণবালাকে বললেন, "বৌদি, আমি যখন সাহেবী পোশাকে শহরের রাস্তা দিয়ে চলি তখন পথচারীরা হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা বলাবলি করে, ছেলেটিকে দেখলে যেন সাহেবের ছেলে মনে হয়। আবার ধুতি পাঞ্জাবি পরে বের হলে বলে যেন রাজপুত্র। সোনাভাইয়ের (লোকনাথ বল) দিকে মোটেই কেউ তাকায় না।

ছোট দেওরের ছেলেমানুষি কথা শুনে স্বর্ণবালা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। বৌদির পাশে টেগ্‌রার মেজদি চারুলতা দাঁড়িয়ে। তিনিও টেগ্‌রার বালক সুলভ কথায় না হেসে পারলেন না।

বৌদির হাসির সুযোগ নিয়ে টেগ্‌রা বললেন, "তোমার শাড়ি দাও বৌদি। আমি পরে দেখি। দেখো, কেমন মানায়।"

হাত বাড়িয়ে টেগ্‌রা তাঁর বৌদির আলনা থেকে একখানা শাড়ি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরে নিলেন। শাড়ি পরা অবস্থায় টেগ্‌রাকে দেখে বৌদির হাসি যেন আর থামে না।

টেগ্‌রা ফের বললেন, "বৌদি, তোমার সোনার গয়নাগুলি আমায় পরতে দাও। তা হলে দেখবে, আমাকে আরো কতো সুন্দর দেখাচ্ছে।"

ছোট দেওরের অনুরোধে বৌদি তাঁর কিছু গয়না পরতে দিলেন। বৌদিকে এভাবে ভুলিয়ে শাড়ি গহনা পরে টেগ্‌রা বাড়ির সবাইকে দেখালেন। সবাই হাসাহাসি করলেন। তারপর স্নান করার অছিলায় শাড়ি পরা অবস্থায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন।

বাড়িতে যখন টেগ্‌রার খোঁজ পড়লো ততক্ষণে বৌদির গয়না বিপ্লবীদলের অর্থভাণ্ডারে জমা পড়ে গেছে। পনের দিন পর টেগ্‌রা বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে তাঁকে কেউ কিছুই বললেন না।

এবার লোকনাথ বলের অর্থ সংগ্রহের পালা।

লোকনাথ বলের বাবার নাম প্রাণকৃষ্ণ বল। মায়ের নাম কুসুম কুমারী। বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার ধোরলা গ্রাম। থানা—বোয়ালখালি।

প্রাণকৃষ্ণের তিন ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলেদের নাম—ভোলানাথ, লোকনাথ ও হরিগোপাল (টেগ্‌রা)। মেয়েদের নাম সুশীলা, চারুলতা, প্রিয়বালা ও প্রভাবালা।

লোকনাথ বলের বাবা প্রথমে ইংরেজ সরকারের অধীনে লুসাই পাহাড়ে কেরাণীর চাকরি করেন। লুসাই পাহাড়ে লোকনাথের জন্ম হয়। তারপর তাঁর বাবা নোয়াখালি কোর্টে সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। সীনিয়র সেরেস্তাদারের প্রমোশন পেয়ে চট্টগ্রাম জেলা কোর্টে আসেন।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে লোকনাথ বল বি. এ. পাস করেন। ভালো গান ও অভিনয় করেন। দুহাতে দুটি মোটর গাড়ির গতিরোধ করতে পারেন। গায়ের রঙ খুব ফরসা। লোকনাথ বলকে দেখতে অনেকটা নেতাজীর মতো। আকর্ষণীয় চেহারা।

লোকনাথ বলেদের আর্থিক অবস্থা ভালো। বড় ভাই রেলওয়েতে চাকরি করেন। গ্রামে জমিজেরাত আছে। শহরে নিজস্ব বাড়ি। বাড়ি ভাড়া পান।

একদিন লোকনাথ বলের মা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার জন্য লোকনাথ বলকে একখানি চেক দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে ঠাকা নিয়ে তিনি বিপ্লবীদলে জমা দিলেন। বি. এ. পরীক্ষার পরও তিনি কলেজ হোস্টেলে থাকেন। বেশ কিছুদিন বাড়ি এলেন না।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম নায়ক লোকনাথ বল। বিপ্লবীদলে এতো অল্প টাকা দিলে চলবে কেন?

বর্তমান লেখক লোকনাথ বলের মেজো বোন চারুলতার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁর বাড়ি কলকাতায়। গাঙ্গুলীবাগান।

চারুলতার ডাক নাম কেটি। চারুলতা লেখককে বললেন, "সোনাভাই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বি. এ. পরীক্ষার পরও তিনি কলেজ হোস্টেলে থাকেন। অল্পদিন আগে উকিল উপেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আমার গা ভরতি গয়না। একদিন সোনাভাই (লোকনাথ বল) কলেজ হোস্টেল থেকে বাড়ি এলেন। আমি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মেজদা অর্থাৎ সোনাভাই মাকে বললেন 'মা, আমি সর্দিতে ভুগছি। তুলসীপাতার রস করে দাও।' মা তুলসীপাতার রস করতে গেলেন। এই ফাঁকে সোনাভাই আমাকে বললেন, 'কেটি, তোর গলার হারটি আমাকে দে।' এ কথা বলতে না বলতেই সোনাভাই সোনার সাত ভরি হারটি আমার গলা থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না শুনে মা দৌড়ে এলেন। কেঁদে বললাম, মা, সোনাভাই আমার গলার হারটি হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে গেলেন। মা ঘটনাস্থলে আসার আগেই সোনাভাই উধাও। মা হার গড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শান্ত করলেন আমায়। সোনাভাই কলেজ হোস্টেল থেকে বেশ কিছুদিন বাড়ি এলেন না।"

চারুলতার বাড়িতে লোকনাথ বলের ফটো টাঙ্গানো। সোনাভাইয়ের কথা বলতে বলতে চারুলতার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো।

থান কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে চারুলতা ফের বললেন, "সোনাভাই কলকাতা করপরেশনের খুব বড় অফিসার ছিলেন। সে সময় আমার বাড়ি এসে প্রায় আমাকে দেখে যেতেন।"

লোকনাথ বল কেবল বিপ্লবী নায়ক নন। পরিবারে তিনি একজন স্নেহপরায়ণ দাদাও। গুণ্ডা দমনে অতুলনীয় সমাজসেবী তিনি।

জেলা শহর চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম শহরে সিরাজ নামে এক গুণ্ডা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তার শাগরেদরা হলো—গাড়িওয়ালা আর সাম্পানওয়ালা। শহরের প্রায় চায়ের দোকানেই গুণ্ডাদের আড্ডা। গুণ্ডারা হিন্দুর ছেলেদের অহেতুক অপমান করে। হিন্দুর মেয়েদের প্রতি অশোভন আচরণের ফলে মেয়েরা ইস্কুলে যেতে ভয় পায়। শহরের প্রতি রাস্তায়ই কম বেশি চায়ের দোকান। ফলে গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। গুণ্ডারা ধনী ব্যবসায়ীদের মদত পুষ্ট। পুলিশ সব দেখেও চোখ বুজে আছে।

লোকনাথ বল তখনো ব্যায়ামবীর আখ্যায় ভূষিত হননি। একদিন লোকনাথ বল সিরাজ গুণ্ডার দলকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলেন। তারপর সিরাজ গুণ্ডার বাড়ি চড়াও করে তাকে পাকড়াও করলেন। লোকনাথ বল হান্টার দিয়ে সিরাজ গুণ্ডাকে বেদম মারে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুললেন। মারের চোটে সিরাজ গুণ্ডার সেই কী চেঁচানি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেদিন লোকনাথ যেন ভীমের ভূমিকা নিলেন।

লোকনাথ বল সিরাজ গুণ্ডাকে শায়েস্তা করার খবর সঙ্গে সঙ্গে শহরে ছড়িয়ে পড়লো। জনসাধারণ ফেললো স্বস্তির নিশ্বাস। মনে মনে তারা লোকনাথ বলের দীর্ঘজীবন কামনা করলো।

মার খেয়ে গুণ্ডারা দমে গেলো। কিছুদিন চুপ করে থাকলো। কিন্তু গুণ্ডারা স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে আবার শুরু করে দিলো গুণ্ডামি। সমাজ বিরোধীদের অত্যাচারে জনজীবন দুর্বিষহ।

বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করলেন, যুব-বিদ্রোহের আগে প্রথম সারির বিপ্লবীদের সাহস পরীক্ষার প্রয়োজন। অনন্ত সিংহ পরিচালিত চট্টগ্রাম শহরের শরীর-চর্চার ক্লাব গুলির মধ্যে সদরঘাট ক্লাবই প্রধান। এ ক্লাবের সদস্যদের প্রায় সবাই বুকের ওপর রোড্ রোলার পার করার ও চলন্ত মোটর গাড়ির গতিরোধ করার শক্তি রাখেন। এ ছাড়া মুষ্টিযোদ্ধার অভাব নেই। দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম সারির বিপ্লবী সদস্যদের দলবদ্ধভাবে শহরের গুণ্ডা দমনের কাজে লাগানো হলো। এতে ফল ভালোই হলো—বিপ্লবী সদস্যদের দিয়ে গুণ্ডা দমনে সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন পাওয়া গেলো। একই সঙ্গে বিপ্লবী সদস্যদের স্নায়বিক পরীক্ষা নেওয়া হলো। গুণ্ডা দমনে অনন্ত সিংহও সময়-সময় অংশ গ্রহণ করতেন।

যুব-বিদ্রোহের দিন যতই এগিয়ে আসছে বিপ্লবীরা দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রে তৈরি হতে লাগলেন। অনন্ত সিংহ আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আসা-যাওয়া করছেন। স্মাগলাদের কাছ থেকে চড়া দামে আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে গিয়ে বিপ্লবীদলের অর্থভাণ্ডার শূন্য হতে চলেছে। এদিকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্য অনন্ত সিংহ কলকাতার বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখার্জীর মাধ্যমে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করলেন।

অনন্ত সিংহ চট্টগ্রামে খবর পাঠালেন, অস্ত্র কেনার জন্য কাবুলিওয়ালার থেকে এক মাসের ওয়াদায় টাকা ধার করা হয়েছে। অস্ত্র কেনার জন্য আরো টাকা চাই। অনেক টাকা।

বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে যে কজন ধনী পরিবারের ছেলে আছে তাঁদের অন্যতম হলেন—হরিপদ মহাজন।

হরিপদ মহাজনের বাবার নাম নবীনচন্দ্র মহাজন। মায়ের নাম ভারতেশ্বরী।

নবীনচন্দ্র মহাজনের এক ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলের নাম হরিপদ। মেয়েদের নাম—নীরদাবালা, কিরণবালা ও লীলাবতী।

বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার বীণাজুড়ি গ্রাম। থানা রাউজান।

নবীনচন্দ্রের ব্যবসা কেবল চট্টগ্রাম শহরে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা, রংপুর ও বার্মায় ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়া জমিদারি তো আছেই।

গ্রামের এম. ই. ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ করে হরিপদ চট্টগ্রাম শহরে পড়তে এলেন। কিছুদিন পর তাঁর বাবা মারা যান। হরিপদের জেঠতুতো দাদা মহেন্দ্রলাল ব্যবসা ও জমিদারির হাল ধরলেন।

বাবা মারা যাওয়ার পর হরিপদ বিপ্লবীদলের সদস্য হন। সেই থেকে বিপ্লব তাঁকে পেয়ে বসলো। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়লেন। শহরের বাসা থেকে তিনি কখন বের হয়ে যান আর কখন ফেরেন তার ঠিকঠিকানা নেই। তাঁর বেপরোয়া চলাফেরার খবর গ্রামে মায়ের কাছে পৌঁছলো।

একদিন হরিপদের মা কেঁদে কেঁদে হরিপদকে বললেন, "তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে পারলেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।"

হরিপদ তাঁর মাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "মা, আমি যে পথে চলেছি সেটি সঠিক পথ। তোমার চোখের জল আমার চলার পথকে পিছল করে দেবে।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন পথে চলেছো বাবা ? তা আমাকে খুলে বলো।"

জবাবে হরিপদ বললেন, "মা, তোমার নাম ভারতেশ্বরী। মহাভারতের সুধন্বার মায়ের মতো

আমাকে ভাবী জীবনের চলার পথে সাজিয়ে দেবে। তাতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

হরিপদদের একান্নবর্তী পরিবার। জেঠতুতো দাদা শশাঙ্ক বিজয়ের স্ত্রী স্নেহলতাকে হরিপদ শ্রদ্ধা করেন। বৌদিকে হরিপদ আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি বই পড়তে দেন। স্নেহলতা হলেন—অগ্নিযুগের প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতার খুড়তুতো বোন।

স্নেহলতাকে হরিপদ চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায়ই চিঠি লেখেন। প্রত্যেক চিঠিতে লেখা থাকে তাঁর মাকে স্নেহলতা যেন সান্ত্বনা দেন।

বিপ্লবী নেতৃত্ব হরিপদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা প্রত্যাশা করেন। হরিপদও টাকা যোগাড়ের উপায় উদ্ভাবনে রত।

ফাল্গুন মাস। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বীণাজুড়ি গ্রামে ত্রিপুরেশ্বর মন্দিরে প্রতি বছর চারদিন ধরে মেলা বসে। এ মন্দির হরিপদের ঠাকুরদার শ্মশানে তাঁর ছেলে নবীনচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মেলা উপলক্ষে দুদিন আগে হরিপদ তাঁর ছোট বোন লীলাবতীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে গেলেন। দাদাকে দেখে লীলাবতীর আনন্দ আর ধরে না।

জমিদার বাড়ির বৌ লীলাবতী। সোনার গয়নায় প্রতিমার মতো সেজে লীলাবতী তার দাদার সঙ্গে নৌকোয় চাপলো। মাঝি নৌকোর দাঁড় টেনে চলেছে। হরিপদ ছোট বোনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

কথার ফাঁকে এক সময় হরিপদ লীলাবতীকে বললেন, "তুই আমাকে ভালোবাসিস তো?"

নৌকো তখন বড় নদীতে এসে পড়েছে।

দাদার প্রশ্নে লীলাবতী হকচকিয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, "দাদা, তুমি হঠাৎ একথা বলছো কেন? তুমি আমার একমাত্র দাদা। তোমাকে ভালোবাসবো না তো আর কাকে ভালোবাসবো?

তুই আমার বোন নয়—ভাই। আমাকে তুই সাহায্য করবি তো?"

লীলাবতী জবাব দিলো, "দাদা, তুমি আমার কাছে কি রকম সাহায্য চাও? আমার পক্ষে সম্ভব হলে নিশ্চয় সাহায্য করবো।"

"তা হলে শোন। আমি যুদ্ধে যাবো। বাংলা দেশের মেয়েরা ভাইদের যুদ্ধে যেতে সাহায্য করছেন। আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবো। তুই আমাকে যদি ভালোবাসিস তবে তোর সোনার গয়না গুলি খুলে দে। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমার জমিদারির সম্পূর্ণ অংশ তোর নামে লিখে দেবো।" হরিপদ স্তোক বাক্যে তাঁর বোনকে ভোলাতে চেষ্টা করলেন।

লীলাবতী দাদার প্রস্তাব শুনে চুপ মেরে গেলো।

বোনের নীরবতা দেখে হরিপদ ভয় দেখিয়ে ফের বললেন, "তোর গয়না না দিলে আমি নদীতে ঝাঁপ দেবো। তারপর তুই আমার মরা মুখ দেখতে পাবি।"

দাদার একরোখা স্বভাবের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে লীলাবতীর পরিচয়। দাদার জীবন রক্ষা

করার জন্য লীলাবতী বিনা প্রতিবাদে গা থেকে একে-একে সব অলঙ্কার খুলে দিলো। একমাত্র নাকছাবি ছাড়া তার গায়ে আর কোন সোনার গয়না নেই।

হরিপদ লীলাবতীকে একটি বুদ্ধি বাতলিয়ে দিয়ে বললেন, "তোর গয়নার কথা বাড়িতে কেউ জানতে চাইলে বলবি—পথে ডাকাতের ভয়ে সব গয়না তোর শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছিস।"

গ্রামের বাড়িতে লীলাবতীকে পৌঁছিয়ে দিয়েই হরিপদ চট্টগ্রাম শহরে চম্পট দিলেন। ঘটনাচক্রে হরিপদর মা তখন বাড়িতে নেই।

লীলাবতী তার বৌদি স্নেহলতাকে ঘটনার আদ্যপ্রান্ত খুলে বললো। বলতে বলতে কেঁদে ফেললো।

কাঁদতে কাঁদতে লীলাবতী বললো, "আমি আমার গয়নার জন্য কাঁদছি না বৌদি। দাদা যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে তাই আমার চিন্তা। গয়না গেছে। গয়না পাবো। কিন্তু দাদা গেলে, দাদা পাবো না"

বিপ্লবীদলে বোনের অলঙ্কার দান করে হরিপদ সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর জেঠতুতো দাদা মহেন্দ্রলালকে পাঁচ হাজার টাকার চাহিদা পেশ করলেন। ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্রলাল বার্মায় গিয়ে হরিপদকে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা দিলেন। কথা না দিয়েও উপায় নেই। কেননা হরিপদ একাই জমিদারি ও ব্যবসায়ের যৌথ পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির দশ আনা অংশের মালিক।

মহেন্দ্রলাল বার্মা চলে গেলেন। টাকার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন হরিপদ। দিন গড়িয়ে চললো। বার্মা থেকে হরিপদের নামে কোন টাকা এলো না। যে কোন উপায়ে টাকা তাঁকে যোগাড় করতেই হবে।

চট্টগ্রাম শহরে জোর কদমে চলছে হরিপদর পৈতৃক ব্যবসা। একদিন হরিপদ তাঁদের একটি দোকানে গিয়ে কর্মচারীদের ছুরি দেখিয়ে ক্যাশ বাক্স থেকে অনেক টাকা নিয়ে বের হয়ে এলেন। এখনো তাঁর চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেক। তিনি চান—দানের তালিকায় তাঁর নাম শীর্ষস্থানে।

এতোদিনে হরিপদ তাঁর জেঠতুতো দাদার ফন্দি বুঝে ফেলেছেন। মহেন্দ্রলাল ভেবেছিলেন তিনি হরিপদকে ধোঁকা দিয়ে পার পেয়ে যাবেন। ভাই নাছোড়বান্দা।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বার্মার জাহাজে চাপলেন হরিপদ। সঙ্গে রিভলবার। রেঙ্গুনে গিয়ে হরিপদ মহেন্দ্রলাল মহাজনের বুকে রিভলবার তাক করে বললেন, "হয় পাঁচ হাজার টাকা বের করো। নতুবা ভগবানের নাম স্মরণ করো।"

মহেন্দ্রলাল মহাজন শিয়রে শমন বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। পাঁচ হাজার টাকা হরিপদর হাতে তুলে দিয়ে প্রাণে বাঁচলেন তিনি।

টাকা নিয়ে হরিপদ বার্মা থেকে চট্টগ্রাম ফিরে এলেন। হরিপদর কাণ্ডকারখানা দেখে ব্যবসায়ের কর্মচারীরা তটস্থ। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কাজে যখন হরিপদ বিভোর তখন তাঁর ঠাকুরমা রঙ্গমতী বীনাজুড়ি গ্রামের বাড়িতে মারা গেলেন।

ধনীর দুলাল হরিপদ ঠাকুরমার বড়ো আদরের। হরিপদ তখন চট্টগ্রাম শহরে। ঠাকুরমার

মৃত্যু সংবাদ নিয়ে শহরে লোক এলো। তাঁকে জানানো হলো তিনি বাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত শবদাহ করা হবে না।

সংবাদবাহককে হরিপদ বললেন, "আমি পরে যাচ্ছি। আপনি এগোন।"

হরিপদের অপেক্ষায় শবদেহ ঠায় বারো ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়েছে। সবাই চিন্তিত। কিন্তু হরিপদর দেখা নেই। অগত্যা রঙ্গমতীর শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো।

এমন সময় হরিপদ শ্মশানে এসে হাজির। দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। বাবা গেলেন। ঠাকুরমাও চলে গেলেন। হরিপদের মনের রঙ ফিকে হতে লাগলো। মায়াময় সংসারে এখন স্নেহের বন্ধনে তাঁর পথ আগলিয়ে আছেন একমাত্র মা-ই।

বিপ্লবী সদস্যদের প্রচেষ্টায় বিপ্লবী অর্থ ভাণ্ডার সময় সময় পূর্ণ হয়। আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে গিয়ে তা নিমিষে শূন্য হয়ে যায়। অস্ত্র কেনা হচ্ছে কলকাতায়। তা গোপনে আনতে হবে চট্টগ্রামে।

একদিন গণেশ ঘোষ সরোজ গুহকে বললেন, "সরোজ, তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে।"

গণেশ ঘোষের নির্দেশে সরোজ কলকাতা যাত্রা করলেন। কলকাতা যাওয়া এই তাঁর প্রথম। ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে নামলেন তিনি। দেখেন অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁর প্রতীক্ষায় প্লাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে আছেন।

অম্বিকা চক্রবর্তী সরোজকে নিয়ে গেলেন মীর্জাপুর (সূর্য সেন স্ট্রীট) আমেরিকান লন্ড্রিতে। সেখান থেকে শশাঙ্ক চৌধুরী অলিগলি পথে সরোজকে অন্য বাসায় নিয়ে চললেন, ঘুপসি গলির ভেতর একটা বাড়ির সামনে এসে শশাঙ্ক চৌধুরী দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজায় টোকা মারলেন। সাংকেতিক টোকা শুনে অনন্ত সিংহ দরজা খুললেন। সরোজ গুহ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। একটি লেদার সুটকেস খুলে অনন্ত সিংহ সরোজকে কয়েকটি রিভলবার দেখালেন।

অনন্ত সিংহ বললেন, "সরোজ, আগামীকাল সকালে সুটকেসটি নিয়ে ট্যাক্‌সি করে ব্যারাকপুর স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপবি। এবং চট্টগ্রাম শহরের আগে ভাটিয়ারি রেল স্টেশনে নেমে পড়বি। তোকে রিসীভ্‌ করার জন্য সেখানে লোক থাকবে।"

গভীর রাত। ভাটিয়ারি রেল স্টেশনে সরোজ গুহ ট্রেন থেকে নামলেন। ভাবছেন কি করবেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমন সময় দেখতে পেলেন অদূরে আলোর সংকেত।

সরোজ গুহ সূচীভেদ্য অন্ধকারে টর্চের আলো লক্ষ্য করে পা বাড়ালেন সামনেই ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড। বেবি অস্টিন মোটর গাড়ি নিয়ে যিনি সরোজ গুহের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি হলেন অনন্ত সিংহের দাদা বিপ্লবী নন্দলাল সিংহ।

আগ্নেয়াস্ত্র মোটামুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এবার সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সামরিক ট্রেনিংয়ের মতো ট্রেনিং নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে অনন্ত সিংহ, রজত সেন ও মিহির বোসের বাড়িতে বন্দুকের লাইসেন্স আছে। এ তিনজনের বাড়িতেই নির্বাচিত সদস্যরা আগ্নেয়াস্ত্রের অনুশীলন করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সমুদ্রতীর ও গভীর জঙ্গল।

গভীর জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিপ্লবী নেতৃত্ব দায়িত্ব দিলেন সরোজ গুহের ওপর। সরোজের বড়দি চামেলি প্রভার স্বামী নরেন্দ্র দত্ত চট্টগ্রাম জেলার কুমিরার ফরেস্টার। সরোজ কুমিরা গেলেন।

সরোজ তাঁর জামাইবাবুকে বললেন, "জামাইবাবু, আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তোমার এখানে শিকার করতে আসবে। তাদের ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে শিকারে বের হবে।"

জামাইবাবু বললেন, 'ভালো কথা। তোমার বন্ধুদের নিয়ে আসবে। তাদের নিয়ে বেশ আনন্দ করা যাবে।"

জামাইবাবুর সম্মতি নিয়ে সরোজ ফিরে এলেন। নির্বাচিত বিপ্লবী সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য কুমিরা যাওয়ার দিন স্থির হলো।

নির্দিস্ট দিনে সরোজকে চারখানি বন্দুকের লাইসেন্স দিয়ে অনন্ত সিংহ বললেন, 'তুই বন্দুকের দোকান থেকে কার্তুজ কিনে কুমিরায় নিয়ে যাবি। তোর আগের ট্রেনে অন্য সদস্যরা কুমিরায় চলে যাবে।"

বন্দুকের দোকান থেকে কার্তুজ কিনে সরোজ চাটগাঁ-রেল স্টেশনের দিকে রওনা দিলেন। স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে দেখেন ট্রেন ধীর গতিতে চলতে শুরু করেছে। গাড়ি ধরার জন্য তিনি রেলিং টপকালেন। প্লাট্‌ফর্মে উঠলেন। প্রাণপণে ছুটলেন গাড়ির দিকে। গাড়ির শেষ কামরায় উঠতে যাবেন এমন সময় তিনজন টিকিট চেকার সরোজকে পাকড়াও করলেন।

সরোজের সার্টের তলায় কোমরে বাধা দেড়শ কার্তুজ। টিকিট চেকারেরা তাঁকে নিয়ে চলেছেন স্টেশন মাস্টারের ঘরে। কোন উচ্চবাচ্য নেই। যেন সুবোধ বালক। কিছুদূর যাওয়ার পর একজন টিকিট চেকারকে তলপেটে লাথি মারলেন আচমকা। দ্বিতীয় চেকারকে মারলেন নাকে ঘুষি। তৃতীয় চেকার দিলেন দৌড়।

সুযোগের অপচয় করলেন না সরোজ। দৌড়ে রেল-লাইন পার হয়ে মাঠে নামলেন। এ মাঠের নাম ধোপার মাঠ। এখানে ধোপারা কাপড় কাচে। কাপড় শুকোয়। সরোজ মাঠ পার হয়ে নালাপাড়ায় ঢুকলেন।

মিউনিসিপাল ইস্কুলের মাস্টার বীরেন চক্রবর্তী তাঁর বাড়ির দাওয়ায় বসে দাড়ি কাটছেন। তিনি বিপ্লবীদলের একজন সমর্থক। সরোজকে দেখেই বুঝলেন, কিছু একটা ঘটেছে। তিনি ঘটনা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ঘটনা শুনে, সরোজকে জীবন ঘোষালের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। সরোজ জীবন ঘোষালের বাড়ি গেলেন। সেখানে সরোজের সঙ্গে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দেখা হলো।

সরোজের ঘটনা শুনে অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষকে বললেন, "ইন্‌ডিভিডিউয়্যাল অ্যাকশনে সরোজকে পাঠালে তাকে কেউ ধরতে পারবে না।"

অনন্ত সিংহ সরোজকে সাইকেলে বাড়ি যেতে নির্দেশ দিলেন।

এদিকে জেলা আদালতে রেলস্টেশনের ঘটনার বিবরণ এবং অপরাধীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে অপরাধীকে ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার। কোর্টের নোটিস পড়ে সরোজের বাবা থ। এ যেন তাঁর ছেলে সরোজেরই চেহারার বর্ণনা।

সরোজের বাবা নন্দলাল গুহ চট্টগ্রাম কোর্টের উকিল। তিনি বাসায় ফিরে দেখেন, সরোজ বাড়িতে বহাল তবিয়তে আছেন!

সরোজের বাবা সরোজকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কুমিরা গেলে না?"

"শরীর খারাপ। আগামীকাল যাবো।" সরোজ জবাব দিলেন।

পরদিন খুব ভোরেই সরোজ কুমিরায় দিদির বাসায় পৌঁছলেন।

সোনা ঝরা সকাল। সূর্যরশ্মি বনভূমির পাতায় পাতায় রঙ ছড়াচ্ছে। পাখিরা আকাশে উড়ে চলেছে। সুন্দর পরিবেশ।

বারোজন বিপ্লবী দল বেঁধে শিকারে বের হলেন সঙ্গে সরোজের জামাইবাবু। বনজঙ্গল ঘুরে ঘুরে তারা কয়েকটি পাখি শিকার করলেন।

জামাইবাবুর ডিউটির সময় হয়ে এলো। শিকার করা হরিয়াল ও ঘুঘু পাখি কয়টি নিয়ে জামাইবাবু বাসায় ফিরে গেলেন। সরকারি অফিসের বন্দুক ও রাইফেল সরল মনে সঁপে দিয়ে এলেন শ্যালকদের হাতে।

বিপ্লবীদের সঙ্গে আছে পিস্তল ও রিভলবার। বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে বিপ্লবীরা গভীর জঙ্গলে মনের আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে টারগেট্ প্র্যাক্টিস করলেন। ট্রেনিংয়ের পদ্ধতি হলো—কাগজে আঁকা একটি বৃত্ত। বৃত্তটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপ্লবীরা দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাতে একের পর এক লক্ষ্যভেদ করতে লাগলেন।

জঙ্গলে আগ্নেয়াস্ত্র চালনার তালিম দিয়ে বিপ্লবীরা শহরে ফিরে এলেন। এবার আগ্নেয়াস্ত্র চালনার অনুশীলন চললো সমুদ্র সৈকতে।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মাত্র পনের কিলোমিটার। নির্জন সাগরের গর্জনের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের অনুশীলন বেশ সুবিধে। গুলির আওয়াজ দূরে শোনা যায় না। সাগরের গর্জনের সঙ্গে গুলির শব্দ মিলিয়ে যায়।

গণেশ ঘোষের নির্দেশে তিন জনের একটি দল আগ্নেয়াস্ত্র অনুশীলনের জন্য বঙ্গোসাগরের তীরে সাইকেলে রওনা দিলেন। দলটিকে পরিচালনা করছেন নরেশ রায়। বিপ্লবী তিন জনের নাম হলো—কালীকিংকর দে, বিনোদবিহারী দত্ত ও পুলিন ঘোষ।

সাগরতটে আগ্নেয়াস্ত্রের অনুশীলন চলাকালনীন নরেশ রায়ের সঙ্গে কালীকিঙ্কর দে-র মতানৈক্য দেখা দিলো।

নরেশ রায় কালীকিঙ্করকে পিস্তল চালনা শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, "পিস্তলের ট্রিগার টিপে ধরে থাকলে চেম্বারে যতো কার্তুজ থাকবে তা পর পর বের হয়ে যাবে।"

কালীকিঙ্কর বললেন, "গণেশদা আমাকে বলেছেন - পিস্তলের চেম্বারে টোটা ভরতি থাকলে যতোবার ট্রিগার টিপবো ততোবার ফায়ারিং হবে।

সমুদ্র সৈকত থেকে সন্ধ্যের পর বিপ্লবীরা শহরে ফিরে এলেন। নরেশ রায় নিজের বাসায় চলে গেলেন। কালীকিঙ্কর দে, বিনোদ দত্ত এবং পুলিন ঘোষ এসে গণেশ ঘোষের বাসায় ঢুকলেন।

কালীকিঙ্কর দে গণেশ ঘোষকে বললেন, "গণেশদা, শুনুন,। নরেশদা বলেছেন—পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে থাকলে একটানা ফায়ারিং হবে। তা কি সত্যি?"

জবাবে গণেশ ঘোষ বিস্ময়ান্বিত হয়ে বললেন, "তা কী করে হয়।"
গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকানের সঙ্গে তাঁদের লাগোয়া বাসা। বাসায় গণেশ ঘোষের মা খাটের ওপর বসে আছেন। কালীকিঙ্কর দে ও গণেশ ঘোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে। এমন সময় কালীকিঙ্কর আচমকা পিস্তলের ট্রিগারে টিপ দিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি গণেশ ঘোষের কপালের পাশ দিয়ে ওড়ে গিয়ে ঘরের দেওয়ালে আছড়ে পড়লো। ঘরের মধ্যে হলো বিকট আওয়াজ। গুলির ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে গণেশ ঘোষের মা মর্মভেদী চিৎকার করে উঠলেন।
গণেশ ঘোষের কপালে গুলির জোর ছেঁকা লেগেছে। দেওয়ালের কিছু অংশ ক্ষতবিক্ষত। গণেশ ঘোষ ধীর স্থির। নির্বিকার। যেন কিছুই ঘটেনি।
খুব শান্তভাবে গণেশ ঘোষ তাঁর সহকর্মীদের বললেন, "বিনোদ, তুমি পিস্তল ও রিভলবার গুলি নিয়ে এখুনি চলে যাও। কালী, পুলিন তোমরা তো ইস্কুল-বোর্ডিংয়ে থাকো? তোমরা চলে যাও সেখানে।"
কালী দে ভেবে ছিলেন পিস্তলের চেম্বার ফাঁকা। কার্তুজ নেই। তাই তিনি পিস্তল ছোঁড়ার কৌশল দেখাতে গিয়ে এ অঘটন ঘটাতে যাচ্ছিলেন। অল্পের জন্য গণেশ ঘোষ রক্ষা পেলেন।
গুলির আঘাতে দেওয়ালে পলস্তরার কিছুটা অংশ বিশ্রীভাবে চটে গেছে। পুলিশ আসার আশঙ্কায় গণেশ ঘোষ দেওয়ালের ক্ষতস্থানে একখানি ক্যালেণ্ডার টাঙ্গিয়ে দিলেন।
একদিন গণেশ ঘোষ হাসতে হাসতে কালীকে বললেন, "তোমার গুলিতে সেদিন যদি আমি মরে যেতাম তা হলে দলের সদস্যরা তোমাকেও মেরে ফেলতো।"
কালীকিঙ্কর নিরুত্তর। এ অপরাধের জন্য কালীকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয় নি। বিপ্লবী নেতৃত্ব বুঝেছিলেন, কালী একজন খাঁটি বিপ্লবী।
এ ঘটনার এক বছর পরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
কালীর সহপাঠী ও বন্ধু নিত্যগোপাল চৌধুরী। তিনিও বিপ্লবীদলের একজন সদস্য। নিশুতি রাত। আকাশ তারায় তারায় খচিত। গ্রামের এক পুকুরের পাড়ে বসে আছেন দু বন্ধু, নিত্য চৌধুরীর হাতে একটি রিভলবার। রিভলবারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। ভাবলেন, রিভলবারের চেম্বার খালি।
কি খেয়াল হলো—নিত্য চৌধুরী তাঁর কপালে রিভলবার লাগিয়ে কালীকে বললেন, "কালী, এভাবে গুলি চালালে কেমন হয়? নিশ্চিত মৃত্যু। কি বলিস?"
কথাটা শেষ হতে না হতেই নিত্য চৌধুরী তাঁর কপালের ওপর ধরে রাখা রিভলবারের ট্রিগারে টিপ দিতে যাবেন, এমন সময় কালীকিঙ্কর এক থাবা মেরে রিভলবারটা মাটিতে ফেলে দিলেন। দেখা গেলো—রিভলবারে একটা কার্তুজ রয়েছে। কী নিদারুণ ঘটনাই না ঘটতে যাচ্ছিল। সেদিন ভুলবশতঃ গণেশ ঘোষকে গুলিতে জখম করার অভিজ্ঞতাই কালী তাঁর বন্ধু নিত্য চৌধুরীকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেন।

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্বে মাস্টারদা যাঁদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁরা কিভাবে কাজ করছেন, তা দশ-বারো দিন পর পরই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে লাগলেন।

মাস্টারদা একদিন বিপ্লবী যুব-নেতাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সেই আলোচনা সভায় সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য মোটামুটি একটি দিন স্থির করেন। কিছু-দিন পর কাজের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য ফের মিটিংয়ে বসলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো—১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রস্তুতি মহাযজ্ঞের খরচ সামলাতে বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারের অবস্থা কাহিল। তখন অর্থ সংগ্রহের নির্দেশ শহরের সীমা ছাড়িয়ে গ্রাম সংগঠনের বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

গ্রাম সংগঠনের বিপ্লবী সভ্য নির্মলচন্দ্র দত্ত। ১৯২৯ সালে তিনি বিপ্লবীদলের সদস্য হন। সম্পর্কে মাস্টারদার শ্যালক তিনি। মাস্টারদার স্ত্রী পুষ্পকুন্তলার খুড়তুতো ভাই। (বর্তমান 'বিপ্লব তীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা'-র যুগ্ম-সম্পাদক।)

১৯১৬ সালের ৫ নভেম্বর নির্মলচন্দ্র দত্তের জন্ম। বাবার নাম—রাজকুমার দত্ত। মায়ের নাম—কুসুমকুমারি। গ্রাম—কানুনগো পাড়া। থানা—বোয়ালখালি। চট্টগ্রাম।

দলীয় নির্দেশে নির্মল দত্ত মায়ের প্রায় পনরো তোলা সোনা সিন্দুক খুলে বের করে নিলেন। তারপর সিন্দুকে তালা দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর তাঁর মা সিন্দুক খুলে দেখেন সিন্দুক ফাঁকা। বাড়ির সকলের সন্দেহ হলো—নির্মলের দাদা বার্মা যাওয়ার সময় সোনাদানা নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। নির্মল সন্দেহ মুক্ত।

বিপ্লবীদলে ধনী, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে যেমন আছেন তেমনি দরিদ্র পরিবারের সন্তানও আছেন। সে-রকম দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেন বীরেন্দ্র চন্দ্র দে।

বীরেন দের বাবার নাম চন্দ্রনাথ দে। চট্টগ্রাম জেলার সুচিয়া গ্রামে বাড়ি। পেশা—ঘরামি। থাকেন চট্টগ্রাম শহরে ফিরিঙ্গীবাজার। ঘরামির কাজ করে তিনি অতিকষ্টে সংসার চালান। এতো কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর ছেলে বীরেনকে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছেন। বীরেন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আর দশজন বাবা-মায়ের মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেন। ছেলে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হলে তাঁর দুঃখের রাত একদিন না একদিন ভোর হবে।

চন্দ্রনাথ দে যখন মধুর স্বপ্নে বিভোর তখন বীরেন মাস্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছেন। বিপ্লবী সদস্যরা নিজ নিজ বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে নেমে পড়েছেন। তা দেখে অধীর হয়ে উঠলেন বীরেন।

একদিন বীরেন তাঁর মায়ের বাক্স থেকে এক জোড়া রূপোর বালা নিয়ে কাগজে মুড়ে নিলেন। মোড়কটি বড়ই সংকোচের সাথে মাস্টারদার হাতে তুলে দিলেন। মাস্টারদা জানেন বীরেন অতি দীন পরিবারের সন্তান। আদর্শ ছেলে। সস্নেহে বীরেনকে পাশে বসালেন তিনি। আলাপ জুড়ে দিলেন।

এক সময় বীরেনের দেওয়া মোড়কটি খুলে মাস্টারদা জিজ্ঞেস করলেন, "এ বালা দুটি কোথা থেকে পেয়েছো?"

বীরেন বিনীতভাবে বললেন, "আমার মায়ের বাক্স থেকে এনেছি। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে তাঁদের মায়ের সোনার গয়না এনে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি গরিব।

আমাদের বাড়িতে সোনাদানা বলতে কিছুই নেই। আপনি দয়া করে মায়ের বালা দুটি গ্রহণ করুন।"

কথাগুলি বলতে বলতে বীরেনের দুটি চোখ আবেগে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আবেগঘন মুহূর্তে মাস্টারদা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাস্টারদার বুকে মুখ লুকালেন বীরেন। তাঁর অন্তরের বেদনা কান্নার রূপ নিয়ে বের হয়ে এলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। মাস্টারদার চোখেও জল গড়িয়ে পড়লো। দুটি নদী যেন একই ধারায় মিলিত হলো। এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

মাস্টারদা বললেন, "ভাই বীরেন, বালা দুটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এগুলি তোমার মায়ের শেষ সম্বল। দানের পরিমাণ দিয়ে এর মূল্যায়ন হবে না। তোমার হৃদয়-সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। মুগ্ধ।"

এক কথায় বলা যায়—সব সদস্যই বিপ্লবী অর্থ-ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে টাকা অথবা সোনাদানা দান করেছেন।

সুচিয়া গ্রামের বীর সন্তান বীরেন দে। সুচিয়া গ্রামের বিপ্লবী সংগঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রামের পাশের গ্রাম বরমা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাড়ি বরমা।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জ্ঞাতি ভাইপো হলেন কল্পতরু সেনগুপ্ত। ছোটবেলা থেকে রাজনৈতিক পরিবেশেই তিনি মানুষ। কল্পতরু সেনগুপ্তের বাবার নাম সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সতীশচন্দ্র আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানিতে কাজ করেন। কর্মস্থল চট্টগ্রাম। কোম্পানির কোয়ার্টারে চট্টগ্রাম শহরে সপরিবারে থাকেন।

গণেশ ঘোষের বাবা বিপিন ঘোষ চট্টগ্রাম শহরের ডবলমুড়িং সিনিয়র স্টেশন মাস্টার। তিনিও সপরিবারে রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন। সেনগুপ্ত পরিবারের কাছাকাছি তাঁদের বাসা। প্রতিবেশী হিসেবে ছোটবেলা থেকে কল্পতরু সেনগুপ্ত গণেশ ঘোষকে দেখেছেন। শৈশবের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে গণেশ ঘোষের স্বদেশপ্রেমকে তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। গণেশ ঘোষের বাল্যবন্ধু অনন্ত সিংহকেও তিনি ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। তখন থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী দুই যুব-নেতাকে তাঁর হৃদয় রাজ্যে বীরের আসনে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে কল্পতরু সেনগুপ্তের বাবা যোগ দেন। গণেশ ঘোষের বাবার নেতৃত্বে যাঁরা আর কাজে ফিরে গেলেন না কল্পতরুর বাবা তাঁদের অন্যতম। ফলে দারিদ্রের করালরূপ, সেনগুপ্ত পরিবারকে গ্রাস করতে চলেছে।

১৯২৮ সাল। কল্পতরু সেনগুপ্ত চট্টগ্রামে বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এলেন।

সতীশচন্দ্র সংসারকে রক্ষা করার জন্য চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরলেন। অনেকদিন পর নোয়াখালি জেলার ফেণীতে চাকরিতে যোগদান করলেন।

কল্পতরু ফেণী ইস্কুলে ভর্তি হলেন। প্রায় তিন বছর পর তাঁর বাবা ফেণী থেকে বদলি হয়ে যান। ইস্কুল হোস্টেলে চলে গেলেন তিনি। বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগের

অপরাধে তাঁকে ইস্কুল থেকে বাধ্যতামূলক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে তাড়িয়ে দেন।
ফেণী ইস্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কল্পতরুর কর্মের পরিধি গেলো বেড়ে। তারপর নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন ইস্কুলে ভরতি হয়ে তিনি দলের সদস্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।
১৯৩৩ সাল। কল্পতরু সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। অল্প দিনের মধ্যে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়ে চট্টগ্রাম চলে এলেন। ১৯৩৫ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বিনাবিচারে বন্দী হলেন। চট্টগ্রাম ও বহরমপুর বন্দী-নিবাসে তাঁর প্রায় চার বছর কেটে গেলো। ১৯৩৮ সালে শর্তাধীনে মুক্তি পেলেন।
মুক্তি পেয়ে কল্পতরু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন এবং আসামে পাড়ি জমালেন। সেখানে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ সরকার তাঁকে আসাম থেকে বের করে দেন। তিনি চট্টগ্রাম চলে এলেন। ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো। বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো।
পরের অধ্যায়ে, মুক্তি পেয়ে তিনি আত্মগোপন করে শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। জীবনের পথ পরিক্রমায় এক এক সোপান পার হয়ে তিনি লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চললেন।
রাজনৈতিক জীবনের চলার পথে কল্পতরুর জীবনসঙ্গিনী তাঁর স্বামীর আদর্শে পূর্ণ মদত দিলেন।
ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্থানে ঘটলো ভাষা আন্দোলন। কল্পতরুর স্ত্রী শ্রীমতী রীণা সেনগুপ্ত বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। এবং দু'বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।
কল্পতরুও তাঁর স্ত্রী চিকিৎসার জন্য কলকাতা চলে এলেন। সুস্থ হয়ে সাংবাদিকতা গ্রহণ করলেন তিনি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বাধীনতা', 'বসুমতী', সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ', দৈনিক 'সত্যযুগ' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। সরকারী ও বে-সরকারী কয়েকটি সংগঠন ও উপদেষ্টা পর্যদের তিনি পদাধিকারী ও সদস্য।

এই তো গেলো সুচিয়া ও বরমা গ্রামের দুজন বিপ্লবীর কথা। কিন্তু চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ প্রস্তুতিপর্বের কতদূর?
বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করলেন কিছু সদস্যকে মোটরগাড়ি চালনা শিক্ষা দিতে হবে। সভ্যদের মধ্য থেকে পঁচিশজনকে বাছাই করা হলো। উদ্দেশ্য—যুব-অভ্যুত্থানে আক্রমণের কাজে মোটর চালকের প্রয়োজন হবে।
ট্রেনিং চললো। পঁচিশজন গাড়ি চালকের মধ্য থেকে আবার বারোজনকে দেওয়া হলো বিশেষ শিক্ষা। কেবলমাত্র গাড়ি চালনা জানলেই এ'দের চলবে না। কেননা আক্রমণ রচনায় যে সব অসুবিধের সম্মুখীন হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে একশ'টি উপদেশ সম্বলিত এ শিক্ষা পদ্ধতি। যেমন—মোটরগাড়ি চালক নিজে আহত হলে কি করণীয়?

শত্রু গাড়ি পিছু তাড়া করলে কি কি করণীয় ? শত্রুর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবেন কি করে ? মোটর গাড়ির আড়াল থেকে লড়াই করবেন কি করে ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্ব যখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তখন পুলিশের তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে গেলো। এ সময় দলের নেতৃস্থানীয় কেউ ধরা পড়ে গেলে যুব-বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী নেতৃত্ব পুলিশ অফিসার ও গোয়েন্দাদের ওপর বিশেষ নজর রাখার জন্য পালটা একটি গোপন সংগঠন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পালটা-গোয়েন্দাগিরি সংগঠনটি গড়ে তোলা ও পরিচালনার ভার পড়লো নরেশ রায়ের ওপর।

গোপন সংগঠনটির দায়িত্ব হলো—রাতদিন শহরের কোতোয়ালি থানা, দু-তিনটা পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর বাংলো, গোয়েন্দা (D. I. B.) ইন্সপেক্টার এবং দুজন গোয়েন্দা সাব-ইন্সপেক্টারের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। নির্বাচিত সদস্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল, থানায় আকস্মিক পুলিশ সমাবেশ অথবা পুলিশের গতিবিধি সন্দেহজনক হলে তাঁরা যেন তখনই বিপ্লবী হেডকোয়ার্টারস-এ খবর পাঠান। তারজন্য সাইকেল ও টেলিফোনের ব্যবস্থা রয়েছে।

চট্টগ্রাম Armoury Raid Case-এর রায়ে জজসাহেব লিখেছেন (পৃঃ ৮) ঃ

"...It was noticed also that youths were deputed to watch the houses of the D. I. B. officers and note their movements—by way of counter espionage."

এখানে প্রশ্ন জাগে, কি নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে এ ধরনের পালটা-গোয়েন্দাগিরির চিন্তা বিপ্লবীদের মাথায় এলো। বিপ্লবীদের ওপর পুলিশের তৎপরতা কী এই প্রথম ? সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

১৯২৮ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত ছ'জন বিপ্লবী নেতার ওপর প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখার জন্য পুলিশের ডি. আই. বি. বিভাগের ওপর ভার পড়লো। এ ছ'জন বিপ্লবী নেতাদের নজর রাখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো—একজন ইন্সপেক্টর, চারজন সাব-ইন্সপেক্টর ও ছ'জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের ওপর।

এই ছ'জন বিপ্লবী নেতা হলেন—সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন ও চারুবিকাশ দত্ত।

১৯২৯ সাল। নভেম্বর মাস। বিপ্লবী নেতাদের ওপর পুলিশের পাহারা আরো জোরদার করার জন্য কলকাতার কেন্দ্রীয় অফিস থেকে নির্দেশ এলো। চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষের আদেশে পুনর্বার চব্বিশজন পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত হলো।

ছ'জন বিপ্লবী নেতার পেছনে এগারোজন গোয়েন্দা ও চব্বিশজন পুলিশ নিয়োগ করা হলো। মোট পঁয়ত্রিশজন। দিনের বেলা প্রত্যেক পুলিশ একা একা বিপ্লবী নেতাদের গতিবিধি অনুসরণ করতে লাগলো। রাতে দু'জন করে পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত থাকলো।

পুলিশ এঁটুলির মতো দিনরাত নেতাদের পিছনে লেগে আছে। তারা নেতাদের বন্দী করার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছে ; নেতারা বুদ্ধির চালে পুলিশের উদ্দেশ্যকে বানচাল

করে চলেছেন।

১৯৩০ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মাত্র দু মাস বাকি। এরই মধ্যে বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট সদস্য একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসলেন। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বিজ্ঞানের ছাত্র। চট্টগ্রাম শহরে সরকারি কলেজে পড়েন। মেধাবী ছাত্র। শহরের পাথরঘাটা অঞ্চলে তাঁর ভগিনীপতির কাছে থাকেন।

রামকৃষ্ণ বিস্ফোরক তৈরি করতে জানেন। বোমার জন্য 'ক্যাপ' (percussion cap) তৈরির ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছে। percussion cap-এ সামান্য আঘাত লাগলেই জ্বলে উঠে।

বিপ্লবীদের কাছে কাজই হলো পূজা। রামকৃষ্ণ বোমার ক্যাপ বানানোর কাজে লেগে গেলেন। একদিন তিনি কলেজে গেলেন না। দুপুরে ভগিনীপতির বাসায় বসে 'ক্যাপ' তৈরি করছেন। এমন সময় এক প্রকাণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলো। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। রামকৃষ্ণের বুক, মুখ ও হাত পুড়ে গিয়ে বীভৎস অবস্থা। এ খবর পেয়ে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ি করে রামকৃষ্ণকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেললেন। তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

রামকৃষ্ণের ভগিনীপতি সরকারি চাকুরে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর রামকৃষ্ণের দুর্ঘটনার কথা তিনি জানতে পারলেন। চাকরির ক্ষতির আশঙ্কায় রামকৃষ্ণের ভগিনীপতি তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন। সেদিন থেকে পুলিশ হন্যে হয়ে রামকৃষ্ণকে খুঁজছে। শহর ও গ্রামে অনেক বাড়ি খানাতল্লাসী করেও পুলিশ রামকৃষ্ণের হদিস পেলো না।

পুলিশের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য সদর কোতোয়ালি থেকে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও বিধু ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালো।

বিপ্লবীরা ভাবলেন, তাঁদের থানায় ডেকে পাঠানোর পেছনে কী অভিসন্ধি থাকতে পারে? রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ? না, বন্দী করা?

যুব-বিদ্রোহের বাকি মাত্র দু সপ্তাহ। বিপ্লবীরা আলোচনায় বসলেন। থানায় হাজিরা না দিলে তাঁদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হতে পারে। থানায় গেলে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়েও দিতে পারে। বন্দীও করতে পারে। এ মতো পরিস্থিতিতে ভালোমানুষ সেজে তাঁরা থানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এও স্থির হলো – পুলিশ যদি তাঁদের থানায় বন্দী করবার জন্য এগিয়ে আসে তা হলে চারটি রিভলবার এক সঙ্গে গর্জে উঠবে। আকস্মিক আক্রমণে থানার পুলিশদের হতভম্ব করে দিয়ে থানা থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবেন তাঁরা।

৫ এপ্রিল। ১৯৩০ সাল। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও বিধু ভট্টাচার্য থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন নরেশ রায় ও লোকনাথ বল। মোট পাঁচজন বিপ্লবীর মধ্যে চারজনের কোমরে গোঁজা চার-চারটি রিভলবার।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে গণেশ ঘোষ স্বীকার করলেন, তিনি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে চেনেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ এখন কোথায় এবং কি ঘটেছে এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। অনন্ত

সিংহ বেমালুম বলে দিলেন তিনি রামকৃষ্ণকে আদৌ চেনেন না।
থানা থেকে বের হয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও নরেশ রায় সোজা ডি. আই. বি ইন্সপেক্টর সারদা ভট্টাচার্যের বাড়ি গেলেন। থানায় ডেকে তাঁদের নাকাল করার জন্য সারদা ভট্টাচার্যের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের দুর্ঘটনার জের চলছে। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের ছাত্র তারকেশ্বর দস্তিদারকে বোমার জন্য পিকরিক পাউডার তৈরির ভার দেওয়া হলো। যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বে বোমা তৈরির একটি প্রধান কাজ এখনো বাকি। বিপ্লবীদের কাছে বোমার সতেরোটি লোহার খালি খোল জমা আছে। অল্প সময়ের মধ্যে বোমা তৈরির কাজ শেষ করতেই হবে।
তারকেশ্বর চট্টগ্রাম শহরে সরকারি কলেজে বি. এস-সি. ফোর্থ ঈয়ারে পড়েন। বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রাম। বাবার নাম চন্দ্রমোহন দস্তিদার। মায়ের নাম প্রমীলা।
১৯৩০ সাল। মার্চ মাসের মাঝামাঝি। দুপুর বেলা। চট্টগ্রাম শহরের কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত আছেন—মাস্টারদা, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, অর্ধেন্দু দস্তিদার, বনবিহারী দত্ত ও আরো কয়েকজন বিপ্লবী সদস্য। তারকেশ্বর কংগ্রেস অফিসের একটি ঘরে বসে পিকরিক পাউডার তৈরী করছেন। তারকেশ্বরকে সাহায্য করছেন নির্মল সেন ও অর্ধেন্দু দস্তিদার।
কথায় বলে, বিপদ একা আসে না। তারকেশ্বর পিকরিক পাউডার তৈরি করার সময় প্রচণ্ড শব্দে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে গেলো। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। তারকেশ্বর দস্তিদার, নির্মল সেন ও অর্ধেন্দু দস্তিদার আহত। তারকেশ্বরের অবস্থা গুরুতর। শরীরের কোথাও কোথাও মাংস উড়ে গেছে। হাড় বের হয়ে পড়েছে। অর্ধেন্দুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। দুজনই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তারকেশ্বরের বাঁচার আশা কম।
মাস্টারদা সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সিংহকে খবর পাঠালেন। খবর পেয়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ছুটে এলেন। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দুর শরীরের বীভৎস অবস্থা দেখে তাঁরা আঁৎকে উঠলেন। এ কী দৃশ্য!
অনন্ত সিংহকে দেখে তারকেশ্বর বললেন, "অনন্তদা, আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। আপনি গুলি করে আমাকে মুক্তি দিন।"
তারকেশ্বরের যন্ত্রণা কাতর মিনতিতে অনন্ত সিংহ বিচলিত। পরামর্শের জন্য মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ পাশের কামরায় চলে এলেন।
মাস্টারদা ও গণেশ ঘোষকে উদ্দেশ্য করে অনন্ত সিংহ বললেন, "দেরি না করে, তারককে গুলি করে মেরে ফেলি!"
অনন্ত সিংহের বক্তব্য শুনে গণেশ ঘোষ তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললেন, "কেন বাজে কথা বলছো? ঘাবড়াবার কি আছে? বিপদ এসেছে, বিপদকে বুঝতে হবে।"
অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য মাস্টারদা কয়েকজন বিপ্লবী সদস্যকে কংগ্রেস অফিসের সামনের ছোট লনে, গানের আসর বসিয়ে দিলেন। গানের আসর জমে উঠেছে। এই ফাঁকে অনন্ত সিংহ বিপ্লবী সদস্য জীবন ঘোষালের বড় মোটর গাড়ির মধ্যে

তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দুকে তুলে নিলেন। তারপর আহতদের নিয়ে অনন্ত সিংহ শহরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি করে ঘুরতে লাগলেন।

আহতদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন। গণেশ ঘোষ ডাক্তারের ব্যবস্থা করার জন্য বের হয়ে পড়লেন। রাত দশটায় আহতদের আশ্রয়ের জন্য বাড়ি পাওয়ার খবর এলো। রাত সাড়ে দশটায় অনন্ত সিংহ আহতদের নিয়ে লোকনাথ বলের শহরের বাসায় গেলেন। আহত বিপ্লবীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। প্রাথমিক চিকিৎসার পর সে রাতেই তাঁদের অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হলো।

শহরে কিছুদিন চিকিৎসার পর তারকেশ্বরের জীবন রক্ষা পেলো। অর্ধেন্দুও আরোগ্যের পথে। কিন্তু ঘা কারো শুকোয়নি। তারকেশ্বরকে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। এ গুরুদায়িত্বের ভার পড়লো শ্রীপুর গ্রামের মণীন্দ্র মজুমদারের ওপর।

একদিন সন্ধ্যায় সাম্পানে করে মণীন্দ্র মজুমদার পৌঁছলেন চট্টগ্রাম শহরের নদীর ঘাটে। তাঁর সঙ্গে আছেন ধোরলা গ্রামের সুশীল দে।

আহত তারকেশ্বরকে দেখে সাম্পানের মাঝির সন্দেহ হয়। তাই সে বার বার তামাক খাচ্ছে। বেগতিক বুঝে মণীন্দ্র মজুমদার নিজেই সাম্পানের দাঁড় টানতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সাম্পান শহরের সীমানা ছেড়ে চলে গেলো।

মণীন্দ্র মজুমদার কোয়েপাড়া গ্রামের বিনয় সেনের বাড়িতে তারকেশ্বরকে নিয়ে হাজির হলেন। তারকেশ্বর বিনয় সেনের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। কয়েকদিন পর মণীন্দ্র মজুমদার তারকেশ্বরকে তাঁর বাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় তারকেশ্বর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিপ্লবীরা তাঁদের লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগলেন। এদিকে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আঁচ করলেন, বিপ্লবীরা সাংঘাতিক কিছু ঘটাতে চলেছেন। বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য ইংরেজ সরকার চট্টগ্রাম শহরে বিপ্লবীদের ওপর পাহারা আরো জোরদার করলেন।

বিপ্লবীরা দমে যাওয়ার পাত্র নন। যে কোন মূল্যে হাত-বোমা তৈরি করতেই হবে। বিপ্লবীদের কাছে এর মূল্য সীমাহীন। বোমা তৈরির তদারকের দায়িত্বে আছেন গণেশ ঘোষ। বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রদের দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যাদির কাজ চালাতে গিয়ে, পর পর দুটো দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন। ফলে দলের অন্য কোন সদস্যকে দিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যের কাজ করাতে, গণেশ ঘোষ আর সাহস পেলেন না।

সমস্যা সমাধানের জন্য এবার আসরে নামলেন স্বয়ং গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। হাত-বোমা তৈরির কাজ চললো আনন্দ গুপ্তের পড়ার ঘরে। আনন্দের বাড়িটি হলো — শহরের একটি টিলার ওপর, নির্জন স্থানে। পড়ার ঘরটি দেখলে মনে হয়, ছোটখাটো একটি ল্যাবরেটরি। খুবই সাবধানতা অবলম্বন করে, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বোমা তৈরি করতে তারা সক্ষম হলেন। বোমার সমস্যা সমাধান হলো। কিন্তু পুলিশ ?

পুলিশ বার বার বিপ্লবীদের চালে পরাস্ত হয়ে, মরিয়া হয়ে উঠলো। এবার পুলিশ অন্য রাস্তা ধরলো। যুবশক্তিই হলো, বিপ্লবীদের একমাত্র পুঁজি। তাই পুলিশ কোমর বেঁধে নেমে পড়লো বিপ্লবীদের শক্তির উৎস সন্ধানে।

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বের প্রায় ছ মাস আগে থেকে, প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী সদস্যরা অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন। রাতে বাড়ি থাকেন না। বাড়ির টাকা চুরির ব্যাপারেও সন্দেহ মুক্ত নন। অভিভাবকেরা অতিষ্ঠ।

পুলিশ এর সুযোগ নিলো। পুলিশ অভিভাবকদের জানালো, তাঁদের ছেলেরা বিপ্লবী নেতাদের পিছু পিছু ঘুরে একেবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। নেতাদের প্রভাব থেকে ছেলেদের দূরে সরিয়ে রাখতে তাঁরা যেন চেষ্টা করেন। নতুবা ছেলেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বিপ্লবী নেতারাও পুলিশকে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন। নেতাদের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ প্রতিবাদ জানাতে গেলেন, ডি. আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর সারদা ভট্টাচার্যের বাড়ি। তাঁদের সঙ্গে গেলেন জীবন ঘোষাল ও বিধু ভট্টাচার্য।

নেতাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখে সারদা ভট্টাচার্য আতঙ্কিত। অনন্ত সিংহকে সাবইন্‌স্পেক্টর প্রফুল্ল রায় হাওড়ায় গ্রেপ্তার করেছিলেন। তাই প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করা হয়েছিল।

বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশী চক্রান্তের ফল হলো সুদূরপ্রসারী। চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট শরীর-চর্চা ক্লাবটি বিপ্লবীদের সদস্য সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। এ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হলেন—সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। গণেশ ঘোষ সম্পাদক।

সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টগ্রাম শহরের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। সভাপতি মহাশয় অনেক অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছেন—তাঁদের ছেলেরা ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। বাপ-মায়ের অবাধ্য হয়েছে। রাতে বাড়ি থাকে না। এ সবের জন্য অভিভাবকেরা সরাসরি তাঁকে দায়ী করেছেন। এ সমস্ত নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। তাই সভাপতি মহাশয় ক্লাবের সম্পাদককে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালেন—তাড়াতাড়ি সাধারণ সভা ডাকার। প্রয়োজনে তিনি পদত্যাগ করবেন।

শরীরচর্চা ক্লাবের সভাপতির পদত্যাগের লিখিত হুমকি পেয়ে বিপ্লবী নেতাদের মাথাঘুরে গেলো। এ যেন মেরুদণ্ডের ওপর আচমকা সজোরে আঘাত। বিপ্লবী নেতারা এক চরম প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি। যে কোন সময় মহাযজ্ঞ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। মুহূর্তে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে চলে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আর দেরি করা মোটেই উচিত নয়। গত ডিসেম্বরে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার দিন স্থির হয়েছিল। ডিসেম্বর গড়িয়ে মার্চ এলো। মার্চ মাসের মাঝামাঝি যুব-বিদ্রোহ ঘোষণার দিন স্থির হয়। সেই ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিনটি হলো—১৮ এপ্রিল ১৯৩০ সাল। শুক্রবার। সময়—রাত ৮ টা।

পুলিশী চক্রান্তের ফল ফলতে শুরু করলো।

৮ এপ্রিল, ১৯৩০ সাল। বিপ্লবী সদস্য ফকির সেনের বাবা মাধব সেন তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে অভিযোগ করেন। এবং ফকির সেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করেন। অপরাধ – ফকির সেন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন, বাড়ির টাকা চুরি করেছেন, বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছেন

ইত্যাদি।

বিপ্লবীরা সমস্যার সাগরে ভাসছেন। এমন সময় গণেশ ঘোষ তাঁর একজন সহপাঠীর কাছ থেকে জানতে পারলেন, পুলিশ বিপ্লবীদলের একজনকে হাত করেছে। সহপাঠী বন্ধুটি সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের এ্যাসিসট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার।

সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিপ্লবী সদস্যটি যেসব জায়গায় ডি এস. পি-র সঙ্গে গোপনে মিলিত হন, সেই সব স্থানে গিয়ে দূর থেকে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ লক্ষ্য করলেন। কংগ্রেস অফিসের কাছেই সদস্যটির বাসা। মাস্টারদার সঙ্গে যুবকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যুবকটির প্রকৃত চরিত্র আবিষ্কার করার পর গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ মাস্টারদাকে ঘটনাটা বললেন। এবং যুবকটির সঙ্গে তাঁরা গভীর ভালোবাসার অভিনয় করলেন।

এই ঘটনাটা ঘটে যুব-বিদ্রোহের মাত্র এক সপ্তাহ আগে। এই খবরটি যথাসময়ে না পেলে যুব-বিদ্রোহের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যেতো।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বের কাজ প্রায় শেষ। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ভারত ব্যাপী লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। ভারতের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া দিলেন। আন্দোলনের তরঙ্গে ভারতবর্ষ উত্তাল।

গান্ধীজী দেখলেন, ইংরেজ সরকারের তৈরি ভারতের পক্ষে অমর্যাদাকর ও অপমানকর অনেক আইনের মধ্যে লবণ-আইন সবচেয়ে জঘন্য। ভারতের তিনদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি হয়। সেই লবণ তৈরির অধিকার ভারতবাসীর নেই। লবণ উৎপাদন ভারতবাসীর পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ। লবণ ব্যবসা ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া অধিকার। অথচ লবণ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নিত্য ব্যবহার্য বস্তু।

১২ মার্চ, ১৯৩০ সাল। গান্ধাজী ৭৮ জন সত্যাগ্রহী সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে হেঁটে ডাণ্ডী অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। ৫ এপ্রিল। গান্ধীজী সদলবলে গুজরাট প্রদেশের ডাণ্ডী সমুদ্র উপকূলে পৌঁছলেন। দীর্ঘ পথ। প্রায় দু'শ মাইল।

৬ এপ্রিল। গান্ধীজী ডাণ্ডীর সমুদ্রে স্নান সারলেন। তারপর মাটি থেকে এক মুঠো লবণ হাতে নিয়ে ইংরেজ সরকারের অবিবেচনা প্রসূত লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। এ সংবাদ ভারতের সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। ফলে ভারতের দিকে দিকে আইন অমান্যের জোয়ার বয়ে গেলো। পুলিশী নির্যাতনও চললো সমান তালে।

এ সময় চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিপ্লবীদলের হাতে। মাস্টারদা উপলব্ধি করলেন, গান্ধীজী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে সারা ভারতের জনগণের মনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে। জনজাগরণের সন্ধিক্ষণে ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করার এই তো প্রকৃষ্ট সময়।

যুব-বিদ্রোহের পাঁচ দিন মাত্র বাকি। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস অফিসে কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা বসলো। সভায় উপস্থিত রয়েছেন—মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। তাঁদের সামনে খোলা আছে—Mobilisation Chart (সৈন্য ও শক্তি সমাবেশের নক্সা)। এ নক্সাটি গণেশ ঘোষ সযত্নে তৈরি করেছেন। নক্সাটিতে বিপ্লবীদের বুঝবার মতো সংক্ষেপে শিরোনাম, আদেশ ও উপদেশ দেওয়া আছে।

আরো লেখা রয়েছে—ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোন দল কোন পথ দিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গোপনে অবস্থান করবেন, কাঁধে ঝুলানো থলিতে বিপ্লবীরা কি কি জিনিস সঙ্গে নেবেন, কোন সভ্য কোন বন্দুক নেবেন ইত্যাদি। বিপ্লবী সৈনিকদের সঙ্গে থাকবে জলের পাত্র, টর্চ, খুব বড় হাতুড়ি, ছেনি, ব্যাণ্ডেজ, বোমা আরো কতো কি।
যুব-বিদ্রোহ পরিকল্পনাটি বাস্তবে এরূপ ঃ

(১) পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ।
(২) অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণ।
(৩) টেলিফোন ভবন আক্রমণ।
(৪) ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।
(৫) চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।
(৬) বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা।

অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরে চট্টগ্রাম জেলা। চট্টগ্রাম প্রকৃতির লীলাভূমি। পাহাড় আর সাগরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের মধ্যে চট্টগ্রামের অধিবাসীরা লালিত-পালিত। লোকেরা সাহসী ও পরিশ্রমী। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে চট্টগ্রান একটি দুর্জয় ঘাঁটি।
লুসাই পাহাড়ের একটি শাখা চট্টগ্রাম জেলার উত্তর দিকে ঢুকে সোজা দক্ষিণ প্রান্তে চলে গেছে। চট্টগ্রামের উত্তরে ত্রিপুরা রাজ্য। দক্ষিণে বার্মা। পাহাড়টি বার্মার আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ছাড়া ছোট বড় অনেক পাহাড় চট্টগ্রামের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য নদী-নালা। জেলার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে অনেকগুণ বড়।
চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর। শহরটি অসংখ্য টিলায় সুশোভিত। টিলার মাথায় মাথায় অফিস-আদালত আর সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থান। টিলার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাজপথ।
জেলার প্রধান নদী কর্ণফুলি। শহরটির পাশ দিয়ে কর্ণফুলি কুলকুল করে বয়ে চলেছে। মোহনামুখী গতি। অদূরে বঙ্গোপসাগর। নদীটি সাগরে গিয়ে মিশেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শহরটি যেন পটে আঁকা ছবি।

চট্টগ্রাম শহরে দুটি অস্ত্রাগার। একটি পুলিশ অস্ত্রাগার, অন্যটি অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার।
পুলিশ অস্ত্রাগারটি শহরের প্রান্তসীমায়। অস্ত্রাগারটির পাশেই দুটি ব্যারাক। ব্যারাকে প্রায় পাঁচশ পুলিশ বাস করে। এরা রিজার্ভ পুলিশ। জেলার কোথাও কোন গোলমাল দেখা দিলে প্রয়োজন বোধে সশস্ত্র সেপাই সেখানে পাঠানো হয়।
শহরের উত্তর সীমানায় অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার। অস্ত্রাগারটির পাশে কোন ব্যারাক নেই। এ অস্ত্রাগারে ফৌজী রাইফেল ও মেশিনগান প্রভৃতি উন্নত ধরনের প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র মজুত। উভয় অস্ত্রাগারে সশস্ত্র প্রহরী দিনরাত মোতায়েন থাকে।
শহরের মাঝামাঝি জায়গায় টিলার ওপর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস। যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

চট্টগ্রাম জেলাকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে, রেল-লাইন তুলে ফেলা বিপ্লবীদের পক্ষে অবশ্য-করণীয়। তাই বিপ্লবী নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিলেন—অস্ত্রাগার দখলের সময় দু জায়গায় রেল-লাইন তুলে ফেলতে হবে।

নির্বাচিত জায়গা দুটির মধ্যে একটি হলো—চট্টগ্রাম শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে ধুম রেল স্টেশনের কাছে একটি নির্জন স্থান। দ্বিতীয় স্থানটি ৭০ মাইল দূরে নাঙ্গলকোট রেল-স্টেশনের কাছে। রেল-লাইন তোলার পর বিপ্লবীরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দেবেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়ার জন্য ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা বিপ্লবীদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়লো। এ ক্লাবে বড়ো বড়ো ইংরেজ কর্মচারীরা মিলিত হয়ে সন্ধ্যায় আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। এ সুযোগে কচু-কাটা করতে হবে ইংরেজ সাহেবদের। তবেই ইংরেজ সরকার বুঝতে পারবেন—ভারতবাসীরাও প্রতিশোধ নিতে শিখেছে।

প্রথম সারির বিপ্লবীদের মধ্যে কে কোন কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের নাম নিচে দেওয়া গেলো :

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের পরিচালনায় পুলিশ অস্ত্রাগার দখলের ভার দেওয়া হলো। সহযোদ্ধা থাকবেন—সরোজ গুহ, হিমাংশু সেন, হরিপদ মহাজন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত।

গণতন্ত্র বাহিনীর পরনে থাকবে খাকী ফৌজী পোশাক। অনন্ত সিংহের পোশাক থাকবে বৃটিশ আর্মি জেনারেলের। গণেশ ঘোষের পোশাক থাকবে ফিল্ড মার্শালের।

এই ছ'জন বিপ্লবী সৈনিক ছাড়াও প্রায় ত্রিশজন বিপ্লবী যুবক পরিকল্পনা অনুসারে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে, রাতের অন্ধকারে পুলিশ অস্ত্রাগারের কাছাকাছি ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকবেন।

অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার দখলে নেতৃত্ব দেবেন—অন্যতম নেতা নির্মল সেন ও লোকনাথ বল। এই দুই নেতার সঙ্গে থাকবেন বিপ্লবী রজত সেন, জীবন ঘোষাল, সুবোধ চৌধুরী ও ফণীন্দ্র নন্দী। এই ছ'জন মরণ পাগল বিপ্লবীকে সাহায্যে করার জন্য, অস্ত্রাগারের কাছাকাছি জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকবেন আরো চারজন বিপ্লবী সদস্য। তাঁদের নাম হলো – ক্ষীরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি নাগ, নিতাই ঘোষ এবং প্রভাস বল।

লোকনাথ বলের পোশাক থাকবে বৃটিশ আর্মি জেনারেলের।

টেলিফোন ভবন আক্রমণে পরিচালনা করবেন অম্বিকা চক্রবর্তী। তাঁর সহকর্মী হিসেবে মনোনীত হলেন—কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল দস্তিদার (শঙ্কু), মণীন্দ্রলাল গুহ, বীরেন দে ও নিরঞ্জন রায়।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন নরেশ রায়। এই দলে থাকবেন—অসীম সাহসী যুবক ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেন, অমরেন্দ্র নন্দী ও হরিগোপাল বল (লোকনাথ বলের ছোট ভাই)।

নাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের কাছে রেল-লাইন তোলার কাজে যাঁরা নির্বাচিত হলেন তাঁদের নাম হলো – বিজয় আইচ, শঙ্কর সরকার এবং সুশীল দে। এ ছোট দলটিকে পরিচালনা করবেন উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।

ধুম রেলস্টেশনের কাছে রেল-লাইন তোলার জন্য মনোনীত হলেন—সুবোধ মিত্র, সুকুমার ভৌমিক ও সৌরীন্দ্রকিশোর দত্তচৌধুরী। এই দলটির নেতৃত্ব দেবেন লালমোহন সেন।

লালমোহন সেনের বাবার নাম অখিল সেন। বাড়ি সন্দ্বীপ। গ্রাম—মুছাপুর। জেলা-চট্টগ্রাম। অখিল সেনের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সন্তানদের মধ্যে লালমোহন সকলের ছোট।

সন্দ্বীপ কার্গিল হাই ইস্কুলের পড়া শেষ করে, লালমোহন চট্টগ্রাম শহরের নর্ম্যাল ইস্কুলে ভরতি হন। নর্ম্যাল ইস্কুলের খেলার মাঠে আনন্দ গুপ্তের সঙ্গে লালমোহনের পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। আনন্দ গুপ্ত তাঁকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। লাল-মোহন এগিয়ে গেলেন দূরন্ত ঝড়ের গতিতে।

সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘোষণাপত্র বিলি করার জন্য মোট পাঁচজন বিপ্লবীর নাম তালিকাভুক্ত হলো। নির্বাচিত ব্যক্তিরা হলেন—শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু গুহ, সুখেন্দু দস্তিদার, দীনেশ চক্রবর্তী এবং হরলাল চৌধুরী।

ইস্তাহার তিনটি ইংরেজীতে লেখা। লিখেছেন গণেশ ঘোষ। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাম দিয়ে ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সেই মামলার রায় থেকে ঘোষণাপত্র তিনটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনী

ব্রিটেনবাসী ও ব্রিটিশ সরকার সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে তাদের চিরপরাধীন করে রাখার ও তাদের মন থেকে জাতীয় ভাবধারা এবং জাতীয়তাবোধ মুছে ফেলার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে, ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা আজ তাকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ করছে।

ভারতবর্ষ হলো ভারতবাসীর বাসভূমি। স্বভাবতঃই ভারতবাসীই তার ভাগ্যবিধাতা। বিদেশী শক্তি ও শাসকশ্রেণী দীর্ঘকাল ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার করায়ত্ব করে তাকে পরাধীন করে রাখলেও ভারতবাসীর এই জন্মগত অধিকার ক্ষুন্ন হয়নি, তা ক্ষুন্ন হবার নয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমন্বিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনী অস্ত্রবলে এই অধিকার অর্জনের শপথ গ্রহণ করছে এবং স্বাধীনতা অর্জন—জনগণের মঙ্গল সাধন ও বিশ্বে মাতৃভূমির গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিটি সদস্য সৈনিক আমৃত্যুপণে অবিচল।

ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী নরনারী নির্বিশেষে অমানুষিক হত্যালীলা, কামানের মুখে নিরীহ নারী নিধন, নির্বিকার-চিত্তে পুরুষদের ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুদণ্ড, নির্বিচারে শিশু ও কিশোরদের দমন-পীড়ন, ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও উৎখাত প্রচেষ্টা আজ সকলের মনে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা মিশ্রিত বিরূপতার সঞ্চার করেছে। এসব অন্যায়ের প্রতিকারে সকলের অন্তর উদ্বেলিত।

ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনী প্রত্যাশা করে প্রতিটি ভারতবাসী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশ

গ্রহণ করুক, আত্মমর্যাদায় উদ্বুদ্ধ হোক। এবং মনে করে এই মহৎ কাজে যারা সংশয় ও *দোলাচলচিত্ততার পরিচয় দেবে তারা ভীরুতা ও অমানবিকতার অপরাধে দোষী।*

এই পরম ও চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামের নরনারী অবশ্যই তাদের শৌর্য ও দেশপ্রেমের পরিচয়ে বিশিষ্ট হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করার প্রেরণা সঞ্চার করবে।

আদেশানুসারে
সপরিষদ সভাপতি
ভারতীয় গণমুক্তি বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

ঘোষণাপত্র লেখার পর ছাপানোর পালা। প্রেসে ছাপাতে গেলে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। তাই ছোট হ্যাণ্ড প্রেস কেনা হলো। গণেশ ঘোষ তাঁর বিশ্বাসী দুজন বিপ্লবী সদস্যকে নিয়ে গোপনে তিন রকমের বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে নিলেন।

দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রটি ছাত্র ও যুব সমাজকে সম্বোধন করে লেখা। ঘোষণাপত্রটি এরূপ :

ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী

চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের প্রতি

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং তাদের সরকারের নির্দয় দাসত্ব ও উৎপীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠাকল্পে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' একটি প্রচেষ্টা করেছে এবং স্বাধীন ভারতের প্রতীক পতাকা উঁড়িয়েছে।

ভারতবাসী যতোবার স্বাধীনতার জন্য লড়েছে, ব্রিটিশ সরকার বিগত দু'শ বছরের অত্যাচারের রাজত্বে সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকবার অতি নির্মম হাতে দমন করেছে। এবারও দস্যু-বৃত্তির অবৈধ শোষণ পুনরায় কায়েম করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে কসুর করবে না।

অতএব, ভাই সব, ওঠ, অবস্থার দিকে তাকাও। পরাধীনতার বেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কর। চেয়ে দেখ, তোমার মাতৃভূমি কি করুণ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা। জার্মানী, রাশিয়া ও চীনের ছাত্র-যুবকেরা যেরূপ করছে—তোমরাও তাই কর। তোমরা অন্তরে গভীর ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। সৈনিক রূপে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী'-তে যোগদান কর। এবং মাতৃভূমিকে দুর্ভাগ্যের অতলস্পর্শ গভীরতা থেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর।

আদেশক্রমে
সপরিষদ সভাপতি
ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রটি পড়ে এটাই মনে জাগে, চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল এ বিষয়ে সুনিশ্চিত —তাঁরা ঝটিকা আক্রমণে ইংরেজ সরকারের অস্ত্রাগারগুলি দখল করতে পারবেন। স্বাধীনতার প্রতীক পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবেই করবে। নতুবা ছাত্র ও যুব-সমাজকে আগে থেকে ছাপানো ইস্তাহারে আহ্বান জানাতে পারতেন না। বিপ্লবীদের শক্তি সীমিত। তাও তাঁদের জানা। পরিশেষে ইংরেজ সরকার তাঁদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে নির্মম হাতে দমন করবেন তাও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণাপত্রে জানিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় ইস্তাহারটি নিচে দেওয়া হলো ঃ

চট্টগ্রামবাসীদের প্রতি

চট্টগ্রামের প্রত্যেক স্ত্রী, পুরুষ ও তাঁদের সন্তানদের প্রতি 'ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী' এতদ্বারা নির্দেশ দিচ্ছে—তাঁরা যেন আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী সকল ইংরেজ ও শ্বেতাঙ্গ ইঙ্গ-ভারতীয় জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় বন্দী করে 'গণতন্ত্র বাহিনী'র প্রধান কার্যালয়ে হাজির করেন।

'ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী' ঘোষণা করছে, এরূপ ব্যক্তিদের যাঁরা সমর্পণ করবেন, তাঁদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া হবে।

আদেশক্রমে
সপরিষদ সভাপতি
ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী
চট্টগ্রাম শাখা

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ারে সারা ভারত উত্তাল। এ সময় চট্টগ্রামের কংগ্রেসসেবীরা দাবি জানালো—"অবিলম্বে চট্টগ্রামে আইন অমান্য আন্দোলন করা হোক।"

চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস সংগঠনের সম্পাদক মাস্টারদা। কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্ব বিপ্লবীদের হাতে। মাস্টারদা উভয়সঙ্কটে পড়লেন। এদিকে যুব-বিদ্রোহের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বিপ্লবীরা প্রস্তুত। অন্যদিকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য কংগ্রেস সদস্যরা সোচ্চার। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একটি উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আলোচনা শেষে মাস্টারদা এক অভিনব কৌশল বের করলেন। স্থির হলো একটি প্রচারপত্র বের করতে হবে।

ইস্তাহারে লেখা থাকবে—২১ এপ্রিল (১৯৩০ সাল) বিকেলে চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে গান্ধী ময়দানে কংগ্রেস নেতারা সরকারের নিষিদ্ধ বই প্রকাশ্যে পাঠ করে 'রাজদ্রোহমূলক' আইন (Sedition Act) অমান্য করবেন।

এই ইস্তাহারটিও লেখার ভার পড়লো গণেশ ঘোষের ওপর। এটি প্রচার করার উদ্দেশ্য

হলো—যুব-বিদ্রোহ সংগঠিত হবার আগে গোয়েন্দা বিভাগকে বিভ্রান্ত করা। একই সঙ্গে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের শান্ত রাখা। যাকে বলে – এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

'চট্টলবাসীদের প্রতি' শিরোনাম দিয়ে গণেশ ঘোষ বাংলায় লিফ্‌লেটটি লিখলেন। তা ছাপানো হলো। প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করলেন—সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও গণেশ ঘোষ। এবার প্রচারের পালা।

১৮ এপ্রিল। ১৯৩০ সাল। অর্থাৎ যুব-বিদ্রোহের দিন ।

বিপ্লবীদের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত দিনটি এলো। ভোরের সূর্য নূতন দিনের বার্তা নিয়ে বিপ্লবীদের জীবনে হাজির হয়েছে। সেই বার্তাটি হলো, 'Programme of Death'– মৃত্যুর কর্মসূচী। জীবন উৎসর্গ করেই তাঁরা দেশমাতৃকার পূজা সারবেন। এই দিনটির জন্য বহুদিন ধরে বিপ্লবীরা যেন মধুর স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন।

'চট্টলবাসীদের প্রতি' বাংলা প্রচারপত্রটি ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট মামলার রায়ে (Judgement in Armoury Raid Case, No. 1 of 1930 pp. 11 and 12) ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ঘোষণাপত্রটির বাংলা অনুবাদ দেওয়া গেলো।

"স্বাধীনতা সংগ্রামের রণভেরী বেজে উঠেছে। দেশ জুড়ে আইন আমান্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে। লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, আজ সেই চট্টগ্রাম সংগ্রামে পিছিয়ে থাকবে। লবণ-আইন আমান্য করার জন্য প্রায় একমাস আগে একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হয়েছে।

সত্যাগ্রহ কমিটি কি করে দেখার জন্য আমরা আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবো। কলকাতায় এবং অন্যান্য জায়গায় লবণ-আইন অমান্য ছাড়াও রাজদ্রোহাত্মক আইন ভঙ্গ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে আমরা চট্টগ্রামেও রাজদ্রোহাত্মক আইন অমান্য আরম্ভ করতে চাই।

এ অভিপ্রায়ে আমরা সর্বশ্রেণীর মানুষের সহানুভূতি কামনা করি। চাই সত্যাগ্রহী সৈনিক। আমাদের প্রত্যাশা জনসাধারণ আমাদের লোক ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন। আগ্রহী সৈনিকেরা ২১ এপ্রিলের মধ্যে প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের যে কোন একজনের সঙ্গে দেখা করুন।"

পুবের আকাশ আবির রঙে রাঙ্গানো। ভোরের আলো ফুটি ফুটি। সূর্য সেন ঘুম থেকে জাগলেন। খাটের ওপর বসলেন। তারপর গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কর্মের এক-এক সোপান পার হয়ে তাঁর সোনালি স্বপ্ন এগিয়ে চলেছে। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখার প্রেসিডেণ্ট তিনি। তাঁর ডাকে দেশের তরুণদল স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করতে চলেছেন। তিনিই এই কর্মযজ্ঞের ঋষি।

গণেশ ঘোষ ও নির্মল সেনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যুব-বিদ্রোহের প্ল্যান মাফিক সব কিছু যথাযথ আছে কিনা তদারক করা। এ বিষয়ে গণেশ ঘোষ কি বলেন দেখা যাক।

'চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন' স্মারক পুস্তিকায় গণেশ ঘোষ লিখেছেন (পৃঃ ২২) ঃ

"১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল।

"সশস্ত্র বিদ্রোহের যথাযথ প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়েছে। বিপ্লবী নেতৃত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে

রয়েছেন। প্রত্যেকের কাজ এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রমণ করবার জন্য ৫-৬ জনকে নিয়ে এক একটি ছোট দল (গ্রুপ) গঠন করা হয়েছে। সেদিনই সকালে প্রত্যেকটি গ্রুপকে পৃথক পৃথক বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানের বিস্তারিত নকশা, কাজের দায়িত্ব ও অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে যিনি যে গ্রুপের সাথে আছেন তিনিই সেই গ্রুপের প্রত্যেকের কাজের দায়িত্ব স্থির করে দেবেন ও সেই দায়িত্ব পালনের পন্থা আলোচনা করে নির্ধারিত করে দেবেন। প্রত্যেকটি গ্রুপের ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল ও'দিন সন্ধ্যার পর সকলে একত্রে ও'বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পূর্বে কেউই একাকী ও'বাড়ি থেকে কোন সময়েই বাইরে যাবে না।

যে সকল বিপ্লবী যুবক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রমণে অংশ নেবে বলে নির্বাচিত হয়েছিল কেবলমাত্র তাদেরই এভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। এ ভিন্নও প্রথম শ্রেণীর আরও…৫-৬ জনের ছোট ছোট গ্রুপ ভাগ করে দিয়ে তাঁদের সকলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে সেদিন রাত ১০ টার সামান্য কিছু পূর্বে পৃথক পৃথক ভাবে চট্টেশ্বরী কালীবাড়ি সংলগ্ন ঘন জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করে এবং রাত্রিকালে যেদিক থেকে বিশেষ ধরনের কয়েকটি ধ্বনি (শ্লোগান) শুনতে পাবে ও বিশেষ ধরনের আলোর সংকেত দেখতে পাবে সেদিকেই যেন অবিলম্বে ছুটে চলে যায়। আর যদি ও'রূপ ধ্বনি না শোনা যায় এবং আলোর সংকেত না দেখা যায় তা হলে মধ্যরাত্রির পর যেন তারা নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে চলে যায়।"

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আসেন যাঁরা ত্যাগেই আনন্দ পান। এ'রা কেবল নীরবে মানব কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন। সে রকম মহান দরদী মানুষটি হলেন - চট্টগ্রাম বিপ্লবের অন্যতম নেতা নির্মল সেন। শিশুর মতো সরল তিনি। ফুলের মতো সুন্দর এবং আকাশের মতো উদার হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মেছেন। দলের প্রতিটি ছেলেকে মায়ের মতো দরদী মন নিয়ে ভালোবাসেন।

নির্মল সেনের বাবার নাম রসিকচন্দ্র সেন। মায়ের নাম হরসুন্দরী।

রসিক সেনের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। তিন ছেলের নাম—যামিনীরঞ্জন, ধীরেন্দ্রলাল ও নির্মল সেন। মেয়েদের নাম—শৈলবালা ও সরলা।

বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রাম।

নির্মল সেনের জন্ম ১৯০০ সাল।

বিকেল ২-৩০ মিনিট। হেডকোয়ার্টারে মিটিং। মিটিং-এ উপস্থিত আছেন—মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। এ'রা যেন পঞ্চ পাণ্ডব।

এটি কেন্দ্রীয় কমিটির শেষ সভা। এর গুরুত্ব সীমাহীন। আলোচনা শুরু হলো। আলোচনার বিষয়বস্তু—অস্ত্রশস্ত্র বিলি ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ ঘাঁটি আক্রমণ হবে, কোন্ কোন্ পথ দিয়ে বিপ্লবীরা লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যাবেন, বিভিন্ন দলের সঙ্গে নেতাদের সংযোগের ব্যবস্থা, সংকেত বাক্য এবং শ্লোগান ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে মাস্টারদা কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নগুলি মোটর গাড়ি সংক্রান্ত। বিপ্লবীরা মোট চারটি ঘাঁটি আক্রমণ করবেন। আক্রমণ স্থলগুলি হলো—টেলিফোন ও

টেলিগ্রাফ অফিস, ইউরোপীয়ান ক্লাব, পুলিশ অস্ত্রাগার ও অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটর গাড়িতে করেই তাঁরা আক্রমণ স্থলে যাবেন। গাড়ির প্রয়োজন কম-সে কম চারটি।

বর্তমানে বিপ্লবীদের হাতে রয়েছে মোট দুটি মোটরগাড়ি। একটি অনন্ত সিংহের বেবী-অস্টিন। অন্যটি নূতন কেনা শেভ্রোলে গাড়ি। আরো দুটি মোটরগাড়ি নেওয়ার কথা। সেই গাড়ি দুটি হলো – জীবন ঘোষালের বাবা যশোদা ঘোষালের ছ সিলিণ্ডার 'এসাক্স'। অপর গাড়িটি হেরম্ব বলের।

এ দুটি গাড়ি মেরামতের জন্য কারখানায় দেওয়া আছে। তার মধ্যে একটি গাড়ি অন্ততঃ পক্ষে পাওয়ার আশা। এ ছাড়া একটি ডজ গাড়ির ট্যাক্সি ড্রাইভারকে লোকনাথ বল আগাম টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করেছেন।

সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে লোকনাথ বেঁধে রাখবেন। তারপর তাঁর দল সেই গাড়ি করে অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণ করতে যাবেন। গাড়িটি ড্রাইভ্ করবেন জীবন ঘোষাল।

বিপ্লবীদলের প্রয়োজনের তুলনায় মোটরগাড়ি অপ্রতুল। রোগগ্রস্থ গাড়ি দুটি কারখানা থেকে যথাসময়ে ছাড়া পাওয়া নিয়ে মাস্টারদা সন্দিহান। আশঙ্কায় মন তাঁর দুরুদুরু। গাড়ি দুটি কতোটা সারানো হয়েছে তার খবর দুজন বিপ্লবী সদস্য প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গণেশ ঘোষের কাছে নিয়ে আসছেন।

মাস্টারদা জিজ্ঞেস করলেন "অনন্তলালের গাড়িটি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যবহার হবে। গাড়িটি ঠিক আছে তো ? কে চালাবে ? সে আহত বা তার মৃত্যু হলে কে চালাবে তারপর ?"

গণেশ ঘোষ জবাব দিলেন, "গাড়ি ঠিক আছে, গাড়ি চালাবে—নরেশ, ত্রিপুরা ও মনোরঞ্জন।

মাস্টারদা আবার জানতে চাইলেন, "নূতন কেনা বড় গাড়িটি নিয়ে অম্বিকাবাবু টেলিফোন অফিস আক্রমণ করতে যাবেন। আনন্দ গাড়িটি ঠিক মতো চালাতে পারবে তো ? তার ট্রায়েল নেওয়া হয়েছে ? গাড়ির তুলনায় খুব ছোট সে।"

মাস্টারদার প্রশ্নের উত্তরে অনন্ত সিংহ আনন্দ গুপ্তের গাড়ি চালানোর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অনন্ত সিংহের মুখে আনন্দের গাড়ি চালানোর সুখ্যাতি শুনে মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী সন্তুষ্ট।

সন্ধ্যে সাতটা। চট্টগ্রাম শহরের আসাম-বেঙ্গল রেল অফিসের পাশের রাস্তায় দুটি গাড়ি এসে মিলিত হলো। একটি মোটরগাড়িতে অনন্ত সিংহ। অন্যটিতে গণেশ ঘোষ। দুজনেই উচ্চ সামরিক অফিসারের পোশাকে সুসজ্জিত। তাঁরা বের হয়েছেন—আক্রমণকারী বিপ্লবী-দলের প্রস্তুতির ফাইনাল রিপোর্ট জানতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণের আধঘণ্টা আগে, আক্রমণস্থলের অদূরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে তাঁদের দেখা করার ব্যবস্থা আছে।

গণেশ ঘোষ এ সময় এক নিদারুণ সংবাদ পরিবেশন করলেন, "অনন্ত, সর্বশেষ খবর হলো —মিস্ত্রীরা শত চেষ্টা করেও দুটি গাড়ির একটিও সারাতে পারলো না।"

খবরটা শুনেই অনন্ত সিংহের মাথা বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠলো। মনে হলো—মাথার মধ্যে অবিরত কামান দাগার শব্দ হচ্ছে। কি সর্বনাশ! মাস্টারদা বারবার যে আশঙ্কা করছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হলো!

এ চরম পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আক্রমণের 'জীরো আওয়ার' (Zero hour) আরো দু ঘণ্টা পিছিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আক্রমণের সময় রাত আটটার পরিবর্তে রাত দশটা।

এখন সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ সব দলকে সময় পরিবর্তনের খবর জানানো।

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ মোটরগাড়িতে চলেছেন আগুপিছু। প্রথমে দেখা হলো—নরেশ রায়ের সঙ্গে। সময় পরিবর্তনের খবর তাঁকে জানিয়ে দিলেন।

বেবী-অস্টিন চালাচ্ছিলেন গণেশ ঘোষ। গাড়িটি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য নরেশ রায়ের হেপাজতে ছেড়ে দিলেন তিনি।

গণেশ ঘোষ অনন্ত সিংহের শেভ্রোলে গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি তীরবেগে ছুটলো। উদ্দেশ্য —লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের দলের সঙ্গে দেখা করা। কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁরা দেখতে পেলেন, বিপরীত দিক থেকে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে লোকনাথ বলের মোটরগাড়ি এগিয়ে আসছে। অনন্ত সিংহের গাড়ির আলোতে লোকনাথ বল ও জীবন ঘোষালকে তাঁরা প্রথমে দেখতে পেলেন।

গাড়ি চালাচ্ছেন জীবন ঘোষাল। চালকের বাঁয়ে জেনারেলের পোশাকে লোকনাথ বল। পেছনের সীটে নির্মল সেন ও নির্বাচিত কর্মীরা। সকলেই সামরিক পদ অনুযায়ী খাকী পোশাকে সুসজ্জিত। হেড্‌লাইটের আলোয় লোকনাথ বল ও তাঁর সাথীদের প্রথম দেখতে পেয়েই অনন্ত সিংহের চোখ ঝলসে গেলো।

মোটরগাড়ি দুটি পাশাপাশি এসে দাঁড়ালো। প্রত্যেক বিপ্লবী সৈনিকের বুকে-পিঠে ইণ্ডিয়ান রিপাব্‌লিকান আর্মির বিশেষ ধরনের উজ্জ্বল ব্যাজ লাগানো। এর ফলে নিজেদের মধ্যে ভুল করে গুলি বিনিময় হবে না। প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট্। বুকে সোনালি ও রূপালী রঙের তারকা ঝুলছে।

কয়েক মিনিট আগে লোকনাথ বল একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্জন রাস্তার ধারে ক্লোরোফরম্ করে বেঁধে রেখে এসেছেন। এ মতো অবস্থায় যখন গণেশ ঘোষের মুখে আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার কথা লোকনাথ বল শুনলেন, তখন তাঁর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম হবার উপক্রম।

কথাপ্রসঙ্গে লোকনাথ বলকে এও জানিয়ে দেওয়া হলো,—যদি দু'ঘণ্টার মধ্যে কোন গাড়ি বিপ্লবীরা যোগাড় করতে না পারেন তাহলেও পায়ে হেঁটে তাঁরা পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করবেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আক্রমণের আগে এই তাঁদের শেষ দেখা। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ গাড়িতে চাপলেন। গণেশ ঘোষ তাঁর বাসায় নেমে পড়লেন। এটি বিপ্লবীদলের ফিল্ড-হেডকোয়ার্টার। তা ছাড়া পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি গণেশ ঘোষের বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আছেন।

ঝড়ের গতিতে অনন্ত সিংহ ছুটলেন জেলা কংগ্রেস অফিসে। সেখানে পৌছে গাড়ি না পাওয়ার জন্য দু'ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়ার কথা মাস্টারদাকে জানালেন।

অনন্ত সিংহের কথা শুনে মাস্টারদা খুব চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা কতকগুলো প্রশ্ন করলেন অনন্ত সিংহকে। তিনি জানতে চাইলেন, "দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা গাড়ি যোগাড় করতে পারবেন কিনা। লোকনাথ বল যে ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে রেখেছেন তার জ্ঞান ফিরে পেলে কি হবে? শহরের চারদিকে বিপ্লবী সৈনিকেরা ছড়িয়ে আছে। সময় পরিবর্তনের জন্য বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই তো?"

প্রশ্নের জবাব অনন্ত সিংহের আগে থেকে তৈরি। তাই তিনি যথাযথ উত্তর দিয়ে মাস্টারদাকে আশ্বস্ত করলেন।

জেলা কংগ্রেস অফিস বিপ্লবীদলের হেড্‌কোয়ার্টার। এটি সংযোগ রক্ষার কেন্দ্রস্থল।

সবচেয়ে বড় সমস্যা—প্রচারপত্র বিলি বন্ধ করা। সময় মতো খবর পৌঁছাতে না পারলে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ইস্তাহার যদি দু'ঘণ্টা আগে পুলিশের হাতে পড়ে যায় তাহলে বিপ্লবীদের এতো দিনের প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে যাবে।

মাস্টারদা অনেক ভেবেচিন্তে এ কাজের দায়িত্ব দিলেন, তাঁর প্রিয় দু'জন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী সদস্যের ওপর। তাঁদের নাম—কালীকিঙ্কর দে ও ননী দেব। তাঁদের কাজের সীমাহীন গুরুত্বের কথা মাস্টারদা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কালী ও ননী সাইকেলে তীরবেগে ছুটলেন তাঁদের কর্তব্য পালনে।

বিপ্লবীরা বিপদ-সাগরে ভাসছেন। তাঁদের পদে পদে বিপদ। এখন একমাত্র সমস্যা দু' ঘণ্টার মধ্যে একটি মোটরগাড়ি যোগাড় করা।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ বিপ্লবীদের দরদী বন্ধু ডাক্তার জগদারঞ্জন বিশ্বাসের কাছে গেলেন। ডাক্তারের মোটরগাড়িটি চাইলেন। গাড়ি পাওয়া গেলো না।

পরের খবর আরো ভয়াবহ। এদিন চট্টগ্রাম শহরে নিখিল-বঙ্গ মুসলিম কন্‌ফারেন্স চলছে। শহরের সব ট্যাক্সিই কন্‌ফারেন্সের কাজে ভাড়া খাটছে।

নিরুপায়েও উপায়ের ক্ষীণ আশা নিয়ে অনন্ত সিংহ বিপ্লবী সদস্য হিমাংশু সেনকে (আশু) বললেন, "যে কোন উপায়ে তোমাকে একটি ট্যাক্সি যোগাড় করে আনতেই হবে। ট্যাক্সি নিয়ে তুমি সাড়ে ন'টার মধ্যে গণেশ ঘোষের বাড়ি চলে আসবে। ট্যাক্সি পাওয়া না গেলে অন্ততঃপক্ষে একটি ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তুমি যথাসময়ে চলে আসবে।"

অনন্ত সিংহের নির্দেশে হিমাংশু ট্যাক্সির খোঁজে বের হচ্ছেন, এমন সময় অনন্ত সিংহ হিমাংশুকে বললেন, "মনে রেখো, Impossible is the word found in the Dictionary of fools!"

পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটি বাড়ি থেকে চারটি দল আক্রমণের জন্য বের হবে, সেই বাড়ি চারটি হলো—চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস অফিস, গণেশ ঘোষের বাড়ি (দোকান), লোকনাথ বল ও দেবপ্রসাদ গুপ্তের বাড়ি। তিনটি আক্রমণকারী দল বের হয়ে পড়েছেন। গণেশ ঘোষের বাড়ির দলটি মোটরগাড়ির অভাবে এখনো বের হতে পারেননি।

হিমাংশু সেনকে ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়ে অনন্ত সিংহ গণেশ ঘোষের বাড়িতে ঢুকলেন। দেখলেন, গণেশ ঘোষ, বিধু ভট্টাচার্য হরিপদ মহাজন ও সরোজ গুহ সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত। অথচ তাঁদের মুখে বিষাদের ছায়া। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, খাটের

ওপর পাঁচটি দোনলা বন্দুক। বন্দুকের চারপাশে প্রায় দুশো কার্তুজ ছড়িয়ে আছে। এর কারণ—উপযুক্ত কার্তুজের অভাবে পাঁচটি বন্দুক অকেজো। প্রত্যেক বিপ্লবী সৈনিকের হাতে যেখানে অস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি সেই ক্ষেত্রে পাঁচ পাঁচটি বন্দুক কাজে লাগানো যাচ্ছে না। একি কম পরিতাপের বিষয়?

এ পাঁচটি বন্দুক যুব-বিদ্রোহের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সদস্যরা তাঁদের বাড়ি থেকে গোপনে নিয়ে এসেছেন। তাই বিপ্লবীরা বন্দুকের উপযুক্ত টোটা যোগাড় করতে পারলেন না। যাঁদের বাড়ি থেকে এ পাঁচটি বন্দুক আনা হয়েছে তাঁদের নাম হলো—মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণ চৌধুরী, রণধীর দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্রলাল দস্তিদার (সমর্থক) এবং মাখন ঘোষাল।

এদিকে হিমাংশু সেন ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন, এ আশায় প্রহর গুনছেন বিপ্লবীরা। গণেশ ঘোষের বাড়ির প্রবেশ পথে হরিপদ মহাজন পাহারায় নিযুক্ত। হরিপদর পেয়েছে জল তেষ্টা। তিনি জল খেতে বাড়ির ভেতর গেলেন। এই ফাঁকে ঘরের মধ্যে সটান ঢুকে পড়লেন স্বদেশ রায়। স্বদেশ বিপ্লবীদলের সদস্য নয়।

বিপ্লবী দেবপ্রসাদ গুপ্তের বন্ধু স্বদেশ। স্বদেশকে গুপ্ত সমিতির সভ্য করার জন্য কয়েক মাস আগে নরেশ রায় অনন্ত সিংহকে অনুরোধ করেছিলেন। অভ্যুত্থানের ছ'মাস আগে থেকে বিপ্লবীদলে নূতন সদস্য নেওয়া বন্ধ। তাই স্বদেশকে বিপ্লবীদলে নেওয়া হয়নি।

স্বদেশ সেতার শিল্পী। বয়স কুড়ি বছর। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়ছেন। বাড়ি ঢাকা।

ঘরে ঢুকেই স্বদেশ হকচকিয়ে গেলেন। দেখলেন, উপস্থিত সকলেই সামরিক পোশাকে সজ্জিত। খাটের ওপর পাঁচটি বন্দুক রাখা আছে। সকলের চাউনি দেখে তিনি আহত হলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর উপস্থিতি এখানে মোটেই কাম্য নয়। সকলে নীরব। বন্ধুদের সঙ্গে প্রায় দিনই গণেশ ঘোষের দোকানে তিনি আসতেন। আজ তিনি অবাঞ্ছিত। স্বদেশ পুলিশের গুপ্তচর হতে পারে এ সম্ভাবনায় অনন্ত সিংহ একটু আড়ালে গিয়ে গণেশ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। উদ্দেশ্য—স্বদেশকে বেঁধে রাখা।

অনন্ত সিংহের বক্তব্য শুনে মানবতার পূজারী গণেশ ঘোষ চুপ করে রইলেন। গণেশ ঘোষের সুস্পষ্ট ধারণা স্বদেশ গুপ্তচর নয়। তাই তিনি চান না মানবতার অসম্মান। তাঁর মৌনতায় অনন্ত সিংহ বাধা পেলেন। স্বদেশের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন ও বিধু ভট্টাচার্যের বন্ধু।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে স্বদেশ মুক্তি পেতে চান। তিনি অধোমুখে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া-নেওয়ার মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে তাঁর অন্তর দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

রাত নটা বেজে গেছে। পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি এখনো পর্যন্ত গণেশ ঘোষের বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। তাঁরা হিমাংশু সেনের প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছেন। হিমাংশু গাড়ি নিয়ে এলেই বের হয়ে পড়বেন।

হিমাংশু সেনের বয়স বছর পনর। বাড়ি সাতকানিয়া থানার বড়হাতিয়া গ্রাম। জেলা—চট্টগ্রাম।

আক্রমণের সময় দু'ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার খবর চট্টগ্রাম শহরের প্রতিটি আক্রমণকারী গ্রুপকে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সময় পরিবর্তনের খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি—চট্টগ্রামের সঙ্গে রেললাইন বিচ্ছিন্ন করার জন্য যাঁদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই দুটি দলকে। কেননা যুব-বিদ্রোহ শুরু হওয়ার একদিন আগে তাঁরা চট্টগ্রাম শহর থেকে যাত্রা করেছেন। একটি দল চট্টগ্রাম শহর থেকে ৬০ মাইল দূরে ধুম ও জোরালগঞ্জ রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থান করছেন। অপর দলটি লাক্‌সাম ও লাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের মধ্যে ততোক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

এ দুটি দলের মধ্যে একটি দলে সুবোধচন্দ্র মিত্র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কি বলেন দেখা যাক।

'চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরণিকায় 'প্রস্তুতিপর্ব' প্রবন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধচন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ

"১৭-৪-৩০ তারিখে সন্ধ্যার পর আবার আমরা কংগ্রেস অফিসে উপস্থিত হলাম। সেখানে গণেশদা (গণেশ ঘোষ) আর অনন্তদা (অনন্ত সিংহ) আমাদের হাতে দিলেন রেললাইন তুলে ফেলার আর টেলিগ্রাফ তার কাটার যন্ত্রপাতি। তাঁদের কাছ থেকে শিখেও নিলাম ওগুলো ব্যবহারের কৌশল। আমাদের কাজ ছিল চট্টগ্রামকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। চট্টগ্রামের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা লুপ্ত করে দেওয়া। আমাদের সাফল্যের উপর যে পরিকল্পনার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করছে সেটাও তাঁরা ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন।

কোথায় আর কিভাবে আমরা কাজ করব তা আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিলাম। দুটো দলে ভাগ হয়ে একটা দল ধুম ও জোরালগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে এবং আর একটা দল লাক্‌সাম ও লাঙ্গলকোট স্টেশনের মধ্যে কাজ করবে। তখন আমার বুকে দুর্জয় সাহস।

...সন্ধ্যা হয় হয়। রাতে জন্তু-জানোয়ারের ভয়। তাই তখনই জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে সেখানে তখন আমরা চারজন মাত্র।

আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেল। লুকানো যন্ত্রপাতি বার করে এনে বিদ্যুৎ-গতিতে একের পর এক কাজ শেষ করতে লাগলাম। প্রথমে Fish plate খোলা। তারা Dog Spike তুলে ফেলা। তারপর রেললাইন একটু বাইরের দিকে সরিয়ে আবার Dog Spike গুলো শক্ত করে এঁটে দেওয়া।

কাজ সব শেষ হলে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। আমাদের যা যা করণীয় তা নির্ভুল ভাবে করতে পেরেছি কিনা। তারপর দূরে পাহাড়ের আড়ালে সরে গেলাম।

দূর থেকে একটা সার্চ লাইট ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তা লক্ষ্য করছি। এটা চট্টগ্রাম মেল আসার সময় নয়। হয়ত কোন মালগাড়ী আসছে। একটু পরেই কান-ফাটানো বিকট এক শব্দের সাথে সাথেই ইঞ্জিনের সার্চলাইটটা বাঁ-দিকে হেলে পড়ল। তখন আমরা টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেললাম। ফলে চট্টগ্রাম বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর আমাদের কাজও হল শেষ।"

লাঙ্গলকোট রেলস্টেশনের কাছাকাছি নির্বাচিত বিপ্লবীরাও অনুরূপভাবে রেললাইন তুলে ফেলেন। এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেন।

এদিকে অপমানে দগ্ধ হয়ে স্বদেশ রায় গণেশ ঘোষের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন। বিপ্লবীরা মৃত্যুর মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করার জন্য মোটরগাড়ির প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

রাত সাড়ে নটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। আক্রমণের সময় রাত দশটা। আধ ঘণ্টা আগে বের হতে না পারলে দশটায় পায়ে হেঁটে আক্রমণ স্থলে পৌঁছানো যাবে না। এখনো পর্যন্ত হিমাংশুর দেখা নেই। তবে হিমাংশু একখানি ঘোড়ার গাড়িও যোগাড় করতে পারলো না ?

বিপ্লবীদলটি হিমাংশুর প্রতীক্ষায় না থেকে হেঁটে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন সময় সাগর সেচে মুক্তো আনার মতো হিমাংশু একখানি ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলেন।

ট্যাক্সি বেশিক্ষণ ভাড়া করা হবে। দামদস্তুরের অছিলায় হিমাংশু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে গণেশ ঘোষের বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে গেলেন।

ড্রাইভার আবদুল রসিদ ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের পরনে সামরিক পোশাক। দু'জনের হাতে দুটি রিভলবার। রিভলবার উঁচিয়ে অনন্ত সিংহ ড্রাইভারকে ভয় দেখালেন। ড্রাইভার তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ড্রাইভারের অবস্থা দেখে অনন্ত সিংহের করুণা হলো। ড্রাইভারকে অভয় দিয়ে বললেন, তাকে প্রাণে মারা হবে না। তবে হাত-পা বেঁধে রাখা হবে। ড্রাইভার জল খেতে চাইলো। জল দেওয়া হলো।

ড্রাইভারকে বেঁধে রেখে, ছ'জন বিপ্লবী গণেশ ঘোষের বাড়ি থেকে বের হয়ে ট্যাক্সিতে চাপলেন। বিপ্লবী ছ'জনের নাম হলো—অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হিমাংশু সেন, হরিপদ মহাজন ও সরোজ গুহ।

পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণে যে ছ'জন বিপ্লবী সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সরোজ গুহ তাঁদের মধ্যে একজন। সরোজ গুহের সঙ্গে বর্তমান লেখকের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ট্যাক্সিটির অবস্থা জরাজীর্ণ। গাড়িটি চালানোর দায়িত্ব পড়লো অনন্ত সিংহের ওপর। অবশ্য আরোহী সবাই গাড়ি চালাতে পারেন।

গাড়িতে উঠেই অনন্ত সিংহ দেখেন স্টার্ট দেওয়ার চাবি নেই। একজন গাড়ির চাবি আনতে ছুটে গেলেন ড্রাইভারের কাছে।

ড্রাইভার বললো, "দুটি তারের মুখ জোড়া দেওয়া আছে। তার দুটি খুলে দিলে গাড়ি স্টার্ট নেবে।'

পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি মোটরগাড়ি করে তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন। পুরনো গাড়ির গতি বড়ই মন্থর। গাড়ির যা হাল তাতে যে কোন সময় বিকল হয়ে যেতে পারে। অনেকটা পথ চলার পর গাড়ি গেলো বিগড়ে। দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়ি। বিপ্লবীরা গাড়িটিকে ঠেলতে লাগলেন। গাড়ি স্টার্ট নিলো।

এমন সময় সরোজ গুহ লক্ষ্য করলেন, তাঁর রিভলবারটি হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে। সবাই মিলে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। এক মিনিটের মধ্যে রিভলবারটি পাওয়া গেলো।

বিপ্লবীদলটি যে রাস্তা দিয়ে চলেছেন সেই রাস্তাটি শহরের বুক চিরে গ্রামাঞ্চলের দিকে

এগিয়ে গেছে। রাস্তার দুধারে আম, কাঁঠাল, তাল ও সুপারি বাগান। এ রাস্তায় এতো রাতে সাধারণতঃ লোক চলাচল করে না। পথ নির্জন।
এমন সময় বিপ্লবীরা অস্পষ্ট দেখতে পেলেন অদূরে একটি লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে অনন্ত সিংহ ভাবলেন, লোকটি হয়তো পুলিশের ওয়াচার হবে।
গাড়ি ধীর গতিতে এগিয়ে চললো। গাড়ির হেড্-লাইটের আলোর আবর্তে বিপ্লবীদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। কিন্তু কোন কথা হলো না।
স্বদেশ রায়ের মনের মধ্যে তখন দুরন্ত ঝড় বয়ে চলেছে। তিনি বিপ্লবীদের গতি-পথের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে টেলিফোন-ভবন আক্রমণ হবে। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা কথার কথা নয়।
চট্টগ্রাম শহরের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস একটি টিলার ওপর অবস্থিত। টেলিফোন-ভবনে যাওয়ার দুটি পথ। একটি পথ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। অন্যটি নিষিদ্ধ। জনসাধারণ খাড়া সিঁড়ি বেয়ে টেলিগ্রাম করতে যায়। বিপ্লবীদের সঙ্গে রয়েছে—কীড্ ব্যাগ, রবারের বড় হাতের দস্তানা, কুড়ুল, দুখানা কাঁচি, ওয়াটার কেরিয়ার পেট্রলের টিন ও বড় বড় হাতুড়ি ইত্যাদি। এ সমস্ত জিনিস নিয়ে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওঠা খুবই কষ্টকর। তাই তাঁরা নিষিদ্ধ রাস্তাই ব্যবহার করলেন।
অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে আছেন—আনন্দ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল দস্তিদার (শঙ্কু), মণি গুহ, কালীপদ চক্রবর্তী ও নিরঞ্জন রায়।
টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস একই বিল্ডিংয়ে। বিপ্লবীরা প্রথমে টেলিফোন অফিসে ঢুকলেন। দেখেন, একজন কর্মচারী টেলিফোন অফিসে বসে অপারেটরের কাজে ব্যস্ত। অপারেটরের নাম—জনাব আহম্মদউল্লা। বিপ্লবীরা ক্লোরোফর্মের রুমাল তাঁর নাকে চেপে ধরেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। বিপ্লবীরা তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন।
পরিকল্পনা অনুসারে বিপ্লবীরা টেলিফোনের তার কাঁচি দিয়ে কেটে দিলেন। হাতুড়ির ঘায়ে ভাঙ্গলেন টেলিফোনের যন্ত্র। তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। এ সময় টেলিগ্রাফের ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর ঘরের দিক থেকে রাতের অন্ধকার ভেদ করে গুলির শব্দ ভেসে এলো। অম্বিকা চক্রবর্তী গুলির জবাব গুলিতেই দিলেন। দেখতে দেখতে টেলিফোন ঘর দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।
এবার টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করার পালা। টেলিফোন অফিসের ধ্বংসলীলার প্রচণ্ড শব্দে টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মীরা আতঙ্কিত। তাই কর্মীরা অফিসের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। বিপ্লবীরা আঘাতের পর আঘাত করে টেলিগ্রাফ অফিসের দরজা খুলে ফেললেন। অম্বিকা চক্রবর্তী রিভলবার দেখিয়ে কর্মীদের জব্দ করলেন। বিপ্লবীরা টেলিগ্রাফের যন্ত্রগুলি হাতুড়ির আঘাতে নিমেষে চুরমার করে দিলেন। তারপর পেট্রোল ঢেলে টেলিগ্রাফ অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।
টেলিফোন ভবন ধ্বংস করে বিপ্লবীরা মোটরগাড়িতে চাপলেন। এবং পুলিশ অস্ত্রাগার অভিমুখে রওনা দিলেন। বিনা রক্তপাতে বিপ্লবীরা টেলিফোন ভবন আক্রমণ ও ধ্বংস

করতে সক্ষম হলেন।

রাত ৯ টা ৫৫ মিনিট। পরিকল্পনা মতো পুলিশ আক্রমণকারী দলের সঙ্গে পথিমধ্যে মাস্টারদার সাক্ষাৎ হলো। বিপ্লবীরা গাড়ি থেকে নামলেন। গণেশ ঘোষের কমাণ্ডে বিপ্লবীরা মিলিটারি কায়দায় মাস্টারদাকে অভিবাদন করলেন। মাস্টারদা স্যালুট গ্রহণ করলেন।

মাস্টারদার পরনে মালকোঁচা দেওয়া ধুতি। পায়ে কাপড়ের সাদা জুতো। গায়ে খদ্দরের লম্বা কোট। বুকে-পিঠে জরির কাজ করা ভেলভেটের কালো ব্যাজ। এ ছাড়া উজ্জ্বল ধাতু দিয়ে তৈরি একটি বিশেষ ডিজাইনের মেডেল তাঁর বুকে লাগানো।

চট্টগ্রাম শহরের পুলিশ অস্ত্রাগারটি একটি টিলার ওপর অবস্থিত। বিপ্লবীদলের গাড়িটির টিলার নিচে এসে থামলো। তাঁরা দেখলেন, একজন টহলরত সেপাই কাঁধে রাইফেল নিয়ে অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছে। রাইফেলে সঙ্গিন চড়ানো।

এখানে মোট ছ'জন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত। একজন রাইফেল কাঁধে অস্ত্রাগারে পায়চারি করছে। অপর পাঁচজন অস্ত্রাগারের বারান্দায় বসে রামায়ণ পড়ছে। সামনে জ্বলছে হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলো। রাইফেলগুলো তাদের পাশে রাখা।

বিপ্লবীরা মোটর গাড়ি থেকে নেমে, খাড়া দশ-বারো ফিট পাকা সিঁড়ি বেয়ে—টিলার ওপর উঠে গেলেন। উচ্চ সামরিক পোশাক পরিহিত অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে দেখে শান্ত্রী ভেবেছে– বড় অফিসার অস্ত্রাগার পরিদর্শনে এসেছেন। তাই সেপাইটি আগন্তুকদের কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। রক্ষী রাইফেল নামিয়ে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে অভিবাদন করলো। সিপাইটির নাম—রমণী চক্রবর্তী।

এ সুযোগে প্রহরীকে লক্ষ্য করে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ একসঙ্গে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি দুটি সেপাইটির বুক ভেদ করে চলে গেলো। প্রহরী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

রামায়ণ পাঠরত সেপাইরা হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। দেখতে পেলো—আক্রমণকারীরা গুলি করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিরুপায় হয়ে সান্ত্রীরা রাইফেল ফেলে প্রাণ নিয়ে পালালো।

এ আক্রমণে দু'জন কনস্টেবল আহত হয়। একজনের নাম জয়স্মরণ। অন্যজনের নাম শীতলপ্রসাদ দুবে।

শীতলপ্রসাদের ডিউটি ছিল না। গুলির শব্দ শুনে পুলিশ-ব্যারাক থেকে অস্ত্রাগারের দিকে শীতলপ্রসাদ ছুটে আসছিল।

পুলিশ অস্ত্রাগারের পেছন দিকে পুলিশ-ব্যারাক। ব্যারাকে আনুমানিক পাঁচ শ পুলিশ থাকে।

বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন। উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিলেন—'বন্দে মাতরম্, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ইত্যাদি ধ্বনিতে রাতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুললেন।

পুলিশ অস্ত্রাগারের কাছকাছি ঘন জঙ্গল। দলের নির্দেশ মতো আক্রমণের আগে প্রায় ত্রিশজন বিপ্লবী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন।

স্লোগান শুনে জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা বুঝলেন—বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগার অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন।

পরিকল্পনা মতো পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে ন'ব্যাটারির বড় টর্চের আলো জ্বেলে জঙ্গলের দিকে বিশেষ সঙ্কেত দেখানো হলো।

সঙ্কেত পেয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবীরা স্লোগান দিতে দিতে পুলিশের অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে আসছেন। বিপ্লবীদের স্লোগানে বনভূমি যেন কাঁপছে।

ভেঙ্গে গেলো রাতের নিস্তব্ধতা।

প্রথম জয়ের পর আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগারে এসে তাঁদের সাথীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বিপ্লবীদলের শক্তি বেড়ে গেলো। কয়েকজন বিপ্লবী টর্চ হাতে অস্ত্রাগারের চারপাশে পাহারায় মোতায়েন রইলেন। শত্রুর গতিরোধ করার জন্য তাঁরা বারবার টর্চের আলো ফেলে দেখছেন।

গোলাগুলির আওয়াজ আর বিপ্লবীদের স্লোগানের ধ্বনি শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যারাকের পুলিশেরা ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

অস্ত্রাগারের দরজায় বড় বড় তালা ঝুলানো। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের তালা ভাঙ্গার জন্য সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে গেছেন। প্রথমে তাঁরা তালার ওপর বড় বড় হাতুড়ির ঘা দিতে লাগলেন। দীর্ঘদিনের কসরত করা বাহুর সজোর আঘাতে তালাগুলি ঝনঝন শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো।

অস্ত্রাগারের দরজা খোলার পর বিপ্লবীরা কি রকম আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তা অনন্ত সিংহ 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' (প্রথম খণ্ড) বইতে লিখেছেন (পৃঃ ৯৩) :

"খুব সহজেই দু-চার মিনিটের মধ্যে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন কক্ষের দরজা ভাঙা শেষ হল। দরজা উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে সাজানো মাস্কেট্রী (পুলিশ রাইফেল) ও রিভলবারের প্রতি বিপ্লবী যুবকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। কি অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের কতদিনের স্বপ্ন আজ সফল হল! সেইদিন আমরা যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম সেইরূপ আনন্দ জীবনে আর কোনদিন পাইনি। পুলিশ লাইনের সব অস্ত্রের অধিকারী আজ আমরা! আনন্দে উল্লাসে সকলেই আত্মহারা—অনেকে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো!"

এ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গণেশ ঘোষের কমাণ্ড শোনা গেলো—'কম্পানি-ফল-ইন!'

গণেশ ঘোষের কমাণ্ড শুনে বিপ্লবী তরুণেরা সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রত্যেককেই একটি রাইফেল ও রিভলবার তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে কার্তুজ দেওয়া হলো। বিপ্লবী সৈনিকের রাইফেল ছুঁড়তে জানেন না। তবে তাঁরা সকলেই বন্দুক ও রিভলবার ছোড়ায় সিদ্ধহস্ত।

এবার বিপ্লবীদের রাইফেল চালনা শিক্ষার পালা।

গণেশ ঘোষ একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রাইফেল চালনার কলাকৌশল সম্বন্ধে বিপ্লবী সৈনিকদের কাছে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলেন। রাইফেল হাতে নিয়ে কিভাবে রাইফেলে কার্তুজ ভরতি করতে হয়, কিভাবে ফায়ার করতে হয় ইত্যাদি তিনি প্রত্যেককে শিখিয়ে দিলেন। তাঁর নির্দেশে বিপ্লবীরা ওপর দিকে তিনবার রাইফেল ফায়ার করলেন।

মাস্টারদা বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন। কিন্তু বৃটিশ ইউনিয়ন

জ্যাক পায় কোথায় ? রাতে ইউনিয়ন জ্যাক নামানো থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুজি পড়ে গেলো। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে তা পাওয়া গেলো।

ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেলার পর বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগারে জাতীয় পতাকা তুললেন। বিউগল বেজে উঠলো। গণেশ ঘোষের আদেশে বিপ্লবী সৈনিকেরা একসঙ্গে তিনবার রাইফেল আকাশের দিকে ফায়ার করলেন।

আবার বিউগল বেজে উঠলো। বিপ্লবীরা রণধ্বনি দিলেন—'বন্দে মাতরম্।' 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।' 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'।

গণেশ ঘোষের নির্দেশে বিপ্লবী যুবকেরা অস্ত্রাগার ঘিরে ফেললেন। তারপর শুয়ে রাইফেল হাতে অস্ত্রাগারটি পাহারায় নিযুক্ত হলেন।

এবার অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, সরোজ গুহ, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, হিমাংশু সেন ও হরিপদ মহাজন গেলেন—প্রহরী রমণী চক্রবর্তীর মরদেহের কাছে। বিপ্লবীরা প্রহরীর নাম জানেন না। তিনি একজন ভারতীয়। তাই তাঁকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিলেন।

এরপর পুলিশ অস্ত্রাগারে এসে যোগ দিলেন স্বদেশ রায়। স্বদেশ এসেছে স্বদেশপ্রেমের দাবি নিয়ে। উপস্থিত বিপ্লবীরা স্বদেশকে দেখে আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন—'স্বদেশ রায় কি জয়।'

বিপ্লবীরা স্বদেশ রায়ের হাতে রাইফেল, রিভলবার ও কার্তুজ তুলে দিলেন। স্বদেশ ভালো বন্দুক চালাতে জানেন। তাই তাঁর পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে রাইফেল চালনা শিখে নিতে খুবই সহজ হলো।

তারপর টেলিফোন ভবন আক্রমণকারী দলটি পুলিশ অস্ত্রাগারে এসে মিলিত হলেন। তাঁদের হাতেও অনুরূপ অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলটি পুলিশ অস্ত্রাগারে চলে আসার কথা। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত। নেতারা চিন্তিত। ভাবছেন, বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে হয়তো আর কেউ বেঁচে নেই। পুলিশ অস্ত্রাগার থেকে মেঠোপথে ইউরোপীয়ান ক্লাবের দূরত্ব মাত্র তিন শ গজ। কেন যে ক্লাব আক্রমণকারী দলটি এতোক্ষণে ফিরে এলো না তা নিয়ে নেতাদের উৎকণ্ঠা সীমাহীন।

নেতাদের চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নির্বাচিত দলটি মোটর গাড়ি নিয়ে পুলিশ অস্ত্রাগারে এসে পৌঁছলেন। দলের সকলেই ম্রিয়মাণ। কারো মুখে কোন কথা নেই।

মাস্টারদা নরেশ রায়ের কাছে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের খবর জানতে চাইলেন।

নরেশ রায় বললেন, "আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি।"

মাস্টারদা নরেশের কাছে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। নরেশ রায় মাস্টারদাকে যা শুনালেন তা হলো—তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবীদলটি রাত ১০টায় ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে দেখেন—হলঘর ফাঁকা। ক্লাবের প্রতিটি ঘর তাঁরা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কোথাও একটি সাহেব নেই। ক্লাবে কজন বয় ও বাবুর্চি রয়েছে। বিপ্লবীদের হাতে পিস্তল, বোমা, বন্দুক, তরবারি ও কুড়ুল দেখে তারা ভয়ে থরথর

করে কাঁপছে।

বিপ্লবীরা বাবুর্চিদের কাছে জানতে পারলেন, ১৮ এপ্রিল গুড্-ফ্রাইডে। খ্রীষ্টানদের শোকের দিন। এ দিনটি যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ইংরেজ সাহেবেরা ক্লাবে আসেননি।

গুড্-ফ্রাইডের জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়া গেলো না। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের রক্তে হোলি খেলবেন। সাহেবদের রক্তে চট্টগ্রামে রক্তগঙ্গা বয়ে দেবেন।

বিধি বাম। সবল দেহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পাঁচজন যুবক—নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেন ও অমরেন্দ্র নন্দী হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। মাস্টারদা তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। তাঁরাও রাইফেল হাতে তুলে নিলেন।

রাত ক্রমে বেড়ে চলেছে। অন্ধকারের বুক চিরে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা কে যেন পুলিশ অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রহরারত একজন বিপ্লবী সৈনিক হাঁক দিলেন—"দাঁড়াও! হাত তোল!"

কালীকিঙ্কর দে হাত তুলে দাঁড়ালেন। সৈনিকটি তাঁর পরিচয় জানালেন। তারপর তিনি দলে এসে যোগ দিলেন।

কালীকিঙ্কর মাস্টারদার নির্দেশে গিয়েছিলেন অর্ধেন্দু গুহ এবং আরো ক'জনের সঙ্গে দেখা করে রাত দশটা পর্যন্ত প্রচারপত্র বিলি বন্ধ রাখার খবর দিতে। এ গুরুদায়িত্ব পালন করে তিনি জেলা কংগ্রেস অফিসে ফিরে এলেন। দেখেন, কংগ্রেস অফিস জনমানব শূন্য। ক-খানা সাইকেল এদিকে-সেদিকে পড়ে আছে।

কালীকিঙ্কর দে পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণকারী একটি দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থল তাঁর জানা। তাই তিনি ছুটলেন পুলিশ-লাইনে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণকারী দল এবং ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দল দুটি পুলিশ-লাইনে এসে গেছেন। পরিকল্পনা মতো অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি এ সময়ের মধ্যে চলে আসার কথা।

পুলিশ অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের বর্তমান হেডকোয়ার্টার। মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলেন, কেন অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটি এখনও এলো না। বিপদে পড়েনি তো?

রাত প্রায় দশটা। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার আক্রমণকারী ছ'জনের দলটি একটি মোটর গাড়ি নিয়ে অস্ত্রাগারের সাইড্-গেটে হাজির।

এ দলটি নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে। গাড়িটিতে আছেন—নির্মল সেন, লোকনাথ বল, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী ও জীবন ঘোষাল। গাড়ি চালাচ্ছেন জীবন ঘোষাল (মাখন)।

দশটার কয়েক মিনিট আগে চারজন বিপ্লবী অস্ত্রাগারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের গেটের কাছাকাছি পরিকল্পনা মতো লুকিয়ে আছেন। বিপ্লবীদের গাড়ি গেটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে

আত্মগোপনকারী বিপ্লবী একজন এসে ফটক খুলে দিলেন। গাড়ি অস্ত্রাগারের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়লো।

অস্ত্রাগার রক্ষী হাঁক ছাড়লো—'Halt, who comes there ?'

লোকনাথ বল চেঁচিয়ে বললেন, 'Friend'.

গাড়ি থেকে নেমেই লোকনাথ বল অস্ত্রাগারের বারান্দায় উঠলেন। তারপর রাইফেলধারী সান্ত্রীকে এগিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন। অস্ত্রাগারে রাইফেলধারী ক'জন পাঠান প্রহরী মোতায়েন।

লোকনাথ বলের পরনে উচ্চ ইংরেজ সামরিক অফিসারের পোশাক। তাঁর ডাক শুনে, একজন প্রহরী এগিয়ে এসে তাঁকে অভিবাদন করলো।

এ সুযোগে লোকনাথ বল বাঁ-হাতে সান্ত্রীর রাইফেল চেপে ধরলেন। ডান হাতে প্রহরীর বুকে রিভলবার তাক করে পালিয়ে যেতে বললেন।

লোকনাথ বলের কথা গ্রাহ্য না করে প্রহরী হেঁচকা টানে রাইফেল ছিনিয়ে নিলো। নিরুপায় হয়ে গুলি করলেন তিনি। দীর্ঘকায় পাঠান সৈনিকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

অন্য প্রহরীরা গুলি ছোড়ার আগে বিপ্লবীরা একসঙ্গে গুলি করতে করতে প্রহরীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রহরীরা তাদের রাইফেল থেকে ফায়ার করার সুযোগ পেলো না। তারা রাইফেল ফেলে পালালো।

অস্ত্রাগারের খুব কাছেই অস্ত্রাগারের অধিকর্তা ইংরেজ ফৌজী অফিসার মিঃ ফেরেলের বাসা। এ বিষয়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায়—স্বাধীনতা সংখ্যায় 'স্বাধীনতার প্রথম আলো' প্রবন্ধে লোকনাথ বল লিখেছেন ঃ

"...আমাদের প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেণ্ট মেজর ফেরেল তার ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অস্ত্রাগারের রক্ষীকে ডাকল।

আমি তাকে হুঁশিয়ার করে বললাম, 'আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর সভ্য। আমাদেব নেতার হুকুমে অস্ত্রাগার দখল করছি। তুমি যদি আমাদের কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা কর, তা হলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।'

আমার কথা শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনতিবিলম্বে আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলবার নিয়ে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। তার স্ত্রী তখন আমার কাছে তাঁর এবং তাঁব শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন।

আমি তাঁকে বললাম, "আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনাব স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমরা তাঁকে হুঁশিয়ার করেছিলাম। আপনি নির্ভয়ে ঘরের ভিতর যান. কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না'।"

এখানেই সংগ্রামের শেষ নয়। এবার অস্ত্রাগারের নিরেট লোহার দরজা ভাঙার পালা। পরপর দুটি লোহার দরজা ভাঙলেই বিপ্লবীদের অনেকদিনের স্বপ্ন সার্থক হবে। তারপর তাঁরা পাবেন রাইফেল, লুইসগান ও রিভলবার।

বিপ্লবীরা জাহাজ বাঁধার দড়ির একপ্রান্ত বাঁধলেন অস্ত্রাগারের প্রথম দরজার হাতলের সঙ্গে।

জীবন ঘোষাল মোটর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটু এগোতেই লোহার দরজা খুলে গেলো।
অস্ত্রাগারের দ্বিতীয় দরজাটা লোহার বোল্টের। লোকনাথ বল ও রজত সেন আলোচনা করে স্থির করলেন, দুজনে দূর থেকে ছুটে এসে সজোরে লোহার বোল্টের দরজায় ধাক্কা দেবেন। করলেনও তাই। দরজা ঝনঝন শব্দে তাঁদের কাছে হার স্বীকার করে নিলো।
দরজা খোলার পর বিপ্লবীরা দেখতে পেলেন, আগ্নেয়াস্ত্র গুলি থরে থরে সাজানো। প্রত্যেকে রাইফেল ও রিভলবার তুলে নিলেন। তাঁদের আনন্দ আর ধরে না।
পলকেই বিপ্লবীদের মন বিষাদে ভরে গেলো। অস্ত্রাগারে অস্ত্র পেয়েছেন অঢেল। কিন্তু একটি কার্তুজও পাননি তাঁরা। দুঃখ রাখার জায়গা নেই তাঁদের।
চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের নেতারা কেউ সামরিক শিক্ষা পাননি। সামরিক নীতি অনুযায়ী একঘরে আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে কার্তুজ থাকে না। সমর বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ। তারই ফল তাঁরা হাতে-হাতে পেলেন।
অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগারে চারশ ম্যাগাজিন রাইফেল বিপ্লবীরা পেলেন। তার গুলির পাল্লা এক হাজার গজের ওপর। এতে একসঙ্গে দশটা টোটা ভরতি করা যায়। তা ছাড়া পেলেন পাঁচটি মেসিনগান আর অনেক রিভলবার।

Auxiliary Force of India হলো—ভারতে অবস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক ইংরেজ বৃটিশ সরকারের ভারতীয় Regular সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পুলিশ অস্ত্রাগারের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন।
পুলিশ অস্ত্রাগারের Musketry রাইফেলের গুলির পাল্লা মাত্র দুশো গজ। অক্সিলিয়ারি ফোর্স গঠনের উদ্দেশ্য—ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তা হলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ইংরেজেরা তা শক্ত হাতে দমন করবেন।
সার্জেণ্ট ব্লাকবার্ণ অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারের কাছে এক বাংলোয় থাকেন। অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় তিনি মিঃ কুলন ও আরো দু'জন জাহাজের অফিসার ট্যাক্সি করে পাহাড়তলী ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। তিনি অস্ত্রাগারের গেটে এসে দেখলেন, বেশ কয়েকটি টর্চ জ্বলছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, "কে তোমরা ?"
এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হলো গুলি। ব্যর্থ হলো। তিনি নায়েক বাগদাদ সাহাকে ডাকলেন।
এ সময়ের মধ্যে গুলিতেই উত্তর এলো। কেননা বাগদাদ সাহা পালিয়ে বেঁচেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সাহেবেরা প্রাণ নিয়ে পালালেন। কিন্তু মিঃ কুলন পালাতে পারলেন না। তিনি ট্যাক্সি থেকে নেমে মাটিতে শুয়ে রাতের অন্ধকারে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেলেন ঝোপের আড়ালে।
অস্ত্রাগারের দরজা খোলার পর অস্ত্রাগারের ভেতর থেকে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র বাইরে এনে স্তূপীকৃত করা হলো।
এর পর আসরে অবতীর্ণ হলেন—সার্জেণ্ট মোর্শেদ। তিনি সাইকেলে পাহাড়তলীর রাস্তা দিয়ে চলেছেন। দেখতে পেলেন, অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারের বারান্দায় খাকী পোশাকে সাত-আটজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের একজনকে ক্যাপ্টেন টেট মনে করলেন তিনি

তিনি প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেন। দু'জন বন্দুকধারী বিপ্লবী তাঁকে মাথার ওপর হাত তুলতে নির্দেশ দিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করলেন। বিপ্লবীদলের একজন গুলি করতে হুকুম দিলেন। ইংরেজী উচ্চারণে বাংলা টান শুনে তাঁর হুঁশ হলো—এ মিঃ টেট নন।

নির্দেশ মতো তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হলো। গুলি তাঁর গায়ে লাগলো না। বুঝলেন, জীবন-সংকটাপন্ন। তিনি চোঁচা দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

যিনি গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি হলেন—জেনারেল লোকনাথ বল।

অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের দখলে। এ খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন টেট একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে অস্ত্রাগারের সীমানার বাইরে এসে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত লোকনাথ বলের রণকৌশলের কাছে হার মেনে তিনি বীরদর্পে পশ্চাদপসরণ করলেন।

মামলার সময় ক্যাপ্টেন টেটের দলের একজন সাক্ষী কি বলেছেন দেখা যাক ঃ

"Then we stood up on the verandah on both sides. I was on the verandah facing the road. I heard Lokenath challenging saying 'Halt'. Then I heard a Saheb's voice, 'Bengali dog, halt' !"

আক্রমণকারী বিপ্লবী প্রত্যেক দলের ওপর নির্দেশ ছিল কাজ শেষ করে পুলিশ অস্ত্রাগারে ফিরে আসার।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট। এখনও অক্সিলিয়ারি ফোর্স আক্রমণকারী দলটি ফিরলেন না। তাই অনন্ত সিংহ, মনোরঞ্জন সেন, হরিগোপাল বল ও হিমাংশু সেন একটি মোটর গাড়িতে করে অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁদের সঙ্গে নিলেন—রাইফেল ও রিভলবার।

অনন্ত সিংহ অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারে পৌঁছে দেখেন, বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছেন। তিনি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন। পরে জানতে পারলেন, একটি কার্তুজও তাঁরা পাননি। এ খবর শুনে তিনি বোবা হয়ে রইলেন।

নির্দেশ মতো বিপ্লবীরা দুটি মোটর গাড়িতে অনেক গুলি রাইফেল ও দুটি লুইসগান বোঝাই করলেন। অবশিষ্ট স্তূপীকৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলো হাতুড়ির ঘা দিয়ে অকেজো করে ফেললেন। তারপর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। অস্ত্র ও অস্ত্রাগার একসঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো।

আগুনের লেলিহান শিখায় রাতের অন্ধকার বহুদূর পর্যন্ত সরে গেলো। বিপ্লবীরা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে লাগলেন।

বিপ্লবীদের মোটরগাড়ি দুটি পুলিশ লাইনের দিকে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় হেড্‌লাইট্ জ্বালিয়ে একটি মোটরগাড়ি অস্ত্রাগারের দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। রাইফেল উঁচিয়ে বিপ্লবীরা গাড়টাকে থামবার নির্দেশ দিলেন। কে আসছে জানতে চাওয়া হলো। কোন জবাব এলো না।

এর আগে আরো কয়েকটি মোটরগাড়ির আরোহী বিপ্লবীদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করার জন্য তাঁরা গুলি করেছেন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

এ গাড়িতে আসছিলেন চট্টগ্রামের জেলা শাসক মিঃ উইলকিন্সন। বিপ্লবীদের গুলিতে

বিদ্ধ হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালী জরাসিন্ধু বড়ুয়া গাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মিঃ উইলকিন্সন গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। ড্রাইভার বীরমনকে বিপ্লবীরা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন।

চরম উত্তেজনার মধ্যে বিপ্লবীরা ড্রাইভারের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট কোথায় গেলেন জানতে চাইলেন। নতুবা তাকে গুলি করা হবে। বলতে বলতে গুলি বের হয়ে গেলো। বীরমনের বুকের বাঁ-পাশের মাংস ঘেঁষে গুলি বের হয়ে গেলো। আর একজন বিপ্লবী ড্রাইভারকে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত। এমন সময় অনন্ত সিংহ এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ধমক দিয়ে নিরস্ত করলেন। ড্রাইভার বেঁচে গেলো।

অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণে ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছে মোট ছ'জন।

মামলার রায়ে লেখা আছে ঃ

"Among the Europeans who had come us was Dr. Weldone, Chief Medical Officer of the Assam Bengal Railway. In the armoury compound and on the road adjoining it were six corpse."

অক্সিলিয়ারি ফোর্স আক্রমণকারী দলও পুলিশ-লাইনে এসে একত্রিত হলেন। এ পর্যন্ত বিপ্লবীদের কেউ হতাহত হননি। যখন শুনলেন, অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারে একটি কার্তুজও পাওয়া যায়নি তখন মাস্টারদা একেবারে চুপ। কেবল পায়চারি করছেন তিনি।

গণেশ ঘোষের প্রচণ্ড জ্বর। চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। তিনি অস্ত্রাগারের একটি ঘরের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন। এ খবর শুনে তড়াক করে উঠে বসলেন।

বিপ্লবী নেতারা সকলে বিচলিত। পরিকল্পনা ছিল ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইস্‌গান অধিকার করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এখন সবই পণ্ড হয়ে গেলো। উপায় ?

এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নেতারা দিশেহারা। এদিকে বিপ্লবী যুবকদের আনন্দ সীমাহীন। তাঁরা জানেন না মাস্কেট্রি রাইফেল ও ম্যাগাজিন রাইফেলের গোলাগুলির পাল্লার তফাৎ।

ইতিমধ্যে হঠাৎ অন্ধকারের বুক ভেদ করে অবিশ্রান্ত লুইসগানের গুলি পুলিশ অস্ত্রাগারের দিকে ছুটে আসছে।

ট্যাট্ ট্যাট্ ট্যাট্ শব্দে কোথা থেকে গুলি ছুটে আসছে। প্রথমে বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ বুঝতে পারলেন না গুলি কোথা থেকে আসছে। বিপ্লবীরা মাটিতে শুয়ে পড়লেন।

পুলিশ-লাইনের কাছেই চট্টগ্রাম শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কেন্দ্রীয় জলকল। এটি চট্টগ্রাম শহরের খুব উঁচু জলাধার। তার ওপর থেকে শত্রুপক্ষ গুলি করছে। একটু পরে বিপ্লবীরা গুলির শব্দ শুনে তা বুঝতে পারলেন।

বিপ্লবীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো—"মিউনিসিপ্যালিটির জলাধার লক্ষ্য করে দ্রুত গুলি চালাও।"

তিন-চার মিনিট উভয় পক্ষে একটানা গুলি বিনিময় হলো। এ খণ্ডযুদ্ধে বিপ্লবীরা গুলি

ছুঁড়েছেন প্রায় চারশ। লুইসগান থেকে ফায়ার হয়েছে ১৪১ রাউণ্ড। কোন পক্ষেই আহত হয়নি।

শত্রুপক্ষের গুলি বন্ধ হবার পর বিপ্লবীরাও গুলি বন্ধ করলেন। এ লুইসগানটি চট্টগ্রাম বন্দরের জেটি থেকে এনে শত্রুপক্ষ গুলি করেছে।

বিপ্লবীরা ভাবলেন শত্রুরা ভেগেছে। মাস্টারদার নির্দেশে সকলে অস্ত্রাগারের মাঠে সমবেত হলেন। প্রজাতন্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি স্বাধীন সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

ইংরেজীতে লেখা একটি ঘোষণাপত্র মাস্টারদা দেশের জনগণের উদ্দেশ্যে পাঠ করলেন। ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু হলো - বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতিআক্রমণ আসন্ন। দেশবাসীরা এ স্বাধীন সরকারকে যাতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। তারজন্য তিনি আবেদন জানান।

ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ হলো। স্বাধীন সরকারের প্রতি সম্মান ও সর্বাধিনায়ককে অভিবাদন জানানোর জন্য বিউগল বেজে উঠলো। তিনবার রাইফেলের গুলি ছুঁড়া হলো।

মাঠে যখন সব বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় দ্বিতীয়বার মেসিনগান গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা মাঠে শুয়ে পড়লেন। বিপ্লবীরা গুলিতেই তার প্রত্যুত্তর দিলেন। বৃষ্টি ধারায় গুলি বিনিময় হলো।

সাহেবদের মেসিনগানের কার্তুজ ফুরিয়ে গেলো। সাহেবেরা ভাবলেন, বিপ্লবীরা হামাগুড়ি দিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে ফেলতে পারেন, সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ সাহেবেরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। যুদ্ধ থেমে গেলো। এ পর্যন্ত বিপ্লবীদের এক বিন্দুও রক্তপাত হয়নি।

মাস্টারদা অনন্ত সিংহকে বললেন, "মেসিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেট্রি কি করতে পারবে ?"

অনন্ত সিংহ নীরব। অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারে একটাও কার্তুজ না পেয়ে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। প্রত্যেক নেতারা উৎকণ্ঠিত।

নেতারা স্থির করলেন, যতো আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নেওয়া হোক। তারপর অবশিষ্ট আগ্নেয়াস্ত্রগুলি হাতুড়ির আঘাতে চুরমার করে পেট্রোল দিয়ে অস্ত্রাগারে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।

বিপ্লবীরা টিলার নিচে নেমে এলেন। হিমাংশু সেন অস্ত্রাগারে পেট্রোল ছড়িয়ে দিলেন। আনন্দের আতিশয্যে পেট্রোল ছড়াতে গিয়ে তাঁর পোশাকে পেট্রোল পড়ে ভিজে গেছে তা খেয়াল করতে পারেননি তিনি। অস্ত্রাগারের আগুন লাগানোর সময় দপ্ করে তাঁর গায়েও আগুন লেগে গেলো।

আগুন নেভানো হলো। কিন্তু হিমাংশুর দেহে পোড়ার ক্ষত গুরুতর।

এ পরিস্থিতিতে হিমাংশুকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই স্থির হলো। একটি মোটর-গাড়িতে ক'জন বিপ্লবী হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। গাড়িতে আছেন—অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল, আনন্দ গুপ্ত ও হিমাংশু সেন।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের ধারণা, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম শহরের কাছারি

পাহাড়ে সশস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করবেন। তাই গণেশ ঘোষের দোকানের কাছাকাছি মকলেশ্বর রহমানের রেস্তোরাঁতে চৌষট্টি জনের খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল।

মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন বিপ্লবীদের সার্বিক প্ল্যানটি জানেন। তাঁরা প্রধান দলে আছেন।

সার্বিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ছিল—জেলখানা অধিকার করে বন্দীদের মুক্তি প্রদান। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক দখল করা। কোর্টমার্শাল আদালত স্থাপন ইত্যাদি।

পরপর দু'বার মেসিনগানের গুলি চলার ফলে বিপ্লবীদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিকল্পনা বুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেলো।

প্রধান দলের নেতারা ভাবছেন, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দলটি হিমাংশুকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন।

প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলো। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দলটি ফিরে এলেন না।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মারকগ্রন্থে (১৮ এপ্রিল) গণেশ ঘোষ লিখেছেন ঃ

"সুতরাং অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত আহত হিমাংশু সেনকে নিয়ে একখানা গাড়ি করে মিউনিসিপ্যালটির জলের ট্যাঙ্কের পাশ্ববর্তী সোজা পথে না গিয়ে ঘুরে চট্টেশ্বরী কালীবাড়ির পথেই এগিয়ে গেলেন ; সমগ্র বিপ্লবী বাহিনী তাঁদের পেছনে পেছনে ঐ চট্টেশ্বরী কালীবাড়ির পথেই কাছারি পাহাড়ে যাবে।

কিন্তু এই সময়ে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হল। যার ফল হল মারাত্মক ; যার ফলে ঘটে গেল অপূরণীয় ক্ষতি।"

মেসিনগান চালিয়ে ইংরেজরা পুলিশ-লাইনে পরপর দু'বার বিপ্লবীদের ওপর আক্রমণ করেছে। প্রতিবারই বিপ্লবীরা জয়ী হয়েছেন। বিপ্লবীরা জয়ী হলেন বটে, কিন্তু মনোবল হারিয়ে ফেললেন তাঁরা।

বিপ্লবীদের প্রধান দলটি আশা করেছিলেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের ছোট দলটি হিমাংশুকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে পুলিশ লাইনে যথাসময়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে তবুও তাঁরা ফিরলেন না।

মাস্টারদা ভাবলেন, শত্রুপক্ষ যথেষ্টভাবে সংগঠিত হয়েছে। মেসিনগানের বিরুদ্ধে মাস্কেট্রি রাইফেল কোন কাজ করবে না।

মাস্টারদা অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন-এর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, 'গেরিলা' পদ্ধতিতে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই তাঁরা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

মাস্টারদা অম্বিকা চক্রবর্তীকে বললেন, "আপনি পাহাড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আমাদের পাহাড়শ্রেণীতে নিয়ে চলুন। সেখান থেকে আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাবো।"

অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগার আক্রমণকারী বিপ্লবীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে জেলা-শাসক

মিঃ উইলকিন্‌সন ও ক্যাপ্টেন টেট রেল-স্টেশনে গিয়ে একটি রেল-ইঞ্জিন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নিলেন। রেল-ইঞ্জিনে করে তাঁরা জাহাজঘাটার জেটি অস্ত্রাগারে গেলেন। সেখান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি সুসজ্জিত দল অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারে পাঠালেন।

তারপর জেলাশাসক নদীতে অপেক্ষমান একটি জাহাজে গেলেন। জাহাজে গিয়ে তিনি বেতারে চট্টগ্রাম শহরের সংবাদ পাঠালেন।

এদিকে খবর পেয়ে চট্টগ্রামের জেলা সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার অক্সিলিয়ারি ফোর্স অস্ত্রাগারে এসে দেখলেন, অস্ত্রাগার আক্রান্ত। তাঁরা মোটরগাড়ি নিয়ে তীরবেগে ছুটলেন পাহাড়তলী অস্ত্রাগারের উদ্দেশ্যে। পথে তাঁরা কয়েকজন ইংরেজদের জড়ো করলেন। এবং মিঃ ব্ল্যাকবার্ণ ও মিঃ জনসন ব্যারাক্‌লোকে পাহাড়তলী অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র বের করতে নির্দেশ দিলেন।

ইংরেজেরা প্রতিআক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙ্গে দিলো। বিদ্রোহীরা আম্বিকা চক্রবর্তীকে অনুসরণ করে পাহাড়ের পথে পা বাড়ালেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবীদলের প্রধানবাহিনী শহরে এখনো প্রবেশ করেননি বুঝতে পেরে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ চিন্তিত হলেন।

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও জীবন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি পুলিশ-লাইনের দিকে ছুটলো। তাঁরা দেখলেন, পুলিশ অস্ত্রাগার দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনের লেলিহান শিখার আলোকে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিপ্লবীদলের প্রধান বাহিনীর দেখা নেই।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ভাবলেন, প্রধানবাহিনী হয়তো পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছেন। তাই তাঁরা গাড়ির হেড-লাইট জ্বালিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ি ধীর গতিতে চালাতে লাগলেন। তাঁদের আশা, প্রধান দলের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যেতে পারে। বিপ্লবীবাহিনী অনন্ত সিংহের গাড়ি দেখতে পেয়ে, শত্রুর গাড়ি ভেবে মাঠে শুয়ে রাইফেল হাতে পজিশন নিলেন।

বিধাতা বিমুখ। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের সঙ্গে প্রধান দলের মিলন ঘটলো না। বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা শহরে ফিরে এলেন। গাড়ি রেখে তাঁরা নৌকোয় করে পতেঙ্গা গেলেন। সেখানে গণেশ ঘোষের জল-বসন্ত দেখা দিলো।

১৯ এপ্রিল। ভোর হবার আগে প্রধান বিপ্লবীদলটি নাগারখানা পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তাঁরা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বৈশাখের খর তাপে একে একে সকলে জেগে গেলেন। জলের তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লবীরা দিনের বেলা পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকছেন। রাতে পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে শহর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। অভুক্ত। চলার পথে সৌভাগ্যবশতঃ তরমুজ খেত দেখতে পেলে তাঁরা তরমুজ খেয়েছেন।

গভীর রাত। চলতে চলতে বিদ্রোহীরা ফতেয়াবাদ এলাকায় এসে পড়লেন। দলের মধ্যে একজন ফতেয়াবাদের তরুণ আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো 'লাইল্যার হাট' তিনি চেনেন কিনা। এটি ফতেয়াবাদের প্রসিদ্ধ হাট।

'লাইল্যার হাট' যুবকটির জানা। তরুণটিকে সঙ্গে নিয়ে লোকনাথ বল, রজত সেন, নির্মল সেন এবং আরো ক'জন হাটে গেলেন। রাতে হাটটি যেন ঘুমিয়ে আছে।

একজন দোকানদারকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। বিপ্লবীরা দোকানীর কাছ থেকে বিস্কুট পাঁউরুটি, কলা, চিড়া প্রভৃতি কিনলেন। দোকানদার ঝুড়ি ভরতি করে দিলো। দাম মাত্র আঠারো টাকা।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন দোকানদার সেখানে এসে পড়েছে। সকলের সামরিক পোশাক দেখে এবং এতো খাবার একসঙ্গে কিনতে দেখে দোকানদারদের কৌতূহল হলো। দোকানীরা একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করে বসলো।

লোকনাথ বল জানালেন, তাঁরা পুলিশ। ডাকাত ধরার জন্য ইস্কুল মাঠে ক্যাম্প করেছেন। বিপ্লবীরা পরম আনন্দ সহকারে খেলেন। পুকুরে গিয়ে পেট ভরতি জল খেলেন। ভোর হবার আগে তাঁরা পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলেন।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের অনুপস্থিতি মাস্টারদাকে বড়ই পীড়া দিচ্ছে। তাঁর চলার পথ ক্রমে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছল হয়ে উঠছে। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ যেন তাঁর চলার পথে দু হাতের দুটি লাঠি। দুর্গম পথে তিনি বড়ই অসহায় বোধ করছেন।

বিদ্রোহীরা পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া কালীন মাস্টারদা, প্রায় প্রতিদিন দু'জন-একজন করে লোক পাঠিয়েছেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের খোঁজে। তাঁদের খবর নিয়ে কেউ ফিরলেন না। সেনাপতি বিহীন যুদ্ধ করবেন কি করে ? শত-সহস্র প্রশ্ন তাঁর মনের দুয়ারে ভিড় করেছে।

এতোগুলি তরুণ তাজা প্রাণ অন্ধ আবেগে বলি দিতে পারেন না তিনি। এদিকে তরুণদল যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে আছেন।

২১ এপ্রিল। সকাল দশটা। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের খোঁজে মাস্টারদা আবার দু'জন যুবককে শহরে পাঠালেন। ফতেয়াবাদের বাদুল্লা পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম শহরের দূরত্ব প্রায় বারো মাইল।

১৮ এপ্রিল বিকেল থেকে ২১ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের পেটে ভাত পড়েনি। অম্বিকা চক্রবর্তী তরুণদের শুকনো মুখের দিকে আর তাকাতে পারছেন না। তিনি ফতেয়াবাদ গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যুবক ভাইদের আশ্বাস দিলেন—আজ তাঁদের ভাত খাওয়াবেন। এ কথা শুনে বিপ্লবীদের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

ফতেয়াবাদ গ্রামে অম্বিকা চক্রবর্তীর আত্মীয় ও দলের সমর্থক আছেন। তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ি গেলেন। তাঁর লম্বা দাড়ি ও গোঁফ চেঁচে ফেললেন। ফলে তাঁকে এক লহমায় চেনা দায়।

আত্মীয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিলেন। দু'জন যুবককে ষাটজনের মতো খিচুড়ি তৈরি করার ভার দিলেন।

খিচুড়ি রান্না করে সন্ধ্যার পর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ছোট ছোট ভাইদের ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখগুলি অম্বিকা চক্রবর্তীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

বেলা দু'টা। কলা, চিড়ে, চিনি প্রভৃতি কিনে দু'জন বিশ্বস্ত যুবককে সঙ্গে নিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী বাদুল্লা পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছলেন। যুবক দু'জন খাবার নিয়ে পাহাড়ের ধারে অপেক্ষা করছেন। অম্বিকা চক্রবর্তী পাহাড়ে উঠে গেলেন। দু'জন বিপ্লবী যুবককে খাবার-গুলি ওপরে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন তিনি।

ফতেয়াবাদ গ্রাম থেকে ফেরার সময় অম্বিকা চক্রবর্তী একটি দৈনিক সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্য' সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

পত্রিকাটি পেয়ে বিপ্লবীরা ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেলেন। সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারলেন, চট্টগ্রাম শহরে কার্ফু চলছে। বাইরে থেকে প্রচুর ফৌজ এসে পড়েছে। বিদ্রোহীদের খোঁজ পাওয়া যায়নি ইত্যাদি।

খবরের কাগজ পড়ে বিপ্লবীরা আঁচ করলেন, যে কোন সময় শত্রুসৈন্য তাঁদের আক্রমণ করতে পারে। তাই তরুণ বিপ্লবীরা স্থির করলেন, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জীবনীশক্তি ক্ষয় না করে যুদ্ধ করে শহিদ হওয়াই শ্রেয়।

যুবকেরা একবাক্যে মাস্টারদাকে জানালেন, "যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ চাই।"

মৃত্যুর অভিযানে বিপ্লবীরা ছুটে যেতে চান। স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবনকে উৎসর্গ করতে বিপ্লবীদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেলো।

মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী নির্মল সেন ও লোকনাথ বল আলোচনায় বসলেন। স্থির হলো—তাঁরা চট্টগ্রাম শহর আক্রমণ করবেন।

তারপর মাস্টারদা সমস্ত বিপ্লবী সৈনিকদের ডেকে সামনে বসালেন। যুদ্ধ করতে সকলে ইচ্ছুক কিনা জানতে চাইলেন।

বিপ্লবী যুবকেরা রাইফেল উঁচিয়ে বুক টান-টান করে সমস্বরে জবাব দিলেন—"যুদ্ধ চাই।"

মাস্টারদা ফের তাঁদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় দৃশ্যের ছবি আঁকলেন। এ বর্ণনার মধ্যে কেবল রক্তের স্রোতধারা বন্যার আকারে বয়ে গেলো। তারপরও বিপ্লবী যুবকেরা উত্তর দিলেন—"যুদ্ধ চাই।"

বিকেল পাঁচটা। এক চাষী বাদুল্লা পাহাড়ে উঠে এলো। নাম—ওয়েজুদ্দি। ক-জন বিদ্রোহী যুবকের সঙ্গে তার দেখা হলো।

পাহারারত একজন বিপ্লবী চাষীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, সে গরু চরাতে এসেছে। প্রহরী চাষীটিকে ছেড়ে দিলেন।

ফেরার পথে পাহাড়ী এলাকায় হাটাজারি থানার পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টার আবদুল গফুরের সঙ্গে চাষীটির দেখা হয়। তিনি বের হয়েছেন বিদ্রোহীদের খোঁজে।

আবদুল গফুর চাষীটির কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, বাদুল্লা পাহাড়ে সে ক-জন রাইফেলধারী খাকী পোশাকের লোককে দেখেছে। এ খবর চট্টগ্রাম শহরে পাঠানো হলো।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তিমেধা চৌধুরী এখনো শহর থেকে খবর নিয়ে ফেরেননি।

রাত ৮টা। ইতিমধ্যে ফতেয়াবাদ গ্রাম থেকে বড় বড় দু' ঝুড়ি খিচুড়ি অম্বিকা চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় এসে গেছে। ১৮ তারিখ রাত থেকে বিপ্লবীদের পেটে ভাতের দানা পড়েনি।

খিচুড়িগুলি তাঁদের কাছে অমৃত বলে মনে হলো।

অমরেন্দ্র ও দীপ্তিমেধা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদুল্লা পাহাড়ে ফিরতে পারলেন না। তাঁরা যখন বাদুল্লা পাহাড়ে পৌঁছলেন তার আগে প্রধানবাহিনী পাহাড় ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁরা নিরুপায় হয়ে গ্রামে ফিরে গেলেন।

২১ এপ্রিল রাতে বিপ্লবীরা ফতেয়াবাদের বাদুল্লা পাহাড় থেকে চট্টগ্রাম শহরের দিকে মার্চ শুরু করেছেন। দুর্গম পাহাড়ী পথ। কিছুদূর যেতে না যেতেই তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। গতি হয়ে পড়ছে মন্থর।

পথ চলাকালীন বিপ্লবীদলটি রাতে তিনবার বিশ্রাম নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কিছুটা সময় কেউ কেউ নিয়েছেন ঘুমিয়ে। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আছে—একটি রাইফেল, দুটি রিভলবার, কার্তুজ, জলের পাত্র ও মবিল অয়েলের পাত্র ইত্যাদি। এসব নিয়ে প্রায় কুড়ি কেজি ওজন বয়ে চলেছেন।

তেষ্টায় কেউ কেউ গাছের পাতা চিবুচ্ছেন। একজন বিপ্লবী তরুণ জলের অভাবে বন্দুক পরিষ্কার করার মবিল অয়েল খেয়ে সবাইকে সমস্যায় ফেলে দিলেন। মবিল অয়েল খাওয়ার পর তাঁর বুকের ভেতরে কেবল জ্বলছে।

ওজন বয়ে বেড়ানোর অভ্যাস বিপ্লবীদের নেই। অমনিতে দিনে পাহাড়ী পথ চলা খুবই কষ্ট। সেই দুর্গম পথে বিপ্লবীদের রাতে চলতে হচ্ছে।

২২ এপ্রিল। ১৯৩০ সাল। ভোর হতে আর দেরি নেই। শহরের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করলেন, দিনে পাহাড়ে বিশ্রাম নিয়ে শহর আক্রমণ করবেন।

পাহাড়ী পথ চলতে চলতে বিপ্লবীরা হঠাৎ দেখতে পেলেন—পাহাড়ের গা বেয়ে সূর্য উঠছে। চাষীরা লাঙল কাঁধে মাঠে এসে পড়বে। সামনে যে পাহাড় দেখতে পেলেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও মাস্টারদার নির্দেশে সে পাহাড়ে বিপ্লবীরা উঠে পড়লেন।

পাহাড়টির নাম জালালাবাদ পাহাড়। পাহাড়টিতে কোন বড় গাছ নেই। ছোট ছোট গাছপালায় পাহাড়টি ঢাকা। উচ্চতা আনুমানিক দু'শ ফিট। পাহাড়টির কাছাকাছি আরো দুটি পাহাড়। জালালাবাদ পাহাড় থেকে এ দুটি পাহাড়ের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

জালালাবাদ পাহাড়ের আধ মাইল দূরে রেললাইন। বিপ্লবীরা জানেন না কর্ণেল ডালাস্‌স্মিথ ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝরঝরিয়া বটতলীতে ক্যাম্প করেছেন। ঝরঝরিয়া বটতলীর দূরত্ব মাত্র এক মাইল।

গত রাতে খিচুড়ি খেয়ে বিপ্লবীদের কেউ কেউ কিছু কিছু খিচুড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এছাড়া তরমুজ ও ফুটি সংগ্রহ করে এনেছেন ক্ষেত থেকে।

কালীকিঙ্কর দে, কালী চক্রবর্তী এবং আরো ক-জন বিপ্লবী পাহাড়ের এক জায়গায় বসে খিচুড়ি, তরমুজ ও ফুটি খাচ্ছেন। তরমুজ খেয়ে তরমুজের বাকল জঙ্গলে ফেলে দিলেন।

নির্মল সেন হামাগুড়ি দিয়ে এসে তরমুজের বাকল চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছেন!

এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে কালী চক্রবর্তী নির্মল সেনকে বললেন, "দাদা, একটু আগে

এলেন না কেন? আমরা সব খেয়ে নিয়েছি। আপনি তরমুজের বাকল খাচ্ছেন দেখে লজ্জায় ও দুঃখে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।"

নির্মল সেন বললেন, "আমি দূর থেকে তোমাদের খেতে দেখেছি। ইচ্ছে করেই আসিনি। আমার খাওয়ার চেয়ে তোমাদের খাওয়া একান্তই প্রয়োজন। কেননা তোমরা যুদ্ধ করবে।"

বিপ্লবীরা গ্রুপে গ্রুপে ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে পড়লেন। কয়েকজন যুবককে পাহারায় নিযুক্ত রাখলেন।

বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ। অসহ্য গরম। বড় গাছ নেই তাই ছায়ার অভাব। বিনোদবিহারী চৌধুরীর মুখে রোদ এসে পড়লো। ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কাঁচা আমের একটি টুকরো পাবার আশায় তিনি পাহাড়ের পশ্চিমে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়েই মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর দেখা হলো।

ঠিক এ সময়ে মাস্টারদার কাছে অর্ধেন্দু দস্তিদার একটা দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলেন। এ সম্বন্ধে 'চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরণিকায় 'জালালাবাদ স্মৃতি' প্রবন্ধে বিনোদবিহারী চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"ঠিক এমনি সময়ে অর্ধেন্দু (দস্তিদার) এসে জানাল একটি খবর। দু'জন রাখাল বালক উঠছিল পাহাড়ের দক্ষিণ পাশ দিয়ে—আমাদের সান্ত্রীরা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের ছেড়ে দিয়েছে। মাস্টারদার সৌম্য চেহারার মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি মন্তব্য করলেন, 'তাদের আটকে না রেখে ছেড়ে দিয়েছে? আমাদের এখানে অবস্থিতি এতক্ষণে নিশ্চয়ই শত্রু শিবিরে পৌঁছে গেছে। আজ সন্ধ্যার পরে শহরের কয়েক স্থানে গেরিলা আক্রমণ বোধহয় সম্ভব হবে না'।"

মাস্টারদা অর্ধেন্দু দস্তিদারকে বললেন, "অম্বিকাবাবু ও লোকনাথকে খবর দাও আমার কাছে চলে আসতে।"

নেতারা পরামর্শসভায় বসলেন।

তারপর মাস্টারদা বিপ্লবীদের নির্দেশ দিলেন, "রাইফেল পরিষ্কার করে রেখো। আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাইফেলে কার্তুজ লোড করবে না। শত্রুপক্ষ এলে আমরা যুদ্ধ করতে তৈরি হবো।"

বিকেলবেলা। একখানা ট্রেন শহরের দিক থেকে এসে মাঝপথে থেমে গেলো। সেখানে কোন রেলস্টেশন নেই। রেলগাড়িখানা যেখানে থেমেছে তার আশেপাশে ঘন জঙ্গল। ট্রেনখানা জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়ানোর জন্য বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে কিছুই দেখতে পারছেন না।

বিপ্লবীদের সন্দেহ হলো—ট্রেনে করে শত্রুসৈন্য এসেছে। পরে সন্দেহ দূর হলো। দেখা গেলো—একজন লোক সাদা নিশান তুলে অন্য একজন খাকি পোশাকের লোককে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে।

মাস্টারদা লোকনাথ বলকে বললেন, "লোকনাথ, শত্রুসৈন্য এসে পড়েছে। তোমাকে আমি প্রজাতন্ত্রীবাহিনীর সেনাপতি পদে বরণ করলাম। তুমি আজকের যুদ্ধ পরিচালনা করবে।"

জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ আসন্ন। বিপ্লবীরাও তৈরি। লোকনাথ বল বিপ্লবী সাথীদের

নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ব্যূহ রচনা করলেন। বিপ্লবীরা ঝোপেঝাড়ের আড়ালে মাটিতে বুক পেতে দুহাতে রাইফেল ধরে আছেন।

লোকনাথ বল নির্দেশ দিলেন— আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন গুলি করা না হয়।

মাস্টারদা, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেন এমন জায়গা বেছে নিলেন যাতে তাঁদের দূরত্বের ব্যবধান বেশি না হয়। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যেন আলোচনা করে নিতে পারেন। অর্থাৎ পাহাড়ের কেন্দ্রস্থলে তাঁরা পজিশন নিলেন।

বেলা এগারোটার সময় রাখালের ছদ্মবেশে যে দু'জন চাষী জালালাবাদ পাহাড়ে গরু খুঁজতে গিয়েছিল তাদের একজনের নাম আব্দুল রহিম। আব্দুল রহিম বিপ্লবীদের জালালাবাদ পাহাড়ে অবস্থানের সংবাদ সাব-ইন্‌স্পেক্টার হেম গুপ্ত ও মইধর আলিকে জানায়। যার ফলশ্রুতি ট্রেনে ও ট্যাক্সিতে চট্টগ্রাম শহর থেকে সেনাবাহিনী চলে এলো।

সুরমা ভ্যালি লাইট হর্স রেজিমেণ্টের সঙ্গে মোটরগাড়িতে ক্যাপটেন টেট এসে পৌঁছলেন, জালালাবাদ পাহাড়ের অদূরে ঝরঝরিয়া বটতলীতে। ঝরঝরিয়া বটতলীতে আগে থেকে কর্ণেল ডালাস্‌স্মিথ ও ডি. আই. জি. মিঃ ফারমার ক্যাম্প স্থাপন করেছেন।

তিনজন সমর অধিনায়কের মিলিত শক্তি বিদ্রোহীদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

ঝরঝরিয়া বটতলীর মসজিদ। পাহাড়শ্রেণীর বুক চিরে একটা নালা ঝরঝরিয়া বটতলী মসজিদের পশ্চিমদিক দিয়ে সমতল ভূমিতে এসে পড়েছে।

ক্যাপটেন টেট পরিচালিত সেনাবাহিনী নালার ভেতর দিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। মিঃ ফারমারের সেনাবাহিনীও পাহাড়ের ঘুর পথে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলো।

নালার শেষ সীমায় এসে শত্রুসৈন্য দেখলো—সামনে খোলা ধানখেত। ধানখেত পার হলেই সৈনিকেরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছতে পারবে। সমস্যা হলো—এ মাঠ পার হবার সময় পাহাড়ের ওপর থেকে বিদ্রোহীরা দেখে ফেলবে। তাই পরবর্তী নির্দেশের জন্য সেনাবাহিনী নালার ভেতর গা ঢাকা দিয়ে আছে।

বিপ্লবীদের মাথার ওপর সুনীল আকাশ। সামনে পাহাড়শ্রেণীর সবুজ বনানী। বুকের নিচে পাহাড়ের লাল মাটি। মনে সমরের সাধ।

জেনারেল লোকনাথ বলের নির্দেশ বিপ্লবী সাথীদের পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন—রজত সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার ও শান্তি নাগ। তাঁরা একই সঙ্গে লক্ষ্য করে চলেছেন শত্রুর গতিবিধি।

রজত সেন খবর দিলেন—গুর্খা সৈন্য রাইফেল হাতে পাহাড়ের পাদদেশে এসে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসছে। বিপ্লবীদের বাম ও ডান দিক থেকে শত্রু সৈন্য আক্রমণ রচনা করবে।

শত্রু সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য বিপ্লবী তরুণদের উত্তেজনা চরমে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার পরমলগ্ন সমাগত। দেশপ্রেমিক বীরেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে গেলেন।

বিপ্লবীদের দৃষ্টি পাহাড়ের নিচের দিকে। তারা দেখতে পাচ্ছেন, গুর্খা সৈন্যরা কাতারে কাতারে ছোট ছোট গাছের আড়ালে আড়ালে পাহাড় বেয়ে ক্রমে এগিয়ে আসছে।

বিপ্লবীদের মাস্কেট্রি রাইফেলের গুলির পাল্লা মাত্র দু'শ গজ। বিদ্রোহীরা ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ওতপেতে আছেন।

গুর্খা সৈন্যরা ভাবছে, বিদ্রোহীদের অতর্কিতে আক্রমণ করবে। বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছেন।

যুদ্ধ মানেই জীবন দেয়া-নেয়ার পালা। জেনারেল বল দেখতে পেলেন শত্রুসৈন্যরা রাইফেলের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছে। আর দেরি নয়।

লোকনাথ বল বনভূমি কাঁপিয়ে বললেন—"Halt".

লোকনাথ বলের এ ধ্বনি পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত হলো। শত্রুসৈন্যরা বুঝে নিলো আর আগানো সম্ভব নয়।

শত্রুসৈন্যদের আর এগনোর সুযোগ না দিয়ে লোকনাথ বল আদেশ দিলেন—"Fire".

বিপ্লবীরা পাহাড়ের ওপর থেকে শত্রুসৈন্যদের দেখে গুলি চালাতে লাগলেন। শত্রুসৈন্যরাও গুলি চালাচ্ছে। প্রতিটি গুলি বিপ্লবীদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যেতে লাগলো।

পাহাড়টিতে কোন বড় গাছ নেই। তাই শত্রুসৈন্যরা কোন কিছুর আড়ালে আশ্রয় নিতে পারছে না। আবরণহীন অবস্থায় তারা অসহায়ের মতো গুলির মুখে পড়ছে। গুলি লেগে আহত ও নিহত হয়ে, গিঁট ছাড়া সুতোর রীলের মতো পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগলো।

শত্রুসৈন্যরা রণেভঙ্গ দিয়ে দৌড়ে নালার মধ্যে আশ্রয় নিলো। নিহত ও গুরুতর আহত অবস্থায় অনেক সৈন্য পাহাড়ে পড়ে রইলো।

বিপ্লবীরা অবিরাম ধারায় রাইফেল থেকে আগুন ঝরাচ্ছে। একই সঙ্গে বিপ্লবীরা সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলছেন -'ইংরেজ নিপাত যাক্!' 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' বন্দে মাতরম্!'

ক্যাপ্টেন টেট এতো সহজে বিপ্লবীদের কাছে হার মানতে নারাজ। কিন্তু ব্রিটিশবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে গেছে। বিপ্লবীরা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অবিশ্রান্ত গুলি চালাচ্ছেন।

জাজ্‌মেণ্টে মিঃ ইউনী লিখেছেন ঃ

"Capt. Taitt made his disposition and as they went forward into the open, somebody shouted "HALT" from the hill and they were immediately fire upon.... During the first hour the raiders from their hill maintained an almost continuous fusillade accompanied by shouts of Bandemataram..."

ক্যাপ্টেন টেট এ জটিল পরিস্থিতিতেও রাইফেলের মাথায় বেয়নেট লাগিয়ে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। মরবে তো ভারতীয় সৈন্যরাই মরুক।

সৈন্যবাহিনী আবার জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করলো। বিপ্লবীরা মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় রজত সেন পাহাড়ের ওপর থেকে দুটি বোমা ছুঁড়ে দিলেন। বোমা ফাটার প্রচণ্ড শব্দে পাহাড় কেঁপে উঠলো। শত্রুসৈন্য হতচকিত।

শত্রুসৈন্য প্রাণভয়ে পিছু হটে গেলো। ছত্রভঙ্গ সেনাদল আবার নালার মধ্যে আশ্রয় নিলো। ক্যাপ্টেন টেট বুঝলেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদল বারবার হেরে যাচ্ছে।

তিনি রণ-কৌশল পরিবর্তন করলেন।

জালালাবাদ পাহাড়ের একশ গজ দূরে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দুটি পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্‌টেন টেট একদল সৈনিককে দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ে গিয়ে পজিশন নিতে আদেশ দিলেন। অনুরূপ আদেশ দিয়ে উত্তর-পূর্ব পাহাড়ে আর একটি দলকে পাঠালেন তিনি। এবং দুটি মেসিনগান দুটি পাহাড়ে বসানো হলো।

পনরো-বিশ মিনিট পরেই শত্রুসৈন্য মেশিনগানের গুলি ও রাইফেলের গুলি চালিয়ে বিপ্লবীদের জব্দ করতে চাইলো। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ার মতো মেসিনগানের গুলিবৃষ্টি হতে লাগলো জালালাবাদ পাহাড়ে। মেসিনগান থেকে মিনিটে তিনশ পঞ্চাশটা ফায়ার হচ্ছে। গুলির আঘাতে গাছের ছাল, পাতা ঝরে পড়ছে। গুলি পাহাড়ের গায়ে লেগে ধুলো উড়াচ্ছে। এখনো পর্যন্ত বিপ্লবীদের কেউ আহত বা নিহত হননি।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলেন। রাইফেল একের পর এক অচল হয়ে যাচ্ছে। রাইফেলের চেম্বারে কার্তুজ ঢুকানো ও বের করানো যাচ্ছে না। এ ছাড়া ফায়ার করতে করতে রাইফেলের 'ব্যারেল' প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠছে। উত্তপ্ত অবস্থায়ও বিপ্লবীরা রুমাল, জামা এবং গাছের পাতা 'ব্যারেলের' নিচে ধরে ফায়ার করে চলেছেন।

ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের যখন চরম বোঝাপড়া চলছে তখন বিপ্লবীদের রাইফেল জ্যাম্‌ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি বিপ্লবীদের অনুকূলে নয়। এটা যেন তারই ইঙ্গিত। খালি হাতে যুদ্ধ করা যায় না। বিপ্লবীদের অবস্থা তুঙ্গে। চরম সন্ধিক্ষণে মাস্টারদা ও নির্মল সেন এই সমস্যা সমাধানের ভার নিলেন। নির্মল সেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান দেখে আশ্রয় নিলেন। সেই জায়গায় বন্দুক পরিষ্কারের ছোট ছোট তেলের টিন কটি জড়ো করলেন।

মাস্টারদা গুলিবৃষ্টির মধ্যেই বুকে হেঁটে প্রত্যেক বিপ্লবী সাথীর কাছে যাচ্ছেন। অচল রাইফেল সংগ্রহ করে নির্মল সেনের কাছে জমা দিচ্ছেন। নির্মল সেন রাইফেলগুলি তেল দিয়ে পরিষ্কার করার পর সচল হয়ে গেলো। মাস্টারদা আবার রাইফেলগুলি বিপ্লবী বন্ধুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

রাইফেলের কার্তুজ বিপ্লবীদের কাছে সীমিত। যুদ্ধের শেষপর্বে কার্তুজ কমে এলো। বিদ্রোহীরা 'কন্ট্রোল ফায়ার' করতে লাগলেন।

শত্রুপক্ষ যে পাহাড় থেকে মেসিনগান চালাচ্ছে সেখানে বিদ্রোহীদের রাইফেলের গুলি পৌঁছচ্ছে না। তবুও তাঁরা ফায়ার করে চলেছেন। কেননা শত্রুবাহিনী যদি বুঝতে পারে বিপ্লবীদের গুলি শেষ হয়ে এসেছে তা হলে বেয়নেট চার্জ করবে। শত্রুসৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য তাঁরা সময় সময় গুলি ছুঁড়ছেন।

যুদ্ধের শেষ দিকে শত্রুপক্ষ গুলির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। তারা জালালাবাদ পাহাড়কে যেন গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

নরেশ রায় গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ডাক্তার, বিধু ভট্টাচার্য ও টেগ্‌রা (লোকনাথ বলের ছোট ভাই) পাহাড়ের উত্তর-পূর্বদিকে যুদ্ধ করে চলেছেন। দুর্জয় শক্তিতে লড়ছেন। শত্রুসৈন্যের দিকে গুলি করতে করতে তাঁরা পাহাড়ের অনেকটা নিচে নেমে গেছেন।

মেসিনগানের গুলিতে জালালাবাদ যুদ্ধে প্রথম শহিদ হলেন—টেগ্‌রা। বয়স মাত্র পনরো

বছর। টেগ্‌রার রক্তে জালালাবাদ পাহাড় লালে লাল হয়ে গেলো।

গুরুতরভাবে আহত টেগ্‌রা তাঁর দাদা লোকনাথ বলকে বললেন, "সোনাভাই! আমি চললাম, তোমরা শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করো।"

সেনাপতি লোকনাথ বলের চোখের সামনে তাঁর ছোট ভাই শহিদ হয়ে গেলেন। তিনি শোকে অভিভূত হলেন না। পরম স্নেহের টেগ্‌রার শেষ কথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি অধিকতর মনোযোগী হলেন।

বর্তমান লেখককে প্রবীণ বিপ্লবী সরোজ গুহ বলেছেন, "লোকাদা টেগ্‌রাকে হারানোর ব্যথায় যদি ভেঙে পড়তেন, তা হলে জালালাবাদ পাহাড় থেকে আমরা কেউ ফিরতে পারতাম না।"

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে একের পর এক যাঁরা শহিদ হলেন—হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা), ত্রিপুরা সেন, নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, মধুসূদন দত্ত, প্রভাস বল, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, মতিলাল কানুনগো, জিতেন দাশগুপ্ত ও অর্ধেন্দু দস্তিদার। মোট বারোজন।

মতিলাল কানুনগো ও অর্ধেন্দু দস্তিদার পরদিনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন।

২৩ এপ্রিল বেলা প্রায় ১১ টার সময় ভারতীয় সৈন্য, অফিসার, ডাক্তার, ফটোগ্রাফার প্রভৃতি জালালাবাদ পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেন, এসে দেখলেন, মতিলাল ও অর্ধেন্দু বেঁচে আছেন। মতিলালের বাঁচার আশা একেবারে ক্ষীণ। রেলের বড় ডাক্তার ওয়েলডন সাহেব মতি কানুনগোকে মরফিয়া দিয়ে শুইয়ে রাখলেন।

মতিলাল কানুনগোর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তাঁকে অন্য দশজন শহিদের মতো চিতায় তোলা হয়। অর্ধেন্দু দস্তিদারকে চট্টগ্রাম শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। অর্ধেন্দুর তলপেটে গুলি লেগেছে। নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে গেছে। ২৩ এপ্রিল হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অর্ধেন্দু ও মতি কানুনগো ছাড়া জালালাবাদ যুদ্ধে আরো চারজন বিপ্লবী আহত হন। তাঁদের নাম হলো—অম্বিকা চক্রবর্তী, বিনোদ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত ও সুরেশ দে।

২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে দু ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল যুদ্ধের মধ্যে সূর্য অস্ত গেলো। সন্ধ্যের পর মেসিনগানের গুলি বন্ধ হলো। বিপ্লবীরা তখনও গুলি ছুঁড়ছেন। স্লোগান দিয়ে চলেছেন সমানে। ধীরে ধীরে বিদ্রোহীরাও গুলি করা বন্ধ করে দিলেন। এক সময় স্লোগানও বন্ধ হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর ট্রেনের হুইসেলের শব্দ শোনা গেলো। বিপ্লবীরা বুঝে নিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের অফিসারেরা এবং সৈনিকেরা ট্রেনে করে চট্টগ্রাম শহরে পালিয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ বিপ্লবীরা পাহাড়ে অপেক্ষা করলেন। মাস্টারদা, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল একসঙ্গে প্রত্যেক আহত ও নিহত বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে গেলেন। আহতদের মধ্যে কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা দেখলেন।

মাস্টারদা অম্বিকা চক্রবর্তীর কাছে গেলেন। তিনি সংজ্ঞাহীন। মাস্টারদা ডাকলেন, "অম্বিকাবাবু, অম্বিকাবাবু!"

মাস্টারদার ডাক অম্বিকা চক্রবর্তী শুনতে পেলেন। কিন্তু কোন সাড়া দিতে পারলেন না। কেননা কপালের দু ভ্রূর মাঝখানে গুলি লেগে রক্তে চোখ-মুখ ঢেকে গেছে।

মাস্টারদা নিচু হয়ে জোরে জোরে বললেন, "অম্বিকাবাবু, শত্রুর পরাজয় হয়েছে। তারা পালিয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে। উঠতে চেষ্টা করুন। আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে চলুন। আমরা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

অম্বিকা চক্রবর্তী ক্ষীণকণ্ঠে মাস্টারদাকে ডাকলেন। মাস্টারদা হাঁটু ভেঙ্গে অম্বিকা চক্রবর্তীর কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, "অম্বিকাবাবু, এই তো আমি আছি। বলুন?"

অম্বিকা চক্রবর্তীর কাছে কিছু টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। তা তিনি মাস্টারদার হাতে তুলে দিলেন। সময় নষ্ট না করে চলে যেতে মৃদুস্বরে বললেন।

জেনারেল লোকনাথ বলের আদেশে বিপ্লবীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। বিপ্লবীরা শহিদদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

আহতদের মধ্যে বিনোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা একটু ভালো। ক্ষত-স্থান থেকে রক্ত ঝরছে। চলবার শক্তি আছে।

বিনোদ দত্তের গুলি লেগেছে বুকের এক পাশে। মেসিনগানের গুলি বুকের দিক থেকে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে। বর্তমান লেখকের সঙ্গে বিনোদ দত্তের দেখা হয়েছে। তখন বিনোদ দত্ত তাঁর ক্ষতস্থান লেখককে দেখিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ জায়গাটির দাগ বহুমূল্য অলঙ্কারের মতো তাঁর দেহে সুশোভিত।

বিনোদ চৌধুরীর মেসিনগানের গুলি লেগেছে গলায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

তখন রাত আনুমানিক ৯ টা। বিনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড় থেকে নামতে লাগলেন।

বিপ্লবী শান্তি নাগের মন আহত ও নিহত বন্ধুদের দুঃখে ভারাক্রান্ত। পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে আবার পেছনে ফিরে গেলেন। আহত সুরেশ দের নাকে হাত দিয়ে দেখলেন, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বের হচ্ছে। সুরেশের গুলি লেগেছে বাহুতে।

সুরেশ দে শান্তি নাগের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুরেশ দে-কে শান্তি নাগ বারবার ডাকলেন। কোন সাড়া নেই। সুরেশের গায়ে হাত দিয়ে তিনি বারবার নাড়তে লাগলেন। তাতেও কোন সাড়া পেলেন না। পরিশেষে তিনি সুরেশের অসাড় দেহটিকে কাঁধে চাপালেন। রাতের অন্ধকারে রাইফেলের ওপর ভর করে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। অন্ধকারে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। তাঁর কাঁধ থেকে সুরেশের সংজ্ঞাহীন দেহটি ছিটকে পড়ে গেলো মাটিতে। মেঘের গর্ভে যেন বিদ্যুৎ লুকানো ছিল। পতনের আঘাতে সুরেশ জ্ঞান ফিরে পেলেন।

চেতনা ফিরে পেলেও সুরেশ দে-র সমস্ত শরীর অবশ। সুরেশ দেখতে পেলেন শান্তি নাগ ঝুঁকে পড়ে তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি কেন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছেন তা স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। মুহূর্তে যুদ্ধের সব ঘটনা তাঁর স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠলো।

জালালাবাদ পাহাড় গভীর নিস্তব্ধতায় মৌন। রণভূমি মরণ-ভূমিতে রূপান্তরিত।

সুরেশ দে শান্তিকে ইশারায় বললেন, "আমার বুকে গুলি করে তুই চলে যা।"

শান্তি নাগ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "মরতেই তো এসেছি। দু'জন এক সঙ্গেই মরবো। আর বাঁচার চেষ্টায় যদি সফল হতে পারি তবে দু'জনই বাঁচবো।"

শান্তি পাহাড়ের ওপর থেকে সুরেশকে গড়িয়ে দিলেন। কখনো গতিরোধ করেন। কখনো স্তিমিত গতিকে করেন গতিশীল। অনেকক্ষণ সংগ্রামের পর তাঁরা পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে এসে পড়লেন।

এতোক্ষণে শান্তির খেয়াল হলো তাঁরা দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আহত বন্ধুকে একটি গাছের নিচে শুইয়ে রেখে শান্তি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করলেন। কারো দেখা পেলেন না। টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত করলেন। তাতেও কোন ইঙ্গিত পেলেন না। তারপর মাস্টারদা ও লোকনাথ বলকে প্রাণপণ চিৎকার করে ডাকাডাকি করলেন। পাহাড়ের মধ্যে ধ্বনি কেবল প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। সব চেষ্টা ব্যর্থ।

শান্তির মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এখন উপায়? হতাশার মধ্যে চলতে চলতে পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গর্তে জলের সন্ধান পেলেন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তিনি আকণ্ঠ জল পান করলেন। সুরেশের জন্য জলের পাত্রে জল ভরতি করে নিয়ে এলেন।

সুরেশ এক নিঃশ্বাসে সব জল শেষ করে ফেললেন। জল খেয়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। উঠে বসলেন। শান্তি সুরেশের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

শান্তি নাগের বাড়ি কুমিল্লা জেলার ডালপা গ্রাম। সুরেশের বাড়ি—ঢাকা জেলার সোনাখালি গ্রাম। দু'জনেই চট্টগ্রাম শহরে লেখাপড়া করেন। দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স বছর পনরো। তাঁরা চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের পথ-ঘাট চেনেন না। অথচ জালালাবাদ পাহাড় ছেড়ে এখনই চলে যাওয়া উচিত।

চরম হতাশার মধ্যে রাতের অন্ধকারে শান্তি ও সুরেশ অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। চলতে চলতে তাঁরা হঠাৎ দেখতে পেলেন দূরে আকাশের তারার মতো দু-চারটি আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। আলোগুলি লোকালয়ের আভাস দিলো। আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। নির্ভুল পথে গ্রামে ঢুকলেন।

গ্রাম নিশুতির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁদের সৈনিকের পোশাক। পোশাকে তাজা রক্তের দাগ। শান্তির কাঁধে রাইফেল। কোমরে রিভলবার। সুরেশের রাইফেল অন্ধকারে পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেওয়ার সময় হারিয়ে গেছে। কিন্তু কোমরে রিভলবার বর্তমান। রাতের অন্ধকারে আগ্নেয়াস্ত্র গুলি সম্পদ। ভোরবেলা এ অস্ত্রগুলো বিপদ ডেকে আনবে। একমাত্র গুপ্ত আশ্রয় ছাড়া তাঁদের পরিত্রাণের পথ নেই।

মুসলমান গ্রাম। গ্রামের শেষসীমায় ফাঁকা জায়গায় একটি বাড়ি। শান্তি ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে আঘাত করে গৃহস্বামীকে ঘুম থেকে জাগালেন।

গৃহস্বামী একজন গরীব চাষী। তিনি অন্ধকারে দরজা খুললেন। শান্তির কাঁধে রাইফেল দেখে ঘরের মালিক আঁৎকে উঠলেন।

শান্তি গৃহস্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, "চিৎকার করেছো কি গুলি করবো। তুমি শুনেছো, আমাদের সঙ্গে আজ ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছে? আমরা স্বদেশী। যদি আমাদের

কথা শোন তবে অনেক টাকা দেবো। তোমার দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।”

প্রথমে ভয়ে পরে টাকার লোভে গরিব ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। বিপ্লবীরা কয়-দিন খাননি শুনে তাঁদের পান্তাভাত খেতে দিলেন। খাওয়ার পর তাঁরা সামরিক পোশাক বদলানোর জন্য লুঙ্গি ও সার্ট চাইলেন। গৃহকর্তা দু'খানা লুঙ্গি ও দুটি হাফ হাতা গেঞ্জি দিলেন। বিপ্লবীরা পোশাক পরিবর্তন করলেন। গৃহস্বামীর কাছে রিভলবার ও রাইফেলটি গাচ্ছিত রাখলেন। চাষীর নাম ও ঠিকানা নিলেন।

সুরেশ দে গৃহস্বামীকে বললেন, “এ অস্ত্রগুলি রক্ষা করা আর আমাদের জীবন রক্ষা করা এক কথা। তুমি বিশ্বাসী তাই বিশ্বাস করছি। আমরা আবার আসবো। তখন তোমার জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে আসবো। যদি কোন বিপ্লবী বন্ধু এসে আমাদের কথা বলে তোমার কাছে অস্ত্রগুলি চান তবে তাঁকে দিয়ে দিও। তিনি তোমাকে তোমার কাজের পুরস্কার দেবেন।”

রাত শেষ হয়ে এলো। শান্তি ও সুরেশ চাষীর বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন। তাঁদের কাছে একটি পয়সাও নেই। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে পাকা রাস্তায় উঠলেন। রাস্তাটি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা চলে গেছে। বিরামহীন গতিতে তাঁরা চলছেন তো চলছেনই। তাঁরা চলেছেন কুমিল্লার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা ফেণীতে পৌঁছলেন। নোয়াখালির ভাষা তাঁরা জানেন না। তাই কোথাও আশ্রয় নিতে পারছেন না।

দিনের পর দিন উপোস। হাঁটতে হাঁটতে দু'জনের পা ফুলে গেছে। খিদের জ্বালায় দিন-দিন কাহিল হয়ে পড়ছেন। চলতে পারছেন না। কেবলমাত্র জল খেয়ে চলেছেন। পাঁচ দিন তাঁদের পেটে ভাত পড়েনি। ছ'দিনে শান্তি নাগের বাড়িতে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সুরেশ দে ঢাকা জেলার সোনাখালি গ্রামে নিজের বাড়ি চলে গেলেন।

জালালাবাদ যুদ্ধে আহত সুরেশ দে-র সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয় হয়েছে। তিনি এখনো জীবিত। বিহারের জামসেদপুরে থাকেন।

জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ চলাকালীন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল রাতে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ফেণী রেল স্টেশনে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ফলে বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। চারজন বিপ্লবী একে একে কলকাতা এসে পৌঁছান। চন্দননগরে আশ্রয় নেন। ২৮ জুন ১৯৩০ সালে অনন্ত সিংহ কলকাতায় আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে চট্টগ্রাম জেলে আনা হলো।

জালালাবাদ পাহাড় থেকে বিপ্লবীরা নেমে এসে রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। দলের এক অংশ পরিচালনা করছেন মাস্টারদা ও নির্মল সেন। অন্য অংশ পরিচালনা করছেন লোকনাথ বল ও কালী চক্রবর্তী। দু'দলই গ্রামের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিলেন। মাস্টারদা কিছুদিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর বিপ্লবীদের নাম দেওয়া হলো ঃ

সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, নেতা নির্মল সেন, জালালাবাদ

যুদ্ধের সেনাপতি লোকনাথ বল, বিপ্লবী প্রভাস বল, সীতারাম বিশ্বাস, নরেশ রায়, সুরেশ দে, বিনোদ চৌধুরী, জিতেন দাশগুপ্ত, দ্বীজেন দস্তিদার, নিরঞ্জন রায়, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী, বিনোদ দত্ত, সরোজ গুহ, কালীকিঙ্কর দে, মধুসূদন দত্ত, ননী দেব, ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, হেমেন্দু দস্তিদার, কালীপদ চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার, রণধীর দাশগুপ্ত, সহায়রাম দাস, মতিলাল কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন, নিতাই ঘোষ, অশ্বিনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত, সুবোধ বল, শান্তি নাগ, ফণীন্দ্র নন্দী, হরিপদ মহাজন, ভবতোষ ভট্টাচার্য, সুধাংশু বোস, সুবোধ চৌধুরী, বিধু সেন, সুবোধ রায়, ত্রিপুরা সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, টেগ্‌রা, রজত সেন, স্বদেশ রায়, পুলিন ঘোষ, মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্র দে, বিজয় সেন প্রমুখ।

২১ এপ্রিল। অমরেন্দ্র নন্দী ও দীপ্তিমেধা চৌধুরী ফতেয়াবাদের বাদুল্লা পাহাড় থেকে মাস্টারদার নির্দেশে চট্টগ্রাম শহরে গিয়েছিলেন। শহর থেকে ফিরতে দেরি হওয়ার জন্য প্রধান দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন।

২৩ এপ্রিল অমরেন্দ্র গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম শহরে আসেন। একটি খালি বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন। ২৪ এপ্রিল ভোরে একজন গুপ্তচর তাঁকে দেখে ফেলে। সে থানায় খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও ফৌজ এসে শহরের সদরঘাট অঞ্চল ঘিরে ফেললো। তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে নর্দমার কালভার্টে ঢুকে পড়লেন। পুলিশ জানতে পারলো। পুলিশ ঘিরে ফেললো স্থানটি। অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করতে পুলিশ অফিসার আদেশ দিলেন। অমরেন্দ্রের সঙ্গে আছে দুটি রিভলবার। তিনি আত্মসমর্পণের চেয়ে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করলেন। নিজের রিভলবারের গুলিতেই অমরেন্দ্র শহিদ হলেন।

জালালাবাদ যুদ্ধের পর মাস্টারদা সিদ্ধান্ত নিলেন গেরিলা কায়দায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ছ'জন বিপ্লবী যুবক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করলেন, চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট অঞ্চলে ব্যালেস্টাইন ঘাটের কাছে ইংরেজ পল্লীতে ঢুকে তাঁরা ইংরেজদের হত্যা করবেন।

৫ মে ১৯৩০ সাল। মাস্টারদার অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্র থেকে সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন ও রজত সেন চট্টগ্রাম শহরে চলে এলেন। এসে দেখেন, ইংরেজদের বসতি এলাকায় ফৌজের ঘাঁটি বসেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেলো।

কর্ণফুলি নদীর ব্যালেস্টাইন ঘাটের কাছে রজত সেনের বাসা। বিপ্লবীরা রজত সেনের বাড়ি গেলেন। রজতের মা বিনোদিনী সেন বিপ্লবীদের মাসীমা। তিনি সকলকে আশ্রয় দিলেন।

রজত সেন বাড়ি এসেছে, এ খবর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলো। বিপ্লবীরা খেতে বসেছেন। এমন সময় রজতের ছোট ভাই দৌড়ে এসে খবর দিলেন পুলিশ আসছে। ভাত আর খাওয়া হলো না। থালার ভাত থালায় পড়ে রইলো। বিপ্লবীরা বের হয়ে পড়লেন।

বিপ্লবীরা দেখতে পেলেন, কর্ণফুলি নদীর ঘাটে একখানা সাম্পান (ছোট নৌকা) বাঁধা আছে। মাঝি নেই। বিপ্লবীরা সাম্পান চালাতে লাগলেন। তাঁরা অনেক দূরে চলে গেলেন। পুলিশ লঞ্চ নিয়ে পিছু ধাওয়া করলো। প্রাণপণে সাম্পান চালিয়ে বিপ্লবীরা অপর তীরে পৌঁছে গেলেন।

বিপ্লবীরা দৌড়তে শুরু করলেন। পুলিশ গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো— "ওরা ডাকাত। ওদের ধর।"

হৈচৈ শুনে গ্রামের লোক বের হয়ে এলো। বিপ্লবীদের হাতে রিভলবার দেখে গ্রামবাসীরা ডাকাত বলে বিশ্বাস করলো। একজন গ্রামবাসী দেবপ্রসাদ গুপ্তের কাঁধে দা দিয়ে সজোরে কোপ মারলো। দেবপ্রসাদের ডান হাত ঝুলছে। গ্রামবাসীটিকে বিপ্লবীদের একজন গুলি করলেন। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গ্রামবাসীটি নিহত হলো। ফলে উত্তেজনা চরমে।

অন্ধকারে চলতে চলতে ফণীন্দ্র নন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অন্য পাঁচজন কালারপুল দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ সুবোধ চৌধুরীকে জাপটে ধরলো। পুলের কাছে হালে পুলিশ চৌকি বসেছে। পরিশেষে ফণীন্দ্র নন্দীও গ্রেপ্তার হন।

মনোরঞ্জন, স্বদেশ, রজত ও দেবপ্রসাদ জুলদা গ্রামে ঢুকে পড়লেন।

ভোর হতে আর দেরি নেই। বিপ্লবীরা এক বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখতে পেলেন। তাঁরা বৃদ্ধের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধ বিপ্লবীদের পুকুর পাড়ে শণবনে আশ্রয় নিতে বললেন। কথা দিলেন, বাড়ি থেকে তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে যাবেন।

৬ মে। ভোরবেলা চট্টগ্রাম শহর থেকে একটা বিরাট পুলিশ বাহিনী জুলদা গ্রামে গিয়ে শণবন ঘিরে ফেললো।

উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হলো। একজন দারোগা টিনের চোঙা মুখের সামনে ধরে চেঁচিয়ে বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন।

শণবন থেকে মনোরঞ্জন দীপ্তকণ্ঠে বললেন, "আমি বালেশ্বর যুদ্ধের যতীন মুখার্জীর মতো শহিদ হবো।"

অন্য বিপ্লবীদের ঘোষণা শোনা গেলো—"না, না, আত্মসমর্পণ নয়। কিছুতেই না।"

পরিশেষে বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ না করে, নিজেদের রিভলবারের গুলিতে নিজেরাই স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করলেন।

এই যুদ্ধে চারজন বিপ্লবীই জীবন বিসর্জন দিয়ে শহিদ হলেন।

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বে কয়েকজন নারী বিপ্লবীদলের সদস্যা হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম শহরে ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তখন তাঁর নিকট আত্মীয় পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট কর্মী। তিনি নিষিদ্ধ বিপ্লবী বই পড়েন। বিপ্লবী বইগুলো পড়ার বইয়ের সারিতে লুকিয়ে রাখেন। প্রীতি বিপ্লবী বইগুলো পড়তে শুরু করলেন দাদার অজ্ঞাতে। পড়তে পড়তে তাঁর হৃদয়রাজ্যে এক তরঙ্গ-প্রবাহ সৃষ্টি করলো।

প্রীতি একদিন পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, "দাদা, আমরা তোমাদের ওসব কাজ

পারি না ?"

পূর্ণেন্দু দস্তিদার জবাব দিলেন, "না, মেয়েদের দিয়ে ওসব কাজ চলে না।"

প্রীতি সহজে দমে যাওয়ার পাত্রী নন। প্রীতি বিনম্রভাবে বললেন, "ইতিহাসে পড়েছি, ঝাঁসীর রানী ঘোড়ায় চড়ে হাতে তলোয়ার নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে। আমার নামও রানী (প্রীতিলতার ডাকনাম রানী), আমিও পারবো রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো লড়তে।"

পূর্ণেন্দু দস্তিদার বোন প্রীতির কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তখনো পর্যন্ত বিপ্লবীদলে মহিলা সদস্য গ্রহণ করা হয়নি। এমন কি বিপ্লবী সদস্যরা নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করাও সম্পূর্ণ বারণ। এ মতো অবস্থায় পূর্ণেন্দু দস্তিদার ভয়ে ভয়ে প্রীতির বিপ্লবীদলে যোগদানের প্রবল আগ্রহের কথা মাস্টারদাকে জানালেন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নারী সংগঠনের অগ্রদূত পূর্ণেন্দু দস্তিদার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' বইতে লিখেছেন ঃ

"প্রীতির সব কথা শুনে তিনি (মাস্টারদা) ঐ কড়া নির্দেশ কিছুটা শিথিল করেন। নিজের আপন বোন এবং ঠিক তেমন সম্পর্ক বিশিষ্টা মেয়েদের দলের কিছু কাজ দেওয়া চলে এই সিদ্ধান্ত তিনি জানান। তারা নিষিদ্ধ বই পড়বে, তাদের অলঙ্কার দিয়ে পার্টির অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে ও পার্টির গোপন বই ও অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করবে। এ ছাড়া আর কোন কাজে তাদের নেওয়া হবে না এবং আপাততঃ ঐ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সারা বিপ্লবীদলের মধ্যে চালু করা হবে না। কেবল শহরেই এই সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে এবং মাস্টারদা নিজে তাদের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ নির্দেশাদি দেবেন।"

প্রীতিলতা প্রথমে বিপ্লবীদলের সাথে যুক্ত হলেও মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক পরে। প্রীতির আগেই কল্পনা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করেন। ছোটবেলা থেকে কল্পনার সঙ্গে প্রীতির পরিচয়। কল্পনা ও প্রীতি খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েন। প্রীতি পড়েন এক ক্লাস ওপরে।

একদিন প্রীতি কথাপ্রসঙ্গে কল্পনাকে বললেন, "ম্যাট্রিকে বৃত্তি না পেলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হবে না আমার।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রীতির প্রবল। তিনি ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেলেন না। কেননা অঙ্কশাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সব বিষয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও অঙ্কের জন্য বৃত্তির তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ে গেলো। কয়েকটি বিষয়ে 'লেটার' পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস্ করেন।

প্রীতি আই. এ. পড়ার জন্য ঢাকায় যান। সেখানে ইডেন কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজে বোর্ডিং-এ থাকা-খাওয়ার খরচ কম। প্রীতির বাবা জগদবন্ধু ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি। বেতন অল্প। তবুও তিনি মেয়েকে আই. এ. পড়তে ঢাকা পাঠালেন।

ঢাকায় গিয়ে প্রীতি নারী আন্দোলনের অগ্রদূত লীলা নাগের (রায়) পরিচালিত 'দীপালি সংঘে' যোগ দেন। 'দীপালি সংঘ' হলো ঢাকার বিপ্লবী নেতা অনিল রায় পরিচালিত শ্রীসংঘের মহিলা শাখা। সেখানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শিখে তিনি নিজেকে

ভাবী কর্মজীবনের জন্য তৈরি করতে থাকেন।

১৯২৯ সাল। কল্পনা পনরো টাকা বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। আই. এস্-সি পড়ার জন্য কলকাতায় এলেন। এবং বেথুন কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি 'ছাত্রী সমিতি'-তে যোগদান করে লাঠিখেলা ও ছোরাখেলা প্রভৃতি শিখতে লাগলেন।

কল্পনা দত্ত যখন বেথুন কলেজে পড়ছেন তখন পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁকে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা দেন। কল্পনা দত্ত তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, "১৯২৯ সালে সন্ত্রাসবাদী দলের সংস্পর্শে এসেছি। মাস্টারদার নাম তখনো জানি না। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিছু আগে পূর্ণেন্দুদা (তিনি আমার সন্ত্রাসবাদী দলে আসতে সাহায্য করেছিলেন) আমায় বলেছিলেন ; 'এবার চাটগাঁয় যখন যাবে আমাদের নেতা সূর্য সেনের সঙ্গে তোমায় পরিচয় করিয়ে দেব'।"

ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে, প্রীতিলতা কলকাতা বেথুন কলেজে বি. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। আই. এ. পরীক্ষায় তিনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম হন। এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পঞ্চমস্থান অধিকার করে বিশ টাকা বৃত্তি পান। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি না পেলেও, আই. এ. পরীক্ষায় সরস্বতী দেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না। সাধনার জোরে অতীতের ক্ষতি খানিকটা পুষিয়ে নিলেন।

কলকাতায় এসে প্রীতি তাঁর দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সাথে দেখা করেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়েন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর তিনি আত্মগোপন করে, মধ্য কলকাতায় মনোরঞ্জন রায়ের পিসির বাসায় আছেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের ফেরারী জীবনে প্রীতি দাদার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে আসেন।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও মনোরঞ্জন রায় দু'জনেই কলকাতায় লেখাপড়া করছেন। মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি. এস-সি. পাস করে, কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এস-সি. পড়ছেন।

মনোরঞ্জন রায় ছোটবেলা থেকে শান্তশিষ্ট ও নিরীহ। বাবা-মা তাই আদর করে ডাকেন—ক্যাবলা। শিশুসুলভ দুরন্তপনা ছিল না মোটেই।

বিপ্লবীদলে যোগদান করে মনোরঞ্জন রায় বহু নূতন সদস্য দলে এনে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেন। এবং পার্টিকে সমৃদ্ধ করেন। বন্ধু পূর্ণেন্দু দস্তিদার গ্রেপ্তার হবার পর মহিলা সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মনোরঞ্জন রায়ের ওপর এসে পড়ে। বিপ্লবীদলে কাজ করে চলেছেন—প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, রেণুকা রায় ও কমলা চ্যাটার্জি প্রমুখ মহিলা।

চট্টগ্রাম থেকে মাস্টারদা মনোরঞ্জন রায়কে ডেকে পাঠালেন। মাস্টারদা তখন চট্টগ্রামের পাহাড়ে—জঙ্গলে এবং গ্রামের গুপ্ত আশ্রয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন। মাস্টারদার ডাকে মনোরঞ্জন রায় কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছলেন। মা লাবণ্যপ্রভা তাঁর পরম স্নেহের ক্যাবলাকে পেয়ে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একান্তই লেখাপড়ার তাগিদে তাঁকে কলকাতা পাঠাতে হয়েছে। কয়েক মাস আগে তাঁর টাইফয়েড্ হয়েছিল। মা বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলের শরীরে হাত বুলাতে লাগলেন।

লাবণ্যপ্রভা ছেলেকে বললেন, "তোর শরীর ভালো আছে তো ? আমি নিশিদিন কেবল তোর কথা ভাবি আর ভাবি। তোর পড়ার ক্ষতি হয় বলে আসতে লিখি না। বাবা, তুই এসেই আমার প্রাণ জুড়ালি।"

মনোরঞ্জন রায় বললেন, "মা, তোমাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কেবল তোমাকে স্বপ্নে দেখি, তুমি কাঁদছো। তাই লেখাপড়ায় মোটেই মন বসাতে পারছিলাম না। চলে এলাম।"

মনোরঞ্জনের বাবা অশ্বিনীকুমার রায় আপন মনে অনেককিছু ভাবলেন। কেননা চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভয়াবহ। চট্টগ্রামের তরুণদের ধরে ধরে জেলে ঢোকানোর পালা এখনো শেষ হয়নি। তার ওপর তিনি আবগারি বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্ট্ পদে চাকরি করেন। ছেলে চিঠি না দিয়ে হঠাৎ চলে আসার পেছনে কোন হেতু থাকা বিচিত্র নয়। মা ও প্রবাসী ছেলের মিলন দৃশ্য দেখে তাঁর পিতৃহৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেলো।

মাস্টারদা মনোরঞ্জনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। মনোরঞ্জন রায় চট্টগ্রামের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদার কাছে খবর চলে গেলো। একদিন রাতে মনোরঞ্জন বিপ্লবী-দলের এক কর্মীর সঙ্গে গ্রামের পথে পা বাড়ালেন। গোপন আস্তানায় পৌঁছে তিনি মাস্টারদাকে প্রণাম করলেন। মাস্টারদা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর টাইফয়েড্ হয়েছিল শুনেছিলাম। এখন কেমন আছিস?"

মনোরঞ্জন রায় জবাব দিলেন, "ভালো আছি।"

মাস্টারদা ফের প্রশ্ন করলেন, "তোর লেখাপড়া কেমন চলছে?"

মনোরঞ্জন রায় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "ভালো।"

বিপ্লবীদলের কাজ করতে গিয়ে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা করছে না শুনে মাস্টারদা খুশি হলেন। মাস্টারদা ভাবলেন, মনোরঞ্জন মেধাবী ছাত্র। কেমিস্ট্রি নিয়ে এম. এস-সি. পড়ছে। তাকে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। বড়ই নির্ভরযোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মী।

মাস্টারদা মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, "তুই কেমিস্ট্রির ছাত্র। আশা করি গান্-কট্ন্ তৈরি করতে পারবি। কলকাতায় গিয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি তোকেই যোগাড় করতে হবে। এ ছাড়া বোমা ও এ্যাসিড যোগাড় তোকেই করতে হবে। যতো বেশি পরিমাণে সম্ভব ততো আমার চাই। জানি, এ কাজ বড়ই কঠিন। লাইসেন্স ছাড়া বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রয়োজন। তোকে টাকা আমি দিতে পারলাম না। উপরন্তু আমার টাকার একান্ত প্রয়োজন। কলকাতায় পৌঁছেই টাকা সংগ্রহ করে পাঠাবি।

যুব-বিদ্রোহ চলাকালীন মাস্টারদা কিরকম অর্থাভাবে ছিলেন, তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় 'চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা' গ্রন্থে বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের 'প্রণতি' প্রবন্ধে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন, "জালালাবাদের খবর সকালের কাগজে পড়লাম যেদিন, সেইদিন সন্ধ্যাতেই গণেশ আমাদের ৭১ নং মীর্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িতে।

"জালালাবাদের সাথে আর আমার কি যোগ? না আর একটু আছে। কয়েককদিন পরে নির্মলের চিঠি।...

"চিঠির বক্তব্য সহজ। কিন্তু ব্যথায় ভরে ওঠে মন—অভাব, জঙ্গলের লতাপাতায় পেট ভরে। আগে তো ভবিষ্যৎ আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। হ'লে কি গণেশ, অনন্ত—দু'জনই চলে আসতেন এদিকে?"

মনোরঞ্জন রায়কে মাস্টারদা গান-কটন তৈরির ভার দিলেন। তিনি কেমিস্ট্রির ছাত্র।

কিন্তু গান-কটন কেমন করে তৈরি করতে হয় তা জানেন না। গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। মাস্টারদা এক লহমায় মনোরঞ্জনের মনোজগৎ জরিপ করে নিলেন।

মাস্টারদা বললেন, "বিপ্লবী অভিধানে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। জানি, গান-কটন তৈরির অভিজ্ঞতা তোর নেই। সতীবাবুর (সতীভূষণ সেন) সঙ্গে গান-কটনের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করলে, আশা করি সমস্যার সমাধান হবে।"

এবার ফেরার পালা। মাস্টারদা মনোরঞ্জনকে ফের বললেন, "চট্টগ্রামে বেশি দিন থাকা তোর উচিত নয়। অনন্তলাল ও গণেশের সাথে যদি দেখা করতে পারিস তবে তাদের বলবি, বাইরে যাতে অ্যাকৃশ্‌ন ছড়িয়ে দিতে পারে তার চেষ্টা করতে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের দুই বীর সেনাপতির অভাব মাস্টারদা অনুক্ষণ অনুভব করছেন। তাঁরা মাস্টারদার যেন দুই বাহু। এই দুই সেনাপতি মাস্টারদার পাশে থাকলে ইংরেজ সরকারকে দেখিয়ে দিতে পারতেন তিনি কতো শক্তিধর। হায়! বিধি বাম।

মাস্টারদার গোপন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে এসে মনোরঞ্জন রায় সতীভূষণ সেনের সঙ্গে দেখা করলেন। তরুণ রসায়নবিদ সতীভূষণ সেনের কাছে গান-কটন তৈরির ফরমূলা জেনে নেন। সতী সেনের বাড়ি ঢাকা।

সতীভূষণ সেন চট্টগ্রাম শহরে সাবানের ব্যবসা করেন। তিনি নিজেই সাবান তৈরি করেন। এবং সাইকেলে করে দোকানে দোকানে বিক্রি করেন। বিপ্লবীদের বন্ধু। নির্মল চরিত্র। সর্বজন শ্রদ্ধেয়। গুণ্ডা-দমনে অনন্ত সিংহকে তিনি সাহায্য করেছেন।

কালবিলম্ব না করে মাস্টারদার নির্দেশে মনোরঞ্জন রায় কলকাতা চলে এলেন। অনেক কষ্টে মালমসলা যোগাড় করে গান-কটন তৈরি করলেন। এবং পাঁচটি T.N.T. বোমা সংগ্রহ করলেন।

মধ্য-কলিকাতার শাঁখারিপাড়া লেনে মনোরঞ্জন রায়ের গুণু পিসির বাসা। বাসাটি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্রের একটি সংগ্রহশালা। গুণু পিসির বাড়িতে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পর পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও অনন্ত সিংহ আত্মগোপন করেছিলেন। মনোরঞ্জন রায়ের পিসিমাকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পিসিমা ডাকেন। কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা গুণু পিসির বাসায় যান। মনোরঞ্জন রায় তাঁর তৈরি গান-কটন ও বোমাগুলি পিসিমার বাসায় রাখলেন। তাঁর সংগৃহীত অস্ত্রও পিসীমার জিম্মায় রাখেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে গুণু পিসিমার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ঢাকা বি. ভি দলের সঙ্গেও এই বৃদ্ধা বিধবা পিসিমার যোগাযোগ ছিল। তিনি দু বাহু বাড়িয়ে তাঁর দুই ছেলেকে স্নেহের আঁচলে ঢাকা দিয়ে যেন নিজের বুকে লুকিয়ে রয়েছেন।

গুণু পিসির অবদান সম্বন্ধে পূর্ণেন্দু দস্তিদার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' বইতে লিখেছেন (পৃ-১৭০) "কলিকাতা গিয়ে পৌঁছানোর দুই-একদিন পরই অনন্ত সিংহ যে নিরাপদ আশ্রয়ে এসে পৌঁছান, তা তৎকালীন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম সদস্য ক্যাবলা (মনোরঞ্জন) রায়ের পিসীমার বাসা। তখন সেখানে চট্টগ্রামের আরও একজন তরুণ বিপ্লবী (পূর্ণেন্দু দস্তিদার) কয়েকদিন ধরে আত্মগোপনে ছিল। মহীয়সী মহিলা ঐ বিধবা পিসীমা ও তাঁর ছেলেমেয়ে সকলেই পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অন্যান্য সাহায্য

যথেষ্ট করেছিলেন। এ গোপন কেন্দ্রে বসে বিপ্লবী মেয়ে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, রেণুকা রায়, কমলা চ্যাটার্জি ইত্যাদি বহু গোপন বৈঠক করেছে. মাস্টারদা প্রেরিত গোপন ইস্তাহার সাইক্লোস্টাইলে শত শত ছাপাতে ও গোপনে কলিকাতার বিভিন্ন অংশে বিতরণ করতে সাহায্য করেছে। বিস্ফোরক, 'গান-কটন' ইত্যাদি তৈরির জন্য (চট্টগ্রাম 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের' ব্যবহারের জন্য) সংগৃহীত এ্যাসিড ইত্যাদি ঐ বাসায় নিরাপদে রাখা হয়েছে।"

১৯৩০ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। মনোরঞ্জন রায় গান-কটন ও পাঁচটি বোমা নিয়ে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম যাত্রা করলেন। বিপদসঙ্কুল পথ। পদে পদে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি প্রসারিত। কোন ফাঁদে গিয়ে পা পড়বে তা সম্পূর্ণ অজানা। এই দীর্ঘ পথ যেতে হবে রেলগাড়ি ও স্টীমারে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে, তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনায় তৈরি গান-কটন এবং কঠোর পরিশ্রমে সংগৃহীত বোমাগুলো বেহাত হয়ে যাবে। সাধনালব্ধ ধন-গুলো মাস্টারদার হাতে তুলে দিতে পারলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। মাস্টারদাকে খুশি করতে পারলেই তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে। মাস্টারদা হয়তো তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। এবং তিনি আরো কাজ করার সুযোগ পাবেন।

মনোরঞ্জন রায় নিরাপদে চট্টগ্রাম পৌঁছলেন। দুর্গাপূজার ছুটিতে প্রীতি ও কল্পনা কলকাতা থেকে বাড়ি গেলেন। পুজো উপলক্ষে প্রীতির বাড়িতে মনোরঞ্জন রায় ও কল্পনা দত্ত নিমন্ত্রিত। একটি ঘরে তিনজন বসে গল্প করছেন। এমন সময় মনোরঞ্জন রায় জানালা দিয়ে দেখলেন বাগানে একটি পাঁঠা চরছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। প্রীতি ও কল্পনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে বাগানে দাঁড়ানো পাঁঠাটাকে কুপিয়ে হত্যা করতে পারবে ?"

মনোরঞ্জন রায় ছোটবেলা থেকে চট্টগ্রামে মানুষ। চট্টগ্রামের ভাষা খুবই ভালো জানেন। ইস্কুল-কলেজের পাঠ চট্টগ্রামেই নিয়েছেন। অনেকেই জানেন না তিনি ফরিদপুর জেলার কুয়ারপুর গ্রামের অধিবাসী। মেধাবী ছাত্র ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের অতি প্রিয়।

কল্পনা খুব চঞ্চল। মনোরঞ্জন রায় প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা বললেন, "পাঁঠাটাকে হত্যা করতে আমি নিশ্চয়ই পারবো। আমার মোটেই ভয় করে না।"

প্রীতি একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বললেন, "নিরীহ পাঁঠাটি তো কোন দোষ করেনি। অহেতুক নিরীহ জীব হত্যা আমি করতে পারবো না। সময় আসলে আমি ঠিক পারবো। স্বাধীনতার জন্য আমি প্রাণ দিতেও পারবো প্রাণ নিতেও মোটেই কুণ্ঠাবোধ করবো না।"

মনোরঞ্জন রায়ের চট্টগ্রাম পৌঁছনোর খবর অর্ধেন্দু গুহ মাস্টারদাকে জানালেন। মাস্টারদার কাছ থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আছেন তিনি।

মনোরঞ্জন রায় মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। একদিন রাতে বোমা ও গান-কটন নিয়ে মনোরঞ্জন রায় অর্ধেন্দু গুহের সাথে মাস্টারদার গোপন আস্তানায় হাজির হলেন। বোমা ও গান-কটন মাস্টারদার হাতে তুলে দিলেন।

মনোরঞ্জন রায় বললেন, "মাস্টারদা, যুব-বিদ্রোহের আগে মেয়েদের বিপ্লবীদলে নিতে বলে-ছিলাম, তাই আমাকে আপনারা অস্ত্রাগার দখলের সময় বাদ দিয়েছিলেন। তবুও আমি আমার কর্তব্যে অবিচল। মেয়েদের বিপ্লবীদলে নেওয়ার জন্য আমি ফের আপনাকে অনুরোধ

করছি। বাস্তব পরিস্থিতি মোটেই আমাদের অনুকূলে নয়। গ্রামে গ্রামে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। আত্মগোপন করাও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে হিন্দু কিশোর, যুবক ও ছাত্রদের লাল, নীল ও সাদা পরিচয়পত্র দিয়ে পুলিশ তাদের চিহ্নিত করেছে। পুলিশের দেওয়া কার্ড ছাড়া কেউ চলাফেরা করতে পারছে না। চট্টগ্রামে প্রায় একুশ হাজার ছাত্রকে কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের সামনে একমাত্র পথ মেয়েদের দলে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।"

লাল পরিচয়পত্রের অর্থ হলো—খুব সন্দেহভাজন। পুলিশের অনুমান, লাল কার্ড বহনকারী ব্যক্তির সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগাযোগ আছে। নীল কার্ডের অধিকারী কম সন্দেহ-ভাজন। সাদা পরিচয়পত্রের অধিকারী শান্তিপ্রিয় নাগরিক।

মাস্টারদা গভীর মনোযোগ সহকারে মনোরঞ্জন রায়ের কথাগুলো শুনলেন। মাস্টারদা ভাবতে লাগলেন। মাস্টারদাকে নীরব দেখে মনোরঞ্জন রায় আবার বললেন, "কল্পনা, প্রীতি এবং আরো কয়েকজন মেয়ে বিপ্লবীদলে কাজ করার জন্য বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। কল্পনা আপনার অনুমতি পেলে কলকাতা বেথুন কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভরতি হবে। প্রীতিলতা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েই চলে আসবে।"

অনন্ত সিংহ মেয়েদের দলে নেওয়ার জোর বিপক্ষে। আবার মনোরঞ্জনের যুক্তিও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার জন্য মেয়েরা মুখিয়ে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তাদের সমান। অধিকার থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা পাপ। লোকচক্ষুর অন্তরালে ইতিহাস এগিয়ে চলে। ইতিহাসকে উপেক্ষা করা যায় না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। মাস্টারদার মানসিক অবস্থা, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'। অনন্তলালকে তিনি খুব স্নেহ করেন। স্নেহান্ধ না হয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনে মাস্টারদা সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েদের দলে নিতেই হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের দলে নেওয়া অপরিহার্য। এতোদিন দলের ছেলেদের মা ও বোনেরা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। এখন প্রত্যক্ষ সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। মেয়েরাই পারবে গোপন অস্ত্রশস্ত্র, টাকা-পয়সা ও বিস্ফোরক জিনিসপত্র নিরাপদে বহন করতে ও সংরক্ষণ করতে। পুলিশের নজর এখনো পর্যন্ত মেয়েদের ওপর পড়েনি। পুলিশের ধারণা মেয়েরা অবলা। মেয়েদের অবলা অপবাদের সুযোগকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মাস্টারদা মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, "কল্পনাকে অর্ধেন্দুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবি। অর্ধেন্দুর মাধ্যমে কল্পনা বিপ্লবীদলের কাজ করবে।"

তারপর মাস্টারদা অর্ধেন্দু গুহকে বললেন, "কল্পনার ডাকনাম ভুলু। অনন্তলাল জিজ্ঞেস করলে বলবি, ভুলু রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্তের নাতি। মেডিকেল কলেজের ছাত্র।"

মাস্টারদার নির্দেশ মতো মনোরঞ্জন রায় কল্পনাকে সতীভূষণ সেনের বাসায় নিয়ে গেলেন। যথাসময়ে অর্ধেন্দু গুহও সতী সেনের বাসায় উপস্থিত। শহরের নন্দনকাননে সতী সেনের বাসা।

মনোরঞ্জন রায় অর্ধেন্দুকে কল্পনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কল্পনাকে বললেন, "তোমাকে অর্ধেন্দুর মাধ্যমে বিপ্লবীদলের কাজ করতে হবে। তোমাকে দিয়ে

মাস্টারদা কি কাজ করাবেন তা তুমি অর্ধেন্দুর মারফত জানতে পারবে। মাস্টারদার নির্দেশে আমি অর্ধেন্দুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতা ফিরে যাবো।"

মাস্টারদার নির্দেশে কল্পনা কলকাতা বেথুন কলেজ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হলেন।

সতী সেনের বাসায় অর্ধেন্দু ও কল্পনার যোগাযোগ চললো। একদিন সতী সেন বললেন, "অর্ধেন্দু, আমি ছা-পোষা মানুষ। তোমরা অন্য জায়গা দেখো।"

কল্পনার বাড়ির পাশে চট্টগ্রাম শহরের জেনারেল হাসপাতাল। জরুরী প্রয়োজনে কল্পনার সঙ্গে দেখা করতে হলে, অর্ধেন্দু সাইকেলের হর্নের সাংকেতিক ধ্বনি দিয়ে হাসপাতালে চলে যান। সাংকেতিক ধ্বনি শুনে কল্পনা বুঝতে পারেন, অর্ধেন্দু তাঁকে ডাকছেন। কল্পনা ও অর্ধেন্দুর মিলনস্থল হলো মর্গের পাশের রুম।

মর্গের জায়গাটি নির্জন। গুপ্তচরদের ফাঁকি দেওয়ার উপযুক্ত স্থান। অনেক ভেবেচিন্তে মর্গের দারোয়ানকে টাকা দিয়ে অর্ধেন্দু হাত করেছেন। সময়-সময় মর্গের পাশের ঘরে বসে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিপ্লবী কাজের গোপন পরামর্শ হয়। দারোয়ান উল্টো বুঝে একদিন অশ্লীল মন্তব্য করে বসলো। মন্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা দত্ত পায়ের চটি খুলে দারোয়ানকে মারতে গেলেন।

পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার জন্য অর্ধেন্দু কল্পনাকে বললেন, "আপনি চটে গেলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। সব পণ্ড হয়ে যাবে। আপনি শান্ত হোন।"

আর একদিনের ঘটনা আরো কৌতূহলোদ্দীপক। তখন বিকেল। কলেজ ছুটির পর কল্পনা বাড়ি ফিরছেন। এমন সময় রাস্তায় অর্ধেন্দুর সাথে তাঁর দেখা হয়। কল্পনা এক লহমায় বুঝে নিলেন, জরুরী কোন খবর না থাকলে অর্ধেন্দু এ সময়ে নিশ্চয় দেখা করতেন না। দু'জনেই চললেন দেবপাহাড়ের দিকে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলা। পাহাড়ের কোল ঘেষে আঁকাবাঁকা পথ। দেবপাহাড়ে জগদ্বন্ধু আশ্রম। লোকজনের সমাগম হয়। দেবপাহাড়ের পাদদেশে এক ঝোপের ধারে কল্পনা ও অর্ধেন্দু বসলেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চললো। আলোচনা চলাকালীন জামিনে মুক্ত বিপ্লবী আসামী বিজয় সেন দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেলেন। বিজয় সেন হলেন, কল্পনা দত্তের কাকীমার ছোট ভাই। পরদিন বিজয় সেন সকাল সকাল কোর্টে হাজির হলেন। তখনও কোর্টে অর্ধেন্দু পৌঁছাননি।

বিজয় সেন অনন্ত সিংহকে বললেন, "আপনি তো অর্ধেন্দুকে খুব ভালোবাসেন। কাল বিকেলে দেখলাম, আমার ভাগিনী কল্পনার সঙ্গে অর্ধেন্দু দেবপাহাড়ের জঙ্গলের ধারে বসে গল্পে মেতে আছে।"

জামিনে মুক্ত বিপ্লবী আসামীরা রোজ কোর্টে হাজিরা দিতে যান। আদালতে হাজিরা দেওয়ার সময় খাঁচার ভেতর অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে প্রতিদিন তাঁর পাশে বসান।

অর্ধেন্দু সম্বন্ধে বিজয় সেনের অভিযোগ অনন্ত সিংহ শুনলেন। এবং অর্ধেন্দুর ওপর মনে মনে রেগে গেলেন। কিছুক্ষণ পর অর্ধেন্দু আদালতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, অনন্ত সিংহ মুখভার করে আছেন। অন্যদিন তাঁকে কতো আদর করেন। আজ অন্য

চেহারা কেন ?

অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, "অনন্তদা, আপনি কি অসুস্থ ?"

অনন্ত সিংহ এতোই রেগে গেছেন, যার ফলে অর্ধেন্দুর কথার কোন জবাবই দিলেন না।

অনন্ত সিংহের হলো কি ? অর্ধেন্দু মনমরা হয়ে খাঁচার এককোণে বসে রইলেন।

অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "গতকাল তোকে যে কাজ দিয়েছিলাম, করেছিস ?"

অর্ধেন্দু বললেন, "হ্যাঁ।"

অনন্ত সিংহ, সিংহ গর্জনে বললেন, "তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস। তোর কান টেনে ছিঁড়ে দেবো।"

উকিলের ছেলে অনন্ত সিংহ। প্রমাণ হাতে না রেখে কৈফিয়ত তলব করেন না। তিনি জোঁকের মুখে চুন দেবার মতো জিজ্ঞেস করলেন, "তুই গতকাল বিকেলে দেবপাহাড়ে কল্পনার সঙ্গে গল্প করছিলি ?"

অর্ধেন্দু বোবা বনে গেলেন। অনন্ত সিংহ রাগে গরগর করছেন। অনন্ত সিংহ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "কল্পনাকে রায় সাহেবের নাতি বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলি। তোর হিম্মত তো কম নয়।"

অর্ধেন্দু সাহসে ভর করে অতি সংক্ষেপে বললেন, "আপনার প্রশ্নের জবাব মাস্টারদার কাছ থেকে জেনে পরে আপনাকে দেবো।"

অর্ধেন্দু শনিবারের প্রতীক্ষায়। শনিবার আদালতে হাজিরা দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। সন্ধ্যার পর গ্রামের গোপন আশ্রয়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মাস্টারদার সাথে দেখা করে আদ্যোপান্ত ঘটনা বললেন। অর্ধেন্দুর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে মাস্টারদা অনন্ত সিংহকে গীতার ভেতর সাংকেতিক চিহ্নে লিখলেন, "তুমি 'ভুলুর' কাজ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এখন তাকে মেয়ে জেনে অসন্তুষ্ট হবার হেতু কোথায় ?"

অনন্ত সিংহ মাস্টারদার চিঠি পেয়ে শান্ত হলেন।

যুব-বিদ্রোহের রথী-মহারথীরা কারান্তরালে। মেয়েদের বিপ্লবীদলে গ্রহণ করা সঠিক হয়েছে। অনন্ত সিংহ বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করলেন। তবুও অর্ধেন্দুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "অর্ধেন্দু, তুই ছাড়া কল্পনার সঙ্গে অন্য কেউ যেন না মেশে।"

অর্ধেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিজয় সেন আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। অনন্ত সিংহের পরবর্তী নির্দেশের খবর তিনি আর জানতে পারলেন না।

অনন্ত সিংহের আদেশ মতো অর্ধেন্দু রোজ গায়ে চাদর ও হাতে গীতা নিয়ে আদালতে যান। কাঠগড়ায় বসে গীতা পড়েন। আদালত থেকে ফেরার সময় বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে কেউ গীতাটি জেল-হাজতে নিয়ে যান।

অর্ধেন্দু গীতা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম প্রথম পুলিশ চেক্ করতে শুরু করলো। কিছুদিন পর পুলিশ গীতা উলটপালট করে অনুসন্ধান করা বন্ধ করে দিলো। পুলিশ হয়তো ভাবলো ধর্মপ্রাণ একজন বিপ্লবী আসামীকে অযথা হয়রানি করে লাভ নেই।

অনন্ত সিংহের ফন্দি কাজে লাগলো। পুলিশ অনন্ত সিংহের প্রথম কিস্তিতে মাত। গীতা জেলে নিয়ে গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় invisible ink (অদৃশ্য কালি) দিয়ে লিখে

অনন্ত সিংহ তাঁর পরিকল্পনার খসড়া মাস্টারদার কাছে পাঠাতে লাগলেন। অর্ধেন্দু হলেন, জেলে বন্দী বিপ্লবীদের সাথে মাস্টারদার সংযোগরক্ষাকারী। এদিকে অর্ধেন্দু গুহের পেছনে সাদা পোশাকের গোয়েন্দা পুলিশ এঁটুলির মতো লেগে আছে। কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিশকে তিনি চেনেন।

ছ' জন জামিনে মুক্ত বিপ্লবীদের থেকে মাস্টারদা অর্ধেন্দুকে পরিকল্পনার কাজে নির্বাচিত করার কারণ– তিনি পটিয়া থানার দক্ষিণ-ভূর্ষি গ্রামের ছেলে। চট্টগ্রাম শহরে তাঁর বাবা সারদাপ্রসন্ন গুহের ফটোর দোকান। শহর ও গ্রাম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। বয়স বছর সতের। গায়ের রং খুব ফরসা। বেঁটে। এক নজরে দেখলে মনে হয় বয়স আরো কম। মিতভাষী। বিচক্ষণ। সাহসী। পুলিশকে বোকা বানানোর সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে বর্তমান। শহরের সদরঘাট ক্লাবের সদস্য। অনন্ত সিংহের হাতে গড়া।

'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে অর্ধেন্দু গুহ সম্বন্ধে অনন্ত সিংহ লিখেছেন, "যুব-বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ের এই দ্বিতীয় প্ল্যান কার্যকরী করার অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, তাকেই বেছে নিয়েছিলাম। এই দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্ধেন্দু গুহ অতি সফলতার সঙ্গে পালন করেছে। প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরে—প্রতি পদক্ষেপে অর্ধেন্দু যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা ও অবিচলিত বৈপ্লবিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা বিরল। ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে আমরা অর্ধেন্দুর অপরিহার্য ভূমিকার বৃত্তান্ত জানতে পারবো।"

জালালাবাদ মুক্তি যুদ্ধের পর বাংলাদেশ বারুদস্তূপে পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রভাব বাংলার বিপ্লবী তরুণদের মনে নূতন জোয়ার এনে দিয়েছে।

২৫ আগস্ট ১৯৩০ সাল। কলকাতার বিপ্লবীদলের দু'জন সদস্য দুপুরে ডালহৌসী স্কোয়ারে কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে আক্রমণ করেন। বোমা ছুঁড়তে গিয়ে অনুজা সেনের বোমা তাঁর হাতেই ফেটে যায়। ফলে বোমার আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনুজা সেনের সাথী দীনেশ মজুমদার টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না। টেগার্ট রক্ষা পেলেন। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর হাতেও তিন জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। নিরুপায় হয়ে পালাতে চেষ্টা করলেন; হেয়ার স্ট্রীটে ধরা পড়লেন। তাঁর কাছে রিভলবার, বোমা ও কার্তুজ পাওয়া যায়। অনুজা সেনের মৃতদেহ তল্লাসী করে অনুরূপ জিনিস পাওয়া যায়।

দীনেশ মজুমদারের বয়স বাইশ বছর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র। তিনি ছাত্রী সংঘে লাঠিখেলা শেখাতেন।

টেগার্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ার পর বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। তারপর তিনি মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে যান। পরে কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ৯ জুন ১৯৩৪ সালে আলিপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

মিঃ টেগার্টকে আক্রমণের দু'দিন পর ২৭ আগস্ট ইডেন গার্ডেন পুলিশ আউট্-পোস্টে বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন পুলিশ ও দু'জন সাধারণ লোক আহত হয়।

ঢাকার বৈপ্লবিক সংস্থা বি. ভি. হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। তাঁরা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মেতে উঠলেন। বিপ্লবীদল খবর পেলো, জল পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ. এ. এস. বাড অসুস্থ। তিনি ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ভরতি। বাংলার ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ্‌. জে. লোম্যান মিঃ বাডকে হাসপাতালে দেখতে আসবেন। মিঃ লোম্যান যাতে ঢাকা থেকে ফিরে যেতে না পারেন তার জন্য দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হলেন, ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় বসু। তাঁর বাড়ি ঢাকা বিক্রমপুরের রাউতভোগ। বাবা রেবতীমোহন জামসেদপুরে থাকেন।

২৯ আগস্ট ১৯৩০ সাল। মিঃ লোম্যান ঢাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-অফ-পুলিশ মিঃ ই. হডসনকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ বাডকে হাসপাতালে দেখতে এলেন। হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে মিঃ লোম্যান ও মিঃ হডসনকে দেবদারু গাছের আড়াল থেকে তরুণ বিপ্লবী বিনয় বসু পিস্তল দিয়ে গুলি করেন। দু'জনের অবস্থা গুরুতর। বিনয় বসুকে সত্যেন সেন নামে একজন সরকারি কণ্ট্রাক্টর ধরতে যায়। বিনয় বসু এক ঘুষিতে তাকে ধরাশায়ী করেন। বিনয় বসুর রিভলবার পড়ে যায়। এবং তিনি উধাও হয়ে যান।

ডাক্তারেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও মিঃ লোম্যানকে বাঁচাতে পারলেন না। ৩১ আগস্ট ঢাকায় মিঃ লোম্যানের জীবনদীপ নিভে গেলো।

এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর তিনটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পুলিশের তৎপরতা অস্বাভাবিক-ভাবে বেড়ে যায়। ডালহৌসী স্কোয়ারের ঘটনার দিন রাত থেকে বিপ্লবীদলের বহু নেতা ও কর্মীদের জেলে বন্দী করতে শুরু করে। এবং তাঁদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়।

বাংলার বিপ্লবী আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি। আকাশে কালো মেঘ ঘন থেকে ঘনতর হয়ে চলেছে। বিপ্লবীরা অতি সতর্কতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন। তাঁদের প্রতি ভাগ্যদেবী মুখ টিপে হাসলেন। টেগার্ট সাহেব চন্দননগর গুপ্তঘাঁটির হদিস পেয়েছেন। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত কুড়িজন ইংরেজকে সঙ্গে করে, কলকাতা থেকে ছ' খানা গাড়িতে মাঝ রাতে চন্দননগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই গোপন খবর যাতে ফাঁস হয়ে না যায় তাই তিনি খুবই সতর্ক।

মিঃ টেগার্টের বাছাই করা বিশজন ইংরেজ সহযাত্রী হলেন—দু'জন ডেপুটি কমিশনার মিঃ ব্রাট্‌লি ও মিঃ ম্যাকার্ণিট, সাতজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার, দশজন ইংরেজ সার্জেণ্ট এবং একজন ইন্‌স্পেক্টার। এই অভিযান পরিচালনা করছেন স্যার চার্লস টেগার্ট স্বয়ং। রাত তিনটের সময় তাঁরা চন্দননগর পৌঁছলেন। গোঁদলপাড়ার কাছে গাড়ি থেকে মিঃ টেগার্ট দলবল নিয়ে নেমে পড়লেন। এবার তাঁরা হাঁটতে শুরু করলেন। অতি সাবধানে এগিয়ে গিয়ে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ঘেরাও করে ফেললেন।

বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রটি হলো—দোতলা বাড়ি। বাড়িটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা। বাড়ির পেছনের কম্পাউণ্ডের প্রায় সব জায়গা জুড়ে পুকুর। পুকুর পাড় খুব সরু। পাড়ের ওপর চারধারে প্রাচীর। বাড়ির সামনে উঠান পেরিয়ে কাঠের মজবুত ফটক। বাড়ির পেছনের কম্পাউণ্ডে বের হবার জন্য একটা ছোট দরজা দেওয়া আছে। বাড়িটি একটি দুর্গ বিশেষ।

বিপ্লবীরাও সদা সতর্ক। প্রতিদিন রাতে তাঁরা পালা করে ছাদের ওপর থেকে পাহারা চালু করেছেন। কতো বিনিদ্র রজনী পার করে দিয়েছেন। ১ সেপ্টেম্বর রাতে পাহারায় নিযুক্ত আছেন জেনারেল লোকনাথ বল ও বিদ্রোহী সৈনিক আনন্দ গুপ্ত। রাতের শেষ ভাগে বাড়ির প্রাচীরের অনতিদূরে কিছু কালো ছায়া তাঁরা দেখতে পেলেন। কালো ছায়াগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে পজিশন নিচ্ছে প্রাচীরের আড়ালে। যুদ্ধ বিশারদ হিসেবে জেনারেল বলের নাম ভারতবাসীর মুখে মুখে। অবস্থা অনুধাবন করে তিনি আঁচ করে নিলেন—শত্রু পক্ষ ব্যূহ রচনা করছে।

নিশীথের অতিথিদের যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে আপ্যায়নের জন্য আনন্দ গুপ্ত ও জেনারেল বল প্রস্তুত। গণেশ ও জীবন ঘোষাল (মাখন) ঘুমিয়ে আছেন। নিশীথ রজনীর যাত্রী আসার খবর পেয়ে তড়াক করে তাঁরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। এবং রিভলবারের ট্রিগারে আঙুল রেখে অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হলেন।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী (পুঁটুদি) ও শশধর আচার্যকে নিরীহ লোকের মতো বসে থাকার নির্দেশ দিয়ে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল দোতলা থেকে নেমে পড়লেন। পশ্চিমমুখী বাড়ি। বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বিপ্লবী চারজন খুব সাবধানতার সাথে একজনের পেছু একজন বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিধাতা বিমুখ। বিপ্লবীদের দেখে শত্রু পক্ষের বাঁশী বেজে উঠলো। একটা বাঁশীর শব্দ শুনে তারস্বরে অনেকগুলো বাঁশী বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অনেকগুলো টর্চলাইট জ্বলে উঠলো। এতোগুলো টর্চের আলোয় সমস্ত জায়গা আলোয় আলোময় হয়ে গেলো। সেই আলোতে ছুঁচ ও খুঁজে পাওয়া যাবে।

দু' পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। বিপ্লবীদের হাতে আছে মাত্র চারটি রিভলবার। শত্রু পক্ষের হাতে আছে—রিভলবার, রাইফেল, স্টেনগান, টমিগান প্রভৃতি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বিনিময় হচ্ছে। বৃষ্টিধারার মতো গুলি চলছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে তুবড়ি প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

মিঃ আর. ডি. টড একজন অশ্বারোহী সার্জেন্ট। তিনি চন্দননগর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সার্জেন্ট টড তাঁর জবানবন্দীতে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—"চারজন লোক সারিবদ্ধ হয়ে একজনের পেছনে একজন এগিয়ে আসছেন। সামনের লোকটি দেয়াল টপকানোর জন্য ওপরে হাত তুললেন। দেয়ালের বিপরীত দিকে একগজ দূরে আমি দাঁড়িয়ে আছি। টর্চের আলো জ্বেলে তাঁরা কে জানতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি ছুঁড়ি। এবং আমি প্রাচীরের আড়ালে গা-ঢাকা দিই। মিনিট খানেকের মধ্যে তাঁরা বেশ কিছু গুলি ছোঁড়ে। প্রথম লোকটি একগজ ব্যবধানে আমার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। তিনি ব্যর্থ হন। বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি আবার গুলি করেন। আমি দেয়ালের আড়ালে চলে যাই।⋯ জলে দাঁড়ানো লোকটি আগে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। পুকুরের অপরপ্রান্ত থেকে সম্ভবতঃ মিঃ ব্রার্টলি, কিম্বা মিঃ ম্যাকাণ্ট অথবা স্যার চার্লস টেগার্টের কাছে থেকে গুলি করার আদেশ শুনতে পাই। আমি বাধ্য হয়ে জলে দাঁড়ানো লোকটিকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি চালাই।"

যুদ্ধ শেষে চন্দননগরে বন্দী হলেন—গণেশ ঘোষ, জেনারেল লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত,

শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী। জীবন ঘোষাল নিহত।

জীবন ঘোষালের শরীরে ছ'টি গুলি লেগেছে। গুলি লাগার পর গড়িয়ে তিনি পুকুরের জলে পড়ে গেলেন। মৃত্যু মায়ের আশিস্‌ধারায় নেমে এলো। ধনীর দুলাল জীবন ঘোষাল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার চরণে জবা হয়ে ফুটে উঠলেন। দেশ-মাতৃকা তাঁর বীর সন্তানকে পরম স্নেহে বুকে টেনে নিলেন।

'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী' গ্রন্থে স্বাধীনতা সংগ্রামী আনন্দ গুপ্ত লিখেছেন—"অবশেষে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রায় সাড়ে চার মাস পরে ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উপস্থিত হ'ল জীবনের এই বহু প্রত্যাশিত অগ্নিপরীক্ষার দিন, ফরাসী চন্দননগরে।'

"…খিড়কির দুয়ার দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই একসঙ্গে গর্জে উঠলো শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র-গুলো এবং সেই সঙ্গে জ্বলে উঠলো অনেকগুলো টর্চ আমাদের লক্ষ্য করে। তীব্র আলোর রেখা কেন্দ্রীভূত হল আমাদের ওপর আর সেই আলোকোজ্জ্বল দেহগুলোকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি…।

"আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও অবশ্য নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিল না, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি দেহ পাঁচিলের আড়ালে এরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল এবং এতগুলো টর্চের তীব্র আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এতটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল যে, আমাদের রিভলবার ও পিস্তল-নির্গত গুলি কোথায় লাগছে বা না লাগছে তা' সঠিক দেখার ও জানার কোন উপায় ছিল না—তা' ছাড়া গুলির রসদও আমাদের ছিল যৎসামান্য।…

"প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে এই কয়জনের উপর চলল অবিরাম নির্যাতন—বীভৎস, অমানুষিক নির্যাতন। হাতের ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও রাইফেলের কুঁদো—সব কিছুরই সুপ্রচুর প্রয়োগ হল আমাদের শৃঙ্খলিত দেহের ওপর।

"এমনকি সুহাসিনীদিও রেহাই পাননি সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে। তাঁর দেহের উপরও চড়, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি—এর কিছুই বাদ যায় নি!"

"…আমাদের অল্প কয়েকটি দেহ অথচ ঐ কয়েকটি দেহের ওপর এতগুলি হিংস্র সার্জেন্ট, পুলিশ-কর্মচারী, গোয়েন্দা—কর্মচারী প্রভৃতি সবাই তাদের পুলিশসুলভ জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্য যেন কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল! ঊর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীরাও বাদ গেল না সেই নিষ্ঠুর পশুসুলভ ক্রীড়া থেকে।…

"শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি কথার আগে ও পরে সংযুক্ত ছিল বাছা বাছা শ্বেতাঙ্গসুলভ বিশেষণ যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করলে সভ্যতার নিম্নতম সীমাও লঙ্ঘন করে ইতরতার গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হয়!

"স্পষ্ট শুনতে পেলাম গণেশদার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জবাব—'I have nothing to say' (আমার কিছুই বলার নেই।)—তারপর নির্যাতনের কঠোরতা যতই উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল গণেশদার জবাবও হ'ল ততই সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ ও অবিচলিত। শুধু একমাত্র একটি আওয়াজ বার বার কানে এসে বাজল: 'Nothing!' …'Nothing'! 'Nothing!' ('কিছুই না!'…'কিছুই না!'…'কিছুই না!')"

পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিপ্লবীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো —বিপ্লবীরা চন্দননগরের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে রিভলবারের কার্তুজ তৈরির একটি ছোট কারখানা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা গবেষণা করে অভিনব পদ্ধতিতে রিভলবারের কার্তুজ তৈরি করেন। এবং সাফল্যলাভে সক্ষম হন। সাফল্যের পুরস্কার স্বরূপ বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি পায়।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের স্মারক পুস্তিকায় 'চন্দননগর সংঘর্ষ' প্রবন্ধে গণেশ ঘোষ লিখেছেন,—"দুর্ভাগ্যের কথা ঠিক এই সময়ে জেলে বন্দী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে চন্দননগরের বাড়ি সম্পর্কে সমস্ত কথাই পুলিশকে বলে দেয়। এই লোকটি চন্দননগরের ঐ বাড়ির কথা জানতো এবং কয়েকবার ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। এই লোকটিই ৩১ শে আগস্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে পুলিশের সাথে গিয়ে চন্দননগরের ঐ বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল।"

দু ঘণ্টা ধরে পুলিশী অত্যাচারের পর বিপ্লবীদের কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হলো। তাঁদের নিয়ে চললো চন্দননগর পাব্লিক প্রসিকিউটারের অফিস। পাব্লিক প্রসিকিউটার তাঁদের মামুলি কটি প্রশ্ন করলেন। বিপ্লবীদের বক্তব্য হলো —যদি কিছু বলার থাকে আদালতের বিচারের সময় তা তাঁরা বলবেন।

পাব্লিক প্রসিকিউটার অফিস থেকে পুলিশ ভ্যানে তুলে হুগলী জেলে আনার সময় চন্দননগরেরই ইস্কুল-কলেজের ছাত্র ও জনসাধারণ রাস্তার দুধারে উপচে পড়ছে। বিপ্লবী বন্দীদের প্রতি সম্মান জানাতে জনতার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠলো—'বন্দে মাতরম্! Long Live Revolution!' (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক) প্রভৃতি। তারপর চন্দননগরের নাগরিকেরা জীবন ঘোষালের মরদেহ নিয়ে বিরাট শোক-মিছিল করে, শহিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

ধনীর দুলাল জীবন ঘোষাল চন্দননগরের মাটিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রইলেন। বিপ্লবের এক বহ্নিশিখা নিভে গেলো।

ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় জীবন ঘোষাল যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮ এপ্রিল পাহাড়তলী অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার আক্রমণের জন্য যে মোটর গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল তিনি তার চালক ছিলেন। প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েও পরাধীন ভারতমাতার ডাকে সানন্দে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর জেঠা ব্যারিস্টার মিঃ জে. কে. ঘোষাল বন্দী বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জীবন ঘোষাল বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বে বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে ষোল শ' টাকা দিয়েছিলেন।

চন্দননগর থেকে বিপ্লবীদের আনা হলো হুগলী জেলে। পরদিন হুগলী জেল থেকে কলকাতার লালবাজার থানায়। তারপর গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তকে বিচারের জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হলো। ৫ সেপ্টেম্বর তাঁরা চট্টগ্রাম জেলে পৌঁছলেন। মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের সনাক্তকরণের ব্যবস্থা হয়। ফেণী সংঘর্ষে যে-সব পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন এবং বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হয়েছিলেন তাঁরা গণেশ ঘোষ ও আনন্দ গুপ্তকে চাকরি রক্ষার খাতিরে সনাক্ত করতে বাধ্য হলেন।

চন্দননগরের বন্দীদের মধ্যে শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে কলকাতায় রাখা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো—ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত

অপরাধীদের তাঁরা আশ্রয় দিয়েছেন। চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশ। চন্দননগরের অধিবাসীরা ইংরেজ শাসনে শাসিত নয়। যেভাবে কেস্ সাজানো হয়েছে তা চন্দননগরের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ব্রিটিশ পুলিশ বেআইনীভাবে চন্দননগরে ঢুকে জীবন ঘোষালকে হত্যা করেছে। এই অভিযোগ এনে জীবন ঘোষালের শোকাতুর পিতা মিঃ টেগার্টের নামে পণ্ডিচেরীর ফরাসী আদালতে মামলা দায়ের করেন। ফলে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে ছুটে এলেন। তারপর ব্রিটিশ সরকার শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীর মামলা তুলে নিলেন। এবং তাঁদের মুক্তি দিলেন।

এদিকে চট্টগ্রাম জেলে অন্য নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলে ভারতীয় প্রহরীর পরিবর্তে শ্বেতাঙ্গ প্রহরী মোতায়েন করা হলো। জেলের ছাদের ওপর মেশিনগান দিয়ে ইংরেজ প্রহরী নিযুক্ত হলো। প্রাচীরের বাইরে কাঁটা-তারের ঘেরা। দেয়ালের কোণায় কোণায় সশস্ত্র সৈন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। জেলের সব রকম সাধারণ আইন-কানুন বাতিল করে দিয়ে জেলকে সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করলো।

'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো—

ফেণীতে গুলি মারার আরও নূতন সংবাদ

"ইয়াকুব আলী পূর্বে ফেণী পুলিশ থানায় কনেষ্টবল রূপে চাকুরী করিত। ২২ শে এপ্রিল রাত্রিতে ফেণী স্টেশনে গুলি দুর্ঘটনায় তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তজ্জন্য বর্তমানে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইলে সে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষকে সনাক্ত করিয়া বলে যে, উক্ত আসামীই ফেণী স্টেশনে মলমূত্র ত্যাগ করিবার অছিলায় বাহিরে গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আনন্দবাবুকে দেখাইয়া বলে যে, সে তাহাকে এবং কনেষ্টবল মণীন্দ্র পালকে গুলি করিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত অনন্ত সিংহকে দেখাইয়া বলে যে, সেই প্রথম গুলি চালায়।

[বঙ্গবাণী : ১৮-১২-৩০]

ব্যারিস্টার শরৎ বোস মামলা পরিচালনা করতে এসে বুঝলেন, এই মামলা মিটবার নয়। ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের ছলেবলে ও কৌশলে ফাঁসিতে না লটকিয়ে ছাড়বেন না। বিপ্লবীদের মুক্তি পেতে হলে, সোজা পথে হবে না।

এক রোববার শরৎ বোস জেলে অনন্ত সিংহের সঙ্গে মামলার বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখা করতে গেলেন। তিনি অনন্ত সিংহকে জিজ্ঞেস করলেন, "জেল থেকে পালাতে পার?"

জবাবে অনন্ত সিংহ বললেন, "চেষ্টা করতে পারি।"

শরৎ বোস অনন্ত সিংহকে জেল ভেঙ্গে পালাতে যতো টাকা লাগবে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কতো টাকার প্রয়োজন তা জানতে চাইলেন। অনন্ত সিংহ পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ হাজার টাকার চাহিদা পেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হলো মামলা দীর্ঘস্থায়ী করা বাঞ্ছনীয়। বিচারাধীন বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তাঁদের পক্ষসমর্থনের জন্য শরৎ বোস চন্দননগরের ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র

বোসকে ঠিক করে দিলেন। শ্রীশ বোসের পারিশ্রমিক শরৎ বোস জুগিয়ে যেতে লাগলেন। শ্রীশ বোস দীর্ঘ দু' বছর বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করেছিলেন।

এখানেই বিপ্লবীদের প্রতি মানবিকতা ও স্বাধীনতার পূজারী শরৎ বোসের কর্তব্যের শেষ নয়। জেল ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বসে রইলেন না। ইতিমধ্যে জামিনে মুক্ত অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে শরৎ বোসের পরিচয় হলো। শরৎ বোস তাঁকে 'শিশু' ডাকেন। 'শিশুর' মাধ্যমে শরৎ বোস গোপনে মাস্টারদার কাছে খবর পাঠালেন, মাস্টারদা যদি ইচ্ছা করেন তিনি তাঁকে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

শরৎ বোসের প্রেরিত সংবাদ শুনে অর্ধেন্দুকে মাস্টারদা বললেন, "শরৎবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বলবে, এখনও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক দেরি। আমার বিশজন সাথী স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আরো কতোজনকে হারাতে হবে জানি না। এ মতো অবস্থায় কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

সংবাদ বাহক 'শিশুর' মুখে সূর্য সেনের জবাব শুনে শরৎ বোস মুগ্ধ।

কিছুদিন পর শরৎ বোস শেষবারের মতো চট্টগ্রাম গেলেন। একদিন কোর্ট থেকে ফেরার পথে 'শিশুকে' (অর্ধেন্দু গুহ) তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় 'শিশুকে' নিয়ে গেলেন। তারপর 'শিশুর' হাতে চারটি টি. এন টি. বোমা এবং দু' হাজার টাকা মাস্টারদাকে দেওয়ার জন্য দিলেন। তখন সন্ধ্যা। বোমা ও টাকাগুলো কাঁধে ঝোলানো থলিতে নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলেন তিনি।

দেশমাতৃকার পূজারী প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শরৎ বোস সূর্য সেনের জন্য কলকাতা থেকে বয়ে এনেছেন চারটি তাজা হাতবোমা। চারদিকে মিলিটারি আর পুলিশের সজাগ দৃষ্টি। বোমা নিয়ে ধরা পড়ার বিপদকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তিনি কতো বড় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বদেশপ্রেমী তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা অতুলনীয়। বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি একজন মহান ঋষি তুল্য।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়' প্রবন্ধে অর্ধেন্দু গুহ লিখেছেন—"মাস্টারদার উত্তর শুনে শরৎচন্দ্র বসু অভিভূত হয়ে যান এবং তার কিছুদিন পরে যখন তিনি শেষবারের মত চট্টগ্রামে আসেন তখন তিনি তাঁর সুট্-কেস্ থেকে চারটি তাজা T.N.T. বোমা এবং দু' হাজার টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'মাস্টারদাকে দিও এবং তাঁকে বলো, আমার প্রস্তাবে যে জবাব তিনি দিয়েছেন তাঁর উত্তরে এ হচ্ছে তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধার উপহার।' এই উপহার পেয়ে মাস্টারদা যথার্থই মুগ্ধ হন এবং শরৎচন্দ্র বসুর অদ্ভুত সাহস ও গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।"

চট্টগ্রাম জেলের বাইরে মিলিটারি। জেলের ভেতর ইংরেজ ওয়ার্ডার ও ইংরেজ জেলার। তার ওপর বন্দুক নিয়ে পাহারায় রত সেপাইদল। সকলেই কুড়ি-বাইশ বছরের অনুগত কর্মী। এখন উপায়? অন্ধকারের শেষে আলোর দেশ। জলকে তো পথ দেখাতে হয় না। জল আপন শক্তিতে পথ করে নেয়। বিপ্লবীদের বিপৎসংকুল পথে নিয়তই চলতে হয়। অনন্ত সিংহের ভাবনা এবং গণেশ ঘোষের পরিকল্পনা যৌথভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠলো। তাঁরা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে একজন জেল ওয়ার্ডারকে হাত করলেন। ইংরেজ ওয়ার্ডার

প্রতিটি অস্ত্র জেলের ভেতর নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ শ' টাকা দাবি করলো। তাতেই তাঁরা রাজী।

মামলা চলাকালীন আদালতের লোহার খাঁচায় বসে অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে বললেন, "একজন ইংরেজ ওয়ার্ডারকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশ করেছি। তুই আজ বিকেলে দেবপাহাড়ে যাবি। দেবপাহাড়ের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতে লাল রুমাল নিয়ে গিঁঠ দিবি আর খুলবি। যে ইংরেজ লোকটি তোর কাছে যাবে তাকে পাঁচ শ' টাকা দিবি। একটি খেলনা রিভলবার ভালোভাবে কাপড়ে জড়িয়ে তার হাতে দিবি। রিভলবারটি এনে দিলেই বুঝবো টোপ গিলেছে।"

অনন্ত সিংহের নির্দেশ মতো অর্ধেন্দু দেবপাহাড়ে গেলেন। এবং টয়্-রিভলবারটি কাপড়ে জড়িয়ে এক ইংরেজকে দিলেন। দু-তিন দিনের মধ্যে টয়্-রিভলবারটি অনন্ত সিংহের হাতে পৌঁছলো না। জেল ওয়ার্ডার কাজে অনুপস্থিত। খবর নিয়ে জানা গেলো, ইংরেজ জেল ওয়ার্ডারটা মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে বদলি নিয়ে চলে গেছে।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ভাবনায় পড়লেন। তাহলে সবই ভেস্তে যাবে? না, তা হতে পারে না। যে মাটিতে আছাড় খেয়েছে সেই মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাঁরা উঠে-পড়ে লাগলেন। আবার একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডারকে টাকার বিনিময়ে প্রভাবিত করলেন। অর্ধেন্দু একই কায়দায় প্রথমে খেলনা রিভলবার মোড়কে করে দিলেন। মোড়কটি যথা-সময়ে অনন্ত সিংহের হাতে পৌঁছলো। এই ওয়ার্ডার দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য জেলের মধ্যে আসতে লাগলো। টাকার স্রোত বয়ে চললো সমানে। ইতিমধ্যে আর একজন ইংরেজ ওয়ার্ডারকে হাত করলেন।

'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়' প্রবন্ধে অর্ধেন্দু গুহ লিখেছেন, "ইতিমধ্যে জেলের দু' জন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার মিঃ ব্রুম ফিল্ড ও মিঃ রাইটকে অনন্তদা ও গণেশদা জেলের ভিতর থেকে বহু টাকার বিনিময়ে প্রভাবিত করে আমার সঙ্গে সংযোগ করে দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি তিনটি আর্মি রিভলবার, প্রচুর কার্তুজ, কয়েকটি হাতবোমা, ইন্দুমতী সিংহ মারফত আগরতলা মহারাজার অস্ত্রাগার হতে সংগৃহীত দু' ডজন বিদেশী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ডিনামাইট, প্রায় আধমণ ল্যাণ্ডমাইনের বারুদ, দশখানা বড় ডেগার প্রায় পঞ্চাশ গজ ইলেট্রিক তার, বেশ খানিকটা গান-কটন, শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অনেকগুলি বড় বড় টর্চের ব্যাটারি ও ইলেকট্রিক বাল্‌ব এবং নানা ধরনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জেলের ভেতর পাঠিয়ে দিই।"

জেলের ভেতর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য প্রায় ত্রিশজন বন্দী বিপ্লবীদের মধ্যে মাত্র দশ-বারোজনকেই মনোনীত করা হলো। ষড়যন্ত্রমূলক কাজে নিযুক্ত বিপ্লবীদের দু' ভাগে বিভক্ত করা হলো। একদলের দায়িত্ব পড়লো— সার্জেন্ট, জেলার এবং ওয়ার্ডারদের কথাবার্তায় ব্যস্ত রাখবেন। আর কয়েকজন মাঠে গল্প করার ছলে গোল হয়ে বসে, অস্ত্রশস্ত্রগুলি গর্ত খুঁড়ে মাটির নীচে পুঁতে রাখবেন। প্ল্যান অনুসারে কাজ শুরু হলো। মাঠের দশ-বারো জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র পুঁতার কাজ সুসম্পন্ন। উদ্দেশ্য—ডিনামাইট ও ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে বন্দী বিপ্লবীদের মুক্ত করা। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের নির্দেশে অস্ত্রশস্ত্র কোথায় কোথায় পোঁতা হয়েছে এ খবর যাঁরা জানেন তাঁরা

হলেন—সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত ও সহায়রাম দাস প্রমুখ।
দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো—বন্দী মুক্তির একই সময়ে ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে চট্টগ্রাম শহরের প্রশাসন অচল করা।

বাংলার ইন্‌স্‌পেক্‌টার জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ্‌. জে. লোম্যান নিহত হবার পর তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন মিঃ টি. জে. ক্রেগ। নূতন পদে বহাল হয়ে তিনি পুলিশের কাজকর্ম পরিদর্শনে চট্টগ্রাম আসার কথা। এই সময় অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল চট্টগ্রাম জেলে। গোপনসূত্রে অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ এ খবর জানতে পারলেন। প্রবল আগ্রহের সাথে তাঁরা জানতে চাইলেন, মিঃ ক্রেগ কয়দিন চট্টগ্রামে থাকবেন, কোন্‌ ট্রেনে আসবেন এবং কখন ফিরবেন ইত্যাদি। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জয় হলো। মিঃ ক্রেগের সফরসূচীর সমস্ত খবর তাঁদের জানা হয়ে গেলো। খবর সংগ্রহ করার পর অনন্ত সিংহের মাথায় খুন চেপে গেলো। তিনি গণেশ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দু'জনের আলোচনায় স্থির হলো, মিঃ ক্রেগ যাতে জীবন্ত ফিরে যেতে না পারেন তার একটি পরিকল্পনা রচনা করলেন। সংকল্পকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব। সময় যে খুবই কম।
কালবিলম্ব না করে মিঃ ক্রেগের আগমনবার্তা মাস্টারদাকে পাঠাতে হবে। দেরি যে আর সয় না। কিন্তু সময়ের প্রতীক্ষায় তাঁদের থাকতেই হবে। জামিনে মুক্ত বিপ্লবী অর্ধেন্দু গুহ কোর্টে এলে তাঁর মারফত মাস্টারদার কাছে পরিকল্পনাটি পাঠাতে হবে। কিন্তু অর্ধেন্দুর ওপর ছ'জন গোয়েন্দার বারোটি চোখের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অনন্ত সিংহ অস্থির হয়ে একটানা ভেবে চললেন।
মামলা চলাকালীন আদালতের লোহার খাঁচায় বসে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ পরিকল্পনাটি অর্ধেন্দুকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কেননা অর্ধেন্দু ভালো করে বুঝে নিয়ে যাতে মাস্টারদাকে খবরটি নিখুঁতভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম হন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের প্রতিটি কথা অর্ধেন্দু তাঁর স্মৃতির পাতায় যেন লিখে নিলেন।
কোর্ট থেকে ফিরে অর্ধেন্দু সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের পথে পা বাড়ালেন। মাস্টারদা কোন্‌ আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন তাঁর জানা নেই। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে যে আশ্রয়কেন্দ্রে গেলেন সেখানেই মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেলো। মাস্টারদা সব মনোযোগ সহকারে অর্ধেন্দুর মুখে খবরটি শুনলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নেতা নির্মল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য।
রাতের শেষ প্রহর। অর্ধেন্দুকে পরদিন কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। তার দেরি নয়। রাতের অন্ধকারে তাঁকে আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করতেই হবে। নিশাচর পাখি যেমন রাতের অন্ধকারে বিচরণ করে, আবার ভোর হবার আগে বাসায় ফেরে তেমনি অর্ধেন্দুকে রাতারাতি কাজ শেষ করে ফিরতে হবে।
বিদায় আসন্ন। মাস্টারদা অর্ধেন্দুকে বললেন, "অনন্তলাল ও গণেশকে বলবি, পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হবে। এতো কম সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়া যতই কঠিন হোক না কেন তার নিশ্চয়ই বন্দোবস্ত করা হবে।"

অর্ধেন্দু গুহকে বিদায় দিয়ে মাস্টারদা পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্বে মনোনিবেশ করলেন। কালীপদ চক্রবর্তী ও বিনোদ দত্ত তখন কোয়েপাড়া গ্রামে বিনয় সেনের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন। খবর পেয়ে তাঁরা সাম্পানে কর্ণফুলি নদীর ওপারে শ্রীপুর গ্রামে মণীন্দ্র মজুমদারের বাড়ি এলেন। তখন বেলা দুপুর। ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন, পলাতকদের মধ্যে মাস্টারদা, নির্মল সেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ও শচীন সেন বসে আছেন। কোয়েপাড়া থেকে বিনয় সেনও এসেছেন।

শুরু হলো জরুরী মিটিং। বিষয়—মিঃ ক্রেগকে হত্যার পরিকল্পনা। এ কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য মাস্টারদা প্রথমে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও বিনোদ দত্তকে মনোনীত করলেন। কিন্তু কালীপদ চক্রবর্তী তাঁর সীনিয়রিটির দাবি ছাড়তে মোটেই নারাজ। এ ছাড়া তিনি বিনোদ দত্তের বিপ্লবী জীবনের দীক্ষাগুরু।

না, বিনোদ দত্তও এই সুবর্ণ সুযোগ কিছুতেই হারাতে চান না। ফলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হলো। কার আগে কে প্রাণ দেবে এ নিয়ে পড়ে গেলো কাড়াকাড়ি। রামকৃষ্ণ ও কালীপদকে মাস্টারদা কাজের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। মাস্টারদার অভিমত হলো—বোমার চেয়ে রিভলবার ব্যবহার করাই শ্রেয়। তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। রিভলবার ও বোমা নিয়ে রাত বারোটায় শ্রীপুর গ্রাম থেকে রামকৃষ্ণ ও কালীপদের সঙ্গে সহচরের ভূমিকা নিয়ে চললেন শচীন সেন।

রাতের গাঢ় অন্ধকার। তাঁরা সাম্পানে চাপলেন। সাম্পান উজানে চললো। সাম্পান গন্তব্যস্থলে পৌঁছলো। তাঁরা সাম্পান থেকে বাকলিয়ায় নামলেন।

গ্রামের আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বড় রাস্তায় উঠলেন। কাতালগঞ্জে রামকৃষ্ণের কলেজ সহপাঠী সরোজ রায়ের বাড়ি পৌঁছলেন। তখনো রাত। তাঁরা শুয়ে পড়লেন।

সকালবেলা অর্ধেন্দু গুহ সরোজ রায়ের বাড়ি গিয়ে রামকৃষ্ণ ও কালীপদের সাথে দেখা করলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। এবং তিনি পরবর্তী কাজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করলেন।

বিকেল পাঁচটায় রামকৃষ্ণ ও কালীপদ মোটরগাড়িতে কুমিরা রেলস্টেশনে পৌঁছলেন। রাত সাড়ে ন'টায় গাড়ি এসে কুমিরা স্টেশনে থামলো। সেই গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে বিপ্লবী সদস্য সুশীল সেন নামলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ও কালীপদকে মিঃ ক্রেগের কামরাটা দেখিয়ে দিলেন।

কালীপদ চক্রবর্তী সুশীল সেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে মিঃ ক্রেগ তা তুমি বুঝলে কি করে?"

জবাবে সুশীল সেন বললেন, "জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস. পি., ডি. এস. পি. ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিগণ তাঁকে স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলেন।"

মিঃ ক্রেগ দেখতে কেমন জানতে চাইলে সুশীল সেন মিঃ ক্রেগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। বর্ণনা শুনে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ সেই রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় চাপলেন। গাড়ি তীরবেগে ছুটে চলেছে। বিপ্লবীদের মনে একটিমাত্র চিন্তা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। গাড়ি এসে লাকসাম স্টেশনে থামলো। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ লাকসাম স্টেশনে নেমে কলকাতার টিকিট কাটলেন। এবার চাঁদপুরগামী ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়

চাপলেন। পাশেই মিঃ ক্রেগের কামরা। তাঁদের দৃঢ়সংকল্প—চাঁদপুর, গোয়ালন্দ অথবা শিয়ালদহ স্টেশনের যেখানেই হোক, মিঃ ক্রেগকে সুযোগ মতো আক্রমণ করে পৃথিবী থেকে তাঁরা সরিয়ে দেবেনই। বিপ্লবীদের হাত থেকে নিস্তার তিনি পাবেন না।

ভোর চারটা। চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। প্ল্যাটফরমের আলোগুলো কুয়াশার জন্য অস্পষ্ট। চাঁদপুর স্টেশনে ট্রেন এসে থামলো। যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করলো। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ গাড়ি থেকে নামলেন।

নেমেই দেখলেন, একজন লম্বা লোক মিঃ ক্রেগের কামরা থেকে নামলেন। পরনে খাকী পোশাক। মাথায় হ্যাট। তাঁদের দিকে পেছন ফেরা। লোকটির মুখ তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। লোকটিকে ঘিরে প্রায় ত্রিশজনের মতো লাঠিধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ তাঁকে সালাম জানাচ্ছে। তাঁরা ভাবলেন, লম্বা লোকটি মিঃ ক্রেগ ছাড়া আর কেউ নন।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের স্মারক পুস্তিকায় 'চাঁদপুর সংঘর্ষ' নিবন্ধে শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথী কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন—"আমরা উভয়েই বেষ্টনী ভেদ করে দু' হাত আড়াই হাতের মধ্যে লোকটার উপর গুলি চালালাম। গুলির শব্দে সব লাঠিধারী পুলিশ মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। প্ল্যাটফরম সম্পূর্ণ খালি।

গুলিবিদ্ধ হয়ে লোকটা দৌড়াতে চেষ্টা করল। যেন হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ান, মৃত্যু-পূর্বের বাঁচবার শেষ প্রচেষ্টা। পেছনে আমরা প্রায় তার পিঠের উপর ব্যারেল বসিয়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। গুলি ছোঁড়ার বিরাম নাই, দু'জনে বার রাউণ্ড গুলি চালিয়ে চেম্বার খালি করলাম।

রাইফেলের গুলির মত ওয়েভলির এক একটা গুলিতে লোকটার পৃষ্ঠদেশ ঝাঁজরা হয়ে গেল। লোকটা হুমড়ি খেয়ে 'বাবা গো গেলুম' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।"

২রা ডিসেম্বর ভোরে ভুলে তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী রেললাইন ধরে লাকসামের দিকে হাঁটতে লাগলেন। প্রায় বেলা দশটায় হাজিগঞ্জ স্টেশন পার হয়ে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলেন, চাঁদপুরে একজন এস. ডি. ও. গুলিতে নিহত হয়েছেন।

এবার তাঁরা রেললাইন ছেড়ে ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটতে লাগলেন। তাঁদের পরনে ধুতি। গায়ে সার্ট ও কোট এবং সবুজ ও লাল রঙের আলোয়ান। পায়ে কেড্‌স সু। সবুজ রঙের আলোয়ানটি কালীপদর গায়ে জড়ানো। লাল রঙের আলোয়ানটি রামকৃষ্ণের গায়ে।

লাল ও সবুজ রঙের আলোয়ান জড়ানো দুই যুবকের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে তাঁদের মোটেই খেয়াল নেই। তাঁরা প্রায় বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করলেন। হঠাৎ একখানা মোটরগাড়ি এসে তাঁদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। পলকেই ছ'জন সশস্ত্র পুলিশ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁদের ঘিরে ফেললো। এবং বোমা ও রিভলবার ছিনিয়ে নিলো। পুলিশ বোমাগুলি মাঠের আটকানো জলে ডুবিয়ে রাখলো।

এই বোমাগুলি মনোরঞ্জন রায় (ক্যাবলা রায়) কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতা পৌঁছানোর পরদিন চব্বিশে নভেম্বর গ্রেপ্তার বরণ করেন। ভাগ্যের এমনি পরিহাস তিনি বন্দী হবার সাতদিন পর তাঁর সংগৃহীত বোমা পুলিশের হাতে জমা পড়লো।

গ্রেফতারের পর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে কিছুটা মারধোর করলো পুলিশ। তারপর হাতকড়ি পরিয়ে মোটর গাড়িতে তুললো। বিকেল পাঁচটায় গাড়ি কুমিল্লা শহরে পৌঁছলো। এ. এস. পি. প্রথমে তাঁদের নিয়ে গিয়ে, কুমিল্লার পুলিশ সুপার মিঃ মারের বাসার সামনে গাড়িখানা দাঁড় করালেন। পুলিশ সুপারের আনন্দ আর ধরে না। তিনি তাঁর গলার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিতে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, বিপ্লবীদের ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। আসামী দু'জন নির্বিকার।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিপ্লবী দু'জনকে ডি. আই. বি. অফিসে হাজির করা হলো। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, রিভলবার দুটি তাঁদের কিনা। তাঁরা অস্বীকার করলেন।

সন্ধ্যায় তাঁদের কুমিল্লা জেলে ঢোকানো হলো। গভীর রাত। তাঁদের ঘুম থেকে জাগিয়ে জেল—অফিসে নিয়ে গেলো। সেখানে দু'জন ইংরেজ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ইংরেজ দু'জনের মধ্যে একজন হলেন, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার মিঃ সুটার। অপরজন হলেন মিঃ ক্রেগ স্বয়ং।

মিঃ ক্রেগকে দেখে শৃঙ্খলিত বিপ্লবীদের দেহে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠলো। মনের মধ্যে এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের সৃষ্টি করলো। তারপর ভুলের জন্য সীমাহীন আফসোসের ফলে তাঁদের মেরুদণ্ডকে দিলো নুয়ে। হায়রে! বিধিলিপি। শিকারী যেন শিকারের হাতে জব্দ হয়ে গেলো।

জিজ্ঞাসাবাদে বিপ্লবীদের নাম-ধাম এবং কোথায় যাচ্ছিলেন ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো উপলক্ষ্য। মিঃ ক্রেগের লক্ষ্য—যাওয়ার আগে বিপ্লবী আততায়ীদের দেখে যাওয়া।

মিঃ ক্রেগ চাঁদপুরে সেই রেলগাড়ির কামরায় ছিলেন। সুশীল সেনের খবর নির্ভুল। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার তারিণী মুখার্জী রেলগাড়ির কামরা থেকে নামার কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ ক্রেগ নামতেন।

বিপ্লবীরা তারিণী মুখার্জীকে খতম করার পর অন্ধকারে সরে পড়েন। মিঃ ক্রেগ লক্ষ্যহীন-ভাবে গুলি ছুঁড়ে ছিলেন। তখনো বিপ্লবীরা জানতেন না মিঃ ক্রেগ সেই কামরায় আছেন। চাঁদপুরের ঘটনা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রে কি লিখেছে দেখা যাক।

চাঁদপুর গুলি বর্ষণের বিস্তৃত বিবরণ

২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে প্রথমেই সরকারী কৌঁসুলী আদালতকে জানান যে, এই মামলার রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্তী নামক দুইজন ফেরারী আসামীকে চাঁদপুরের নিকটবর্তী এক জায়গায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উক্ত আসামীদ্বয় চাঁদপুরের রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টারকে গুলি মারিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহাদের নিকট রিভলবার বোমা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ঐ রিভলবারই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে খোয়া গিয়াছিল। ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই ঐ আসামীদ্বয় ফেরার অবস্থায় থাকে। এক্ষণে এই আসামী দুইজনকে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইন

অনুযায়ী এবং পুলিশ ইন্সপেক্টার হত্যার দরুন বিচারার্থে কুমিল্লা নেওয়া হইবে।

[বঙ্গবাণী : ৮. ১২. ৩০

মিঃ ক্রেগ বরাতের জোরে বেঁচে গেলেন। তাঁর ফাঁড়া কেটেছে কিনা বলা শক্ত। বাংলার আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ। তিনি কলকাতায় ফিরে ভাবছেন, কি করে বিপ্লবীদের শায়েস্তা করা যায়। এদিকে বাংলার বিপ্লবী নায়কেরাও শাসকগোষ্ঠীর হৃদস্পন্দন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। দু' পক্ষেই সাজ সাজ রব।

ঢাকা জেলার 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (সংক্ষেপে বি. ভি.) বাহিনী মিঃ লোম্যানকে হত্যা করে শান্ত হতে পারেন নি। তাঁদের মনে বড় দুঃখ অহর্নিশ বাজছে।

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সত্যাগ্রহীদের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে রাখাকে কেন্দ্র করে, আলিপুর জেলে সত্যাগ্রহীরা অসন্তোষে ফেটে পড়েন। অসন্তোষের বিষয় জানতে নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে এলেন—জাতীয় নেতা পরম শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্য বক্সী প্রমুখ প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ।

জেলে পাগলা ঘন্টি বাজলো। জেল-সুপার সোমদত্-এর নির্দেশে বন্দীদের ওপর লাঠিপেটা শুরু হলো। ফলে ভারতবাসীর অতি প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু গুরুতর আহত হন। বাঁচবেন কিনা ভগবান জানেন।

এ খবর আলিপুর জেলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কলকাতা মহানগরীর বুকে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী ছেলেরা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিলো। বি. ভি.-র দু'জন সদস্য সোমদত্কে হত্যার জন্য রিভলবার নিয়ে বের হলেন।

সোমদত্ পাঞ্জাবী। অবস্থা বেগতিক দেখে বাংলা দেশ ছেড়ে সোমদত্ উধাও। তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

বি. ভি.-র নেতৃবর্গের রোষ প্রশমিত হলো না। তাঁদের চিন্তার স্রোত অন্য দিকে বয়ে চললো। নাটের গুরু হলো, ইংরেজ শাসকদল। তাঁরা ভারতীয়কে দিয়ে ভারতের বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে ওস্তাদ। উদ্দেশ্য—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

সত্যাগ্রহী আন্দোলনের বন্দীদের ওপর লাঠি চার্জের আদেশ জেল-সুপার সোমদত্ দিলেও প্রকৃতপক্ষে কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেলের মদত ছাড়া হতে পারে না। তাই আসল শত্রুকে নিধন করাই শ্রেয়। বুঝুক বাংলার বিপ্লবীরা এখনো মরে যায়নি।

ভারতের পূর্বদিগন্তের উদিত চট্টল-সূর্যের আলোকে বিপ্লবের আকাশ আলোকিত। বিপ্লব-সূর্য সূর্য সেন যে সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন তার তপ্ত কিরণে দগ্ধ হচ্ছে ইংরেজ শাসককুল।

বি. ভি.-র পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার নয়। বিনয় বোস ঢাকায় মিঃ লোম্যানকে হত্যা করে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় পৌঁছে গেছেন।

এবারের টার্গেট বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্টেন্যান্ট কর্ণেল সিম্পসন। তাঁর দপ্তর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং। এটি ইংরেজদের শক্ত ঘাঁটি। মিঃ সিম্পসনকে হত্যার জন্য বি. ভি.-র নেতৃবর্গ তিনজন প্রথম সারির সদস্যকে মনোনীত

করলেন। তাঁরা হলেন—বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত (বাদল গুপ্তের ভালো নাম সুধীর গুপ্ত) ও দীনেশ গুপ্ত।

বাদল গুপ্তের বাড়ি বিক্রমপুরের পূর্ব শিমুলিয়া গ্রাম। বাবার নাম অবনী গুপ্ত। বাদলের বয়স মাত্র বছর আঠারো।

বি. ভি.-র এ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য নিকুঞ্জ সেনের ছাত্র বাদল। তখন তিনি বিক্রমপুরের বানরী ইস্কুলের শিক্ষক। তিনি বাদলকে কেবল ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষাই দিলেন না, তার সঙ্গে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রেও দীক্ষা দিলেন।

দীনেশ গুপ্তের বাবার নাম সতীশ গুপ্ত। গ্রাম, বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ। দীনেশের বাবা জামালপুরের পোস্টমাস্টার ছিলেন। দীনেশের বয়স বিশ বছর।

দলের নির্দেশে ঢাকা থেকে এসে দীনেশ মেদিনীপুর কলেজে ভর্তি হন। তিনি একজন সুদক্ষ বিপ্লবী সংগঠক। মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রতিভা নিয়ে দীনেশ গুপ্ত জন্মেছিলেন। এতো অল্প বয়সে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। রিভলবারের মুখে আগুন ঝরাতে যেমন দক্ষ তেমনি লেখনী প্রতিভা। তাঁর গল্প মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর জেল থেকে লেখা চিঠিগুলিও সাহিত্য প্রতিভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোন্ ঘরে কোন্ বিভাগীয় প্রধান বসেন তার ম্যাপ তৈরি করা হলো। ম্যাপ তৈরি করলেন দলের অন্যতম দলনেতা প্রফুল্ল দত্ত।

কলকাতার বুকে লাল অক্ষরে লেখা পোস্টার পড়েছে। তাতে লেখা হয়েছে—'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা'।

পোস্টার পড়ে পুলিশ বিভাগ তটস্থ। কিছু একটা ঘটতে চলেছে এ পোস্টার তারই পূর্বাভাস। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তৎপর। ওস্তাদ শিকারী যেমন উড়ন্ত পাখিকে শিকার করে তেমনি বিপ্লবীরা শত্রুকে জানান দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। এবার যাত্রা। মেজর বিনয় বোসের নেতৃত্বে যাত্রা করলেন ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত আর লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত।

মায়ের পায়ে নিজেদের উৎসর্গ করতে চলেছেন বাংলার তিন বীর সন্তান। তাঁরা চান সুভাষচন্দ্রের রক্তের প্রতিশোধ নিতে। সাঁ সাঁ করে ট্যাক্সি রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে ছুটছে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে তাঁরা নেমে পড়লেন।

তিনজনেই সাহেবী পোশাকে সুসজ্জিত। মাথায় টুপি। তাঁরা সোজা রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় উঠে গেলেন। বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনের ঘরে ঢুকে বিপ্লবীরা রিভলবারের গুলিতে তাঁকে হত্যা করলেন।

তারপর রাজস্ব-সচিব মিঃ আলবিয়ান মারকে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলেন। একজন সেক্রেটারী বাধা দিলেন। তাঁকে একটি গুলি করে তাঁরা মিঃ মারের খোঁজে অগ্রসর হলেন।

গুলির শব্দ শুনে মিঃ ক্রেগ পিস্তল হাতে ছুটে এলেন। বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে গুলি

চালালেন। বিপ্লবীদের গায়ে একটি গুলিও লাগলো না। চাঁদপুরে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর হাত থেকে ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লবী ছেলেগুলি যেন এক একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্। সাক্ষাৎ যম। নিজে বাঁচলে বাপের নাম।

মিঃ ক্রেগের হাত থেকে পিস্তল নিয়ে এগিয়ে এলেন সহকারী ইনস্‌পেক্টার জেনারেল মিঃ জোনস্। তিনিও অবস্থা বুঝে রণে ভঙ্গ দিলেন। যঃ পলায়তি স জীবতি।

বিপ্লবীরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাঁরা জীবনের শেষ খেলা খেলতে নেমেছেন। বহুদিনের সাধনায় এ সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। দেশমাতৃকার এ পূজা তাঁদের জীবনের শেষ পূজা। তাকে সার্থক সুন্দর করে তুলতে হবে।

জুডিসিয়াল-সেক্রেটারী মিঃ নেলশন ও সেক্রেটারী মিঃ ট্যয়নাম আক্রান্ত হলেন। মিঃ নেলশনের পায়ে গুলি লাগে।

বিনয়-বাদল-দীনেশ এবার পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ করলেন। এ সময় তাঁরা দেখতে পেলেন আমেরিকান পাদ্রী মিঃ জনসন প্রাণভয়ে জলের পাইপ বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন। দ্রাম! দ্রাম! দ্রাম! রিভলবারের মুহুর্মুহুঃ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে অফিসার ও কর্মচারীরা পড়ি-কি-মরি করে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। সবাই পৈত্রিক প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত।

দীনেশের বাঁ-হাতে গুলি লেগেছে। তবুও তিনি সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের খবর লালবাজারে পৌঁছে গেছে। ছুটে এলেন মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট। সঙ্গে পুলিশ ও গুর্খা ফৌজ।

রীতিমতো যুদ্ধ। অসম যুদ্ধ। বিপ্লবীদের হাতে মাত্র তিনটি রিভলবার। ইংরেজ পক্ষের হাতে দূর পাল্লার শক্তিশালী রাইফেল। ঘোরতর যুদ্ধ। বিপ্লবীরা মোটেই পিছপা নয়। এতো বড় বড় যুদ্ধ বিশারদেরা তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পরাজয় বরণ করাতে পারলেন না।

মুখোমুখি যুদ্ধ যখন চরমে, বাদল দেখলেন তাঁর রিভলবারের গুলি খতম। বিনয় ও দীনেশের রিভলবারের গুলি একটি করে অবশিষ্ট আছে।

নিরুপায় হয়ে তিনজনই একটি ঘরে ঢুকলেন। বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর শরীর তল্লাসি করে জাতীয় পতাকা পাওয়া গেলো।

বিনয় বোস ও দীনেশ গুপ্ত নিজের নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। ট্রিগারে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের গুলি সশব্দে বের হয়ে গেলো। তাঁরা ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। রিভলবারের গুলি দীনেশের গলার বাঁ-দিকে জখম করলো। বিনয়ের গুলি লেগেছে কপালের দু'দিকে। তাঁদের আঘাত গুরুতর।

বিনয় ও দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হলো। দীনেশ আরোগ্যের পথে।

বিনয় বোসের বয়স বাইশ বছর। ঢাকা মিটফোর্ট ইস্কুলের মেধাবী ছাত্র। ফোর্থ্ ইয়ারে পড়েন। প্রখ্যাত ডাক্তারেরা তাঁকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি

তাঁর ক্ষতস্থানে আঙুল চালিয়ে বিষাক্ত করে দিলেন। হলো সেপ্টিক। ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। ১৩ ডিসেম্বর সকাল ছটায় তিনি ইহজীবন ছেড়ে চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর বাবা রেবতীমোহন, মা ক্ষীরোদবাসিনী ও দাদা বিজয় বসু দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন।

দীনেশ সুস্থ হবার পর এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে তাঁর বিচার শুরু হলো।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা বিনয়-বাদল-দীনেশের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে 'বারান্দা ব্যাট্‌ল' নামে অভিহিত করেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হলো :

গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তিনজন বাঙালী যুবক বাংলার কারাগার বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।···

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিত রূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি ওই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে।

আততায়ীগণ তিনজনেই ইয়োরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় তাহারা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতেছিল।

[আনন্দবাজার : ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সন]

মিঃ ক্রেগ যীশুর কৃপায় বিপ্লবীদের হাত থেকে দু' দুবার রক্ষা পেলেন। প্রথম আক্রমণের আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী এখনো কুমিল্লার জেলে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘটনা সংঘটিত হবার পরদিন সকালবেলা জেল-ডাক্তার গোপনে কালীপদ চক্রবর্তীকে বললেন, "বিনয়-বাদল-দীনেশ বাংলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিম্পসনকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেছেন।"

খবরটি শুনে তাঁদের মনে আনন্দের দোলা লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে দুঃখে ও বেদনায় কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

কুমিল্লা জেলেই রামকৃষ্ণ ও কালীপদের সনাক্তকরণ প্যারেড হলো। তাতে চাঁদপুরের প্রায় ছ-সাতজন খালাসী-শ্রমিক তাঁদের দু'জনকে সনাক্ত করলো। কিন্তু টিকিট কালেক্টর রজনী দাশ তাঁদের সনাক্ত করলেন না। তিনি বিপ্লবীদের চিনতে পারলেন। দেশপ্রেমের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত। তাই চিনতে পেরেও না চেনার ভান করলেন।

সাতাশ দিন পর রামকৃষ্ণ ও কালীপদকে এক রাতে কুমিল্লা জেল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। কলকাতায় তাঁদের আলিপুর জেলে ১৩ নং সেল ওয়ার্ডে রাখা হলো।

পরদিন ভোরে তাঁদের ১৪ নং সেল ওয়ার্ডে নিয়ে গেলো। এ সেলে আছেন দীনেশ গুপ্ত। ১৪ নং ওয়ার্ডে এখন অবস্থান করছেন—দীনেশ, রামকৃষ্ণ ও কালীপদ। তিনজনই

বিচারাধীন আসামী।

কলকাতায় এসে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁর পিসতুতো দাদা দীনেশ সেনকে জেল থেকে একখানি চিঠি লিখলেন। রামকৃষ্ণের চিঠি পেয়ে দীনেশ সেন জানতে পারলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে রামকৃষ্ণ আলিপুর জেলে বন্দী আছেন। চিঠিতে আরো লিখেছেন, তিনি কখনো কলকাতায় আসেননি। কাকেও চেনেন না। চিঠি পেয়ে তিনি যেন জেলে গিয়ে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এবং মামলার বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে চান।

দীনেশ সেন ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার অফিসে সার্ভেয়ার অ্যাণ্ড ভ্যালিউয়েশান অফিসার পদে চাকরি করেন। ছ'শ টাকা মাইনে। বাড়ি চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রাম। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পাশাপাশি বাড়ি। দীনেশ সেন রামকৃষ্ণকে ছোটবেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। মামাতো ভাই আর সহোদর ভাইয়ের মধ্যে তাঁদের কোন পার্থক্য নেই। মেধাবী ছাত্র হিসেবে রামকৃষ্ণ তাঁদের গর্ব। রামকৃষ্ণ ইস্কুলে বৃত্তি পেয়েছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথমস্থান অধিকার করে বৃত্তি পেয়েছেন। ভাইদের মধ্যে তিনি একটি উজ্জ্বল রত্ন।

অফিস থেকে ফেরার পর দীনেশ সেন বাসায় সারারাত কেবল ছটফট করে কাটালেন। পরদিন যথারীতি অফিসে গেলেন। অফিসে গিয়েই উচ্চপদস্থ অফিসারের অনুমতি নিয়ে তিনি পাগলের মতো ছুটলেন আলিপুর জেলে।

ইংরেজ সরকারের কর্মীদের পক্ষে তাদের আত্মীয় রাজনৈতিক আসামীদের সঙ্গে জেলে দেখা করা বিপজ্জনক। সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ভাইয়ের জন্য এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে দীনেশ সেন রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গেলেন। জেলের দু'জন পুলিশ তাঁকে সঙ্গে করে রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেলো।

পুলিশ দুজন দীনেশ সেনের দু পাশে দাঁড়িয়ে। রামকৃষ্ণ দাদাকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হলেন।

দীনেশ সেন বললেন, "লেবু (রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ডাকনাম) তোর বৌদি তোর জন্য মিষ্টি পাঠিয়েছেন।"

দু' হাত বাড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিষ্টির প্যাকেটটি গ্রহণ করলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন, "বৌদি কেমন আছেন?"

দীনেশ সেন বললেন, "তোর চিঠি পড়ে তোর বৌদি কেঁদে কেঁদে সারা।"

রামকৃষ্ণ মাথা নীচু করে চুপ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দাদার সাথে আলোচনা করলেন। পুলিশের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে চাটগাঁয়ের ভাষায় বললেন, "শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলকে বরাবর সমর্থন করেছেন। তাঁকে আমাদের অসহায়তার কথা জানালে হয়তো তিনি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনি তাঁর সাথে দেখা করুন।"

ভাইয়ের কথা মতো দীনেশ সেন এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে সুভাষ বসুর সাথে দেখা করলেন। সুভাষ বসু মনোযোগ সহকারে দীনেশ সেনের কথাগুলো শুনলেন।

পরিশেষে সুভাষ বসু বললেন, "আপনি আমার দাদা শরৎ বসুর সাথে দেখা করুন। আমি আপনাকে একখানি চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠিখানি তাঁকে দেবেন। এ বিষয়ে তিনি

আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন।"

সুভাষ বসুর চিঠি নিয়ে দীনেশ সেন শরৎ বসুর বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন। শরৎ বসু চিঠিখানি পড়লেন। এবং দীনেশ সেনের কাছে ঘটনাটি শুনলেন।

শরৎ বসু বললেন, "আমি অন্য একটি মামলায় চুক্তিবদ্ধ। তাই এ মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।"

স্বাধীনতার পূজারী শরৎ বসু ব্যারিস্টার মেঘনাথ মিত্রের কাছে একখানি চিঠি লিখে দীনেশ সেনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

শরৎ বসুর চিঠি নিয়ে দীনেশ সেন ব্যারিস্টার মেঘনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করলেন।

ব্যারিস্টার মেঘনাথ মিত্র বললেন, "আমি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মামলা পরিচালনা করতে রাজি। তার আগে কোন উকিল দিয়ে কোর্ট থেকে একমাস সময় বাড়িয়ে নিতে হবে। কারণ কেস্ স্টাডি করতে হবে। এবং রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করে তাঁর মুখে ঘটনার বিবরণ শোনার জন্য টাইম দরকার।"

দীনেশ সেন ভাবনায় পড়লেন। ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য তিনি উল্কার গতি নিয়ে ছুটছেন। আলিপুর কোর্টে রামকৃষ্ণ ও কালীপদের বিচার শুরু হবে। তিনি কেবল আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছেন। কোর্ট-কাছারির অভিজ্ঞতা তাঁর মোটেই নেই। ভাবতে ভাবতে কলেজ সহপাঠী উকিল বিনোদ দাশগুপ্তের কথা মনে পড়লো। বিনোদ দাশগুপ্তের বাড়ি চট্টগ্রাম। কলকাতা কোর্টের উকিল। তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উকিল বিনোদ দাশগুপ্ত বললেন, "দেখ দীনেশ, তুমি আমার বন্ধু। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা আমার গর্ব। বিপ্লবীদের প্রতি আমারও তো একটা পবিত্র কর্তব্য আছে। তুমি যেভাবে বলছো তাতে মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে এসেছো।"

দীনেশ সেন বললেন, "চোখে যখন বালি পড়ে তখন চক্ষুষ্মান লোকও সাময়িক অন্ধ হয়ে যায়। আলিপুর কোর্টে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি তৈরি থেকো।"

'চাঁদপুর সংঘর্ষ' প্রবন্ধে কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন, "আলিপুর কোর্টে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। একজন ইংরেজ, একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম বিচারক নিয়ে এক বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে। মিঃ গার্লিক হলেন বিশেষ আদালতের সভাপতি।

আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞের অভাব অনুভব করতে লাগলাম।

...বিচারের দিন আমাদের যখন কোর্টে হাজির করা হয়, তখন দেখা গেল যে আমাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য দু'জন ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র সহ বিনোদবাবু কোর্টে হাজির হয়েছেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, মামলা চালানোর ব্যাপারে সুভাষবাবুই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।"

রামকৃষ্ণ ও কালীপদের মামলা চালানোর প্রাথমিক তদারক-তদবির করার পর, দীনেশ সেন অফিসে গেলেন। একদিন অফিসের চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে অফিস পিয়ন দীনেশ সেনের হাতে একখানা চিঠি ধরিয়ে দিলো।

চাকরি বরখাস্তের চিঠি! তাতে লেখা আছে—"আগামীকাল থেকে আপনার চাকরি

স্বতন্ত্র। নোটিসের পরিবর্তে কেশিয়ারের কাছ থেকে একমাসের বেতন নিতে পারেন।"

এক কলমের খোঁচায় দীনেশ সেনের চাকরি চলে গেলো। মাথা ববন করে ঘুরতে লাগলো। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। তিনি উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইংরেজ অফিসার বললেন, "পুলিশ রিপোর্ট দিয়েছে, রাজনৈতিক খুনী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আপনার মামাতো ভাই। তার সঙ্গে আপনার নিবিড় সম্বন্ধ। তাই আপনাকে কোন মতেই চাকরিতে বহাল রাখা যায় না।"

দীনেশ সেনের সঙ্গে বর্তমান লেখকের এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এই তো গেলো রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পিসতুতো দাদা দীনেশ সেনের ঘটনা। রামকৃষ্ণের ছোট ভাই সীতারাম বিশ্বাসের কি হলো ?

সীতারাম বিশ্বাস ১৮ এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের অংশগ্রহণকারী একজন নির্ভীক বিপ্লবী সৈনিক। জালালাবাদ যুদ্ধেও তিনি জেনারেল লোকনাথ বলের পাশে দাঁড়িয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন। তারপর থেকে সীতারামের ফেরারী জীবন শুরু।

মিঃ ক্রেগ হত্যা পরিকল্পনার আগে একরাতে দু'ভাই গোপনে বাড়ি এসে বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের বাবা যেন শরশয্যায় শায়িত। বিছানায় শুয়ে দুর্গাকৃপা অপলক দৃষ্টিতে দু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে নীরবে জল গড়িয়ে পড়লো।

শোকাকুলা মা নয়নতারা দু ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমার শূন্য বুকে তোরা ফিরে আয়। অভাগিনী মায়ের কথা শোন। আমি ও তোর বাবা আর বেশিদিন বাঁচবো না। তোদের ছাড়া আমার বুক যে কেবল খালি খালি মনে হয়। তোরাই তো আমার জীবনের সব।"

মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তাঁরা খুঁজে পান না। রাতের শেষ প্রহর। বিদায় আসন্ন। দু'ভাই তাঁদের বাবা-মাকে জীবনের শেষ প্রণাম করলেন। মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কান্নার শব্দে ছেলেদের বিপদ হতে পারে ভেবে তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্নার শব্দকে ঢাকতে চেষ্টা করলেন। দেখতে দেখতে দু'ছেলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

দুর্গাকৃপা বিশ্বাসের বিছানায় বসে নয়নতারা বুক চাপড়িয়ে গুন্‌গুন্‌ শব্দে কাঁদতে লাগলেন। চার চোখের মিলিত অশ্রু নদী হয়ে বয়ে গেলো।

তারিণী মুখার্জীকে হত্যার অপরাধে আলিপুর কোর্টে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর বিচার চলছে। মাস্টারদা ভাবলেন, রামকৃষ্ণের ফাঁসি অবধারিত। সীতারামকে যাতে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। তিনি নির্মল সেনের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। নির্মল সেন মাস্টারদার প্রস্তাবে একমত। মাস্টারদা সীতারামকে ডেকে আনলেন। মাস্টারদা সীতারামকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কোন আত্মীয় বার্মায় আছেন ?"

সীতারাম জবাব দিলেন, "আমার দিদি ও জামাইবাবু রেঙ্গুনে আছেন।"

মাস্টারদা বললেন, "আমাদের মধ্যে কিছু ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের অবর্তমানে তারা চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখে দেশবাসীকে জানাবে। তাই তোমাকে

রেঙ্গুনে পাঠাবো বলে স্থির করেছি। নির্মলবাবু তোমাকে রেঙ্গুন পাঠানোর সব ব্যবস্থা করবেন।"

মাস্টারদার নির্দেশে সীতারাম বিশ্বাস স্টীমারে কক্সবাজার হয়ে মংডু পৌঁছলেন। তারপর হেঁটে পাহাড়-পর্বত পার হয়ে আকিয়াব পৌঁছলেন। আকিয়াব পৌঁছে এক মুসলমান চাষীর হাত দিয়ে নির্মল সেনের চিঠি পেলেন। মুসলমান চাষীর সাহায্যে তিনি স্টীমারে রেঙ্গুন পৌঁছলেন। সেখানে দিদি ও জামাইবাবুর বাসায় উঠলেন।

এতো দিনের ধকল সীতারাম বিশ্বাসের শরীরে সহ্য হলো না। তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তাঁকে রেঙ্গুন হাসপাতালে ভরতি করা হলো। তিনি সুস্থ হলেন।

এদিকে ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র সর্বশক্তি দিয়ে, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর পক্ষে তাঁদের তূণ থেকে তীর ছুঁড়ে চলেছেন। দোষ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারকেরা দু'জনের ফাঁসি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। চাঁদপুরের ছ-সাতজন রেলওয়ে খালাসী-শ্রমিক তাঁদের সনাক্ত করেছে। তদুপরি মিঃ ক্রেগ কালীপদ চক্রবর্তী গুলি করেছে বলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছেন। এবং তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে ছিলেন।

ব্যারিস্টারেরা দেখলেন, বিপ্লবীদের বাঁচানোর সব পথ রুদ্ধ। শেষ চেষ্টা হিসেবে রামকৃষ্ণের বয়স বিশ বছর। কালীপদের বয়স সতের বছর প্রমাণ করলেন।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। সুগঠিত দেহ। লম্বা। দেখলে মনে হয় তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে তাঁর বয়স প্রমাণিত হতে কোন অসুবিধে হলো না। এছাড়া তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করেছিলেন। রেকর্ড দেখে বিচারকেরা বয়স সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেন।

কালীপদ চক্রবর্তীকে জবানবন্দী পেশ করার সময় জিজ্ঞেস করা হলে, ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাঁর বয়স সতের বছর বললেন।

কালীপদ চক্রবর্তী দেখতে খাটো। পাতলা। ষোল-সতের বছরের বেশি বয়স বলে মনে হয় না। এখনো গোঁফদাড়ি ওঠেনি। অথচ তিনি রামকৃষ্ণর থেকে দু বছরের বড়। টোলের ছাত্র। তাঁর সার্টিফিকেট নেই।

দুর্গাকৃপা বিশ্বাসের ছ ছেলের মধ্যে রামকৃষ্ণ চতুর্থ সন্তান, সীতারাম পঞ্চম। দু ছেলের অভাব তিনি দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারলেন না। রামকৃষ্ণের মামলা চলাকালীন তিনি ইহজগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। রামকৃষ্ণ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েও অবিচল।

রামকৃষ্ণ কোর্টে একটি বোল্ড স্টেটমেণ্ট দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী ও মেঘনাথ মিত্র তাঁকে বারণ করলেন। বিবৃতির ফলে হয়তো দু'জনের মধ্যে একজনকেও বাঁচানোর কোন আশা থাকবে না। গতিক বুঝে রামকৃষ্ণ ব্যারিস্টারদের কথা মেনে নিলেন।

প্রেসিডেণ্ট মিঃ গার্লিক রায় দিলেন - রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড। চট্টগ্রামের বৃন্দাবন আখড়ার গরীব ব্রাহ্মণ পূজকের ছেলে কালীপদ চক্রবর্তীকে অল্প বয়সের জন্য প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা নির্বাসনদণ্ড দিলেন।

ব্যারিস্টার বি. সি. চৌধুরী বিপ্লবীদের কাছে ছুটে এসে হাইকোর্টে আপিল করার অভিমত প্রকাশ করলেন। রামকৃষ্ণ কালীপদকে ধীর স্থিরভাবে বললেন, "এই রায়ের বিরুদ্ধে যেন

কোন আপিল করা না হয়। একজন যে বেঁচে গেছি এই যথেষ্ট।"

কালীপদ রামকৃষ্ণের কথাগুলি শুনে অভিভূত। মৃত্যুর হিমশীতল হাত রামকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে আসছে দেখেও তিনি নির্বিকার। শান্ত। কালীপদ ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা পাওয়াতে রামকৃষ্ণ এই রায়কে ভগবানের আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নিজেকে নিয়ে তিনি মোটেই বিব্রত নন। আদর্শই তাঁর কাছে বড়।

কোর্টে মামলার রায় বের হবার পর দু'জনের পথ দুদিকে বেঁকে গেলো। একজন কারাপ্রাচীর থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় বছরের পর বছর প্রহর গুনবেন। অন্যজন মৃত্যুকে মায়ের আশিস ধারায় গ্রহণের প্রতীক্ষায়। রামকৃষ্ণ গেলেন ফাঁসির সেলে। কালীপদ গেলেন রাজবন্দী সেলে। বিদায়ক্ষণে একজন অপরজনকে নীরবে আলিঙ্গন করলেন। কেউ কোন কথা বলতে পারলেন না।

রামকৃষ্ণের পাশের সেলে ফাঁসির প্রতীক্ষারত দীনেশ গুপ্ত। দীনেশ গুপ্তের সাথে তাঁর আত্মীয়-স্বজন প্রায় দেখা করতে আসেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আত্মীয়-স্বজন সুদূর চট্টগ্রামে। কলকাতা আসা ব্যয়-সাধ্য।

মনোরঞ্জন রায় হিজলী জেলে বন্দী। জেলে বন্দী ঢাকার বি. ভি-র কয়েকজন সদস্য মনোরঞ্জন রায়কে বললেন, "দীনেশ গুপ্তের পাশের কনডেম্‌ড্ সেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আছেন। চট্টগ্রাম থেকে আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁর সাথে দেখা করা সম্ভব হচ্ছে না। আপনাদের দলের কাউকে রামকৃষ্ণের কাছে পাঠাতে চেষ্টা করুন। আমরা এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবো। তাহলে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি আনন্দঘন হবে।"

বি. ভি-র ছেলেদের কথা মনোরঞ্জন রায় হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন। কাকে দিয়ে এ কাজ করা যায়। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি প্রীতিলতাকে জেল থেকে চিঠি লিখলেন, আলিপুর জেলে গিয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতি যেন দেখা করার চেষ্টা করেন।

মনোরঞ্জন রায়ের মা যখন হিজলী জেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন গোপনে তিনি তাঁর মায়ের হাত দিয়ে প্রীতিলতাকে লেখা চিঠিটি পাঠিয়ে দিলেন। প্রীতিলতা চিঠি পেয়ে মনোরঞ্জন রায়ের গুপ্ত পিসীমার সঙ্গে দেখা করলেন।

মনোরঞ্জন রায়ের নির্দেশে প্রীতিলতা মৃত্যু প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে দেখা করার জন্য আলিপুর জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অমিতা দাস ছদ্মনামে 'কাজিন' পরিচয় দিয়ে দরখাস্ত করেন। সৌভাগ্যবশতঃ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে জেলে দেখা করার অনুমতি পেলেন। এভাবে তিনি প্রায় চল্লিশবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন।

প্রীতিলতা তাঁর 'বিদায়বাণী'তে লিখেছেন, "জালালাবাদের শহীদদের জন্য আমি প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই রকম অবস্থায় আমি বি. এ. পড়বার জন্য কলকাতা চলে গেলাম। স্বদেশের কথা সব সময় আমার মন অধিকার করে থাকত। যে সব সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তানদের বিচ্ছেদ বিধুরা জননীদের অশ্রু দেখতে পেতাম।

মনের এই রকম অবস্থায় আমি নতুন উদ্দীপনা পেলাম, যখন আমার এক দাদা (মনোরঞ্জন রায়) আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণদা তখন একটি নির্জন সেলে স্বদেশপ্রেমের জন্য ব্রিটিশ আইনে চরম দণ্ডের অপেক্ষা

করছেন। আমি তাঁর এক সম্পর্কিত বোন বলে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতাম এবং এই সপ্রতিভ, উৎফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতাম। ফাঁসির পূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বার সাক্ষাৎ করি।"

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী জেল থেকে অসুস্থ অবস্থায় মনোরঞ্জন রায়কে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভরতি করা হয়। প্রীতিলতা রোজ তাঁর সাথে হাসপাতালে দেখা করতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতি বললেন, "দাদা, আমি চট্টগ্রাম গিয়ে রামকৃষ্ণদার মাকে কলকাতা নিয়ে এসেছিলাম। আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণদার সাথে তাঁর মায়ের শেষ দেখা করিয়ে দিয়েছি। তাঁর মায়ের হৃদয় বিদারক কান্নার করুণদৃশ্য দেখে আমিও না কেঁদে পারিনি। রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর তাঁর মা বেনারস চলে যান। শুনেছি—বেনারসে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছে।"

মনোরঞ্জন রায় লক্ষ্য করলেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি প্রীতির জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রীতি দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করে মৃত্যু বরণ করার একটি সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানালেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার একান্ত বাসনা প্রীতিকে পেয়ে বসেছে। মনোরঞ্জন রায় অসুস্থ অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে কল্পনাকে চিঠি লিখলেন। কল্পনা তখন চট্টগ্রামে। চিঠির বিষয়বস্তু হলো—কল্পনা যেন প্রীতিলতাকে মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করেন।

কল্পনা দত্ত তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন (৭৭ পৃঃ), "...মাস্টারদাকে প্রীতির সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করি। সে আমাদের সকলের চাইতে ভাল, এই ছিল আমার ধারণা। ১৯৩২ সালে প্রীতির সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা হয়।"

গরমের ছুটিতে প্রীতি কলকাতায় থাকবেন স্থির করেছেন। অথচ মেয়েদের হস্টেল বন্ধ থাকবে। তাই তিনি গুণু পিসীমার বাসায় থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে হিজলী জেলে মনোরঞ্জন রায়ের কাছে চিঠি লিখলেন। মনোরঞ্জন রায় প্রীতির চিঠি পেয়ে তাঁর পিসীমাকে চিঠি লিখলেন। পিসীমা সাদরে প্রীতিকে তাঁর বাসায় আশ্রয় দিলেন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নারী সংগঠকদের মধ্যে প্রধান হলেন—পূর্ণেন্দু দস্তিদার। পূর্ণেন্দু দস্তিদার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম' বইতে লিখেছেন (২৩৭ পৃঃ), "অস্ত্রাগার দখলের পরে কলিকাতার চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের মধ্যে যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে থেকে কাজ করে ছিল তাদের মধ্যে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র মনোরঞ্জন রায়ের (ক্যাবলা রায়) নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই বিপ্লবীও অনেক সাহায্য করেছিলেন।"

লেখক এই বইটি লেখার আগে স্বাধীনতা সংগ্রামী মনোরঞ্জন রায়ের কাছে চিঠি লেখেন, এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। লেখকের চিঠি পেয়ে তিনি তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকার বিবরণ যা লিখে দিয়েছেন তা ইতিহাসের আকর। তাই শ্রীযুক্ত রায়ের লিখিত বিবরণের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হলো।

"চাটগাঁর বন্দীদের মধ্যে আমাকেই প্রথম দেউলী জেলে পাঠান হয়। কারণ যতোটা জেনেছি, তা হলো—জেলের ভেতর বন্দী থেকেও বাইরের সাথে যোগাযোগ এবং জেলে

মালপত্র সরবরাহকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে মাস্টারদার কাছে পাঠানো প্রভৃতি কাজ। চাটগাঁর যাঁরা তখন আমার সঙ্গে হিজলী জেলে বন্দী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ, যিনি এই ব্যাপারগুলি জানতেন তিনি পুলিশের কাছে বলে দিয়েছেন।

"এটা আরো নিঃসন্দেহ হলাম যখন আমাদের তিনজন যথা বি.ভি.-র জ্যোতিষ জোয়ারদার, চাটগাঁর আমাদের দলের মণি সেন ও আমি হিজলী জেল থেকে পালাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলি তখন আমাদের পালাবার নির্ধারিত দিনের ঠিক তিনদিন আগে যেই স্থানটি তার কেটে বের হয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম, সেই জায়গায় বেড়ার বাইরে পঞ্চাশ মিটার অন্তর সশস্ত্র প্রহরী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ফলে আমাদের কয়েক মাসের সমস্ত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। এরপর জ্যোতিষ জোয়ারদার ও আমাকে প্রথম দলেই দেউলী পাঠিয়ে দিলো।

"অনুসন্ধান করে বুঝলাম, আমাদের জেল পালাবার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই মণি সেন, যে আমাদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনে অপেক্ষাকৃত নতুন তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঠিক এই জিনিসটা নজরে পড়ে চাটগাঁ দলের যাঁরা হিজলী জেলে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নেতা হিসাবে পরিচিত সেই ভদ্রলোক মণি সেনকে ধরে তার কাছ থেকে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার কথা বের করে নেন। পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা এবং আমাদের দেউলী জেলে পাঠানোর ঘটনা সেই ভদ্রলোকের কাজ বলে আমি মনে করি।"

৪ আগস্ট, ১৯৩১ সাল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হল।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর প্রীতিলতার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পড়ায় মন বসে না। 'দর্শন'-এ তিনি অনার্স নিয়েছেন। ক্লাসের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কিন্তু বি. এ. অনার্স পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়ে উঠলো না। তাই প্রীতি 'ডিস্টিঙ্কশন' নিয়ে বি. এ. পাস করলেন।

কুমিল্লা জেল থেকে কালীপদ চক্রবর্তী ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে আলিপুর জেলে ১৩ নং সেল ওয়ার্ডে ঢোকানো হয়েছিল। একদিন পর ১৪ নং সেল ওয়ার্ডে তাঁদের রাখা হয়েছিল। ১৪ নং ওয়ার্ডে দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। বিচারের পর কালীপদ চক্রবর্তী রাজবন্দী ওয়ার্ডে চলে যান। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির সময় কালীপদ চক্রবর্তী আলিপুর জেলে ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কিছু আলোকপাত করেছেন।

'চাঁদপুর সংঘর্ষ' প্রবন্ধে কালীপদ চক্রবর্তী লিখেছেন, "এ সময়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার প্রমুখ বীর নারীরা রামকৃষ্ণের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাড়িতে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো দৈনিক খবরের কাগজে বের হতে থাকে। এদের ফাঁসি মুকুবের জন্য আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে।

সুপ্রীম কোর্টেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল রইল। জনসাধারণের দাবী জোরদার হয়ে উঠছে দেখে শাসক মহল আতঙ্কিত হয়ে উঠল। জুলাই মাসের প্রথম দিকে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল। জেলের ভেতরই তার মরদেহ দাহ করা হয়।

রামকৃষ্ণ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হবার দরুন দুবার তার ফাঁসি স্থগিত রাখতে হয়। পরের বার

প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও গোপনে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার পূর্বেই খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমরা সতর্ক হয়ে রইলাম।

ফাঁসির পূর্বে জেলে চতুর্দিক অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা ঘেরাও করা হয়। কারণ, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রদ করার আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল।

রাত ১২ টায় ফাঁসি মঞ্চের আলোগুলো জ্বলে উঠল। লোহার খুঁটি ও বীম ইত্যাদি মঞ্চে লাগান হল। রামকৃষ্ণের সেল থেকে কিছু কিছু আওয়াজও ভেসে আসছিল।

রামকৃষ্ণকে সেলের বাইরে নিয়ে আসার সময় সে 'বন্দেমাতরম' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলতেই সারা জেলের বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আওয়াজে সারা জেল কাঁপিয়ে তোলে।

...এরই একবৎসর পর আমি গেলাম আন্দামানে, যাবজ্জীবন নির্বাসনে। প্রায় ১৬ বৎসর কারাভোগের পর বেরিয়ে এলাম দিনের আলোয়।"

৭ জুলাই ১৯৩১ সাল। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়। এবং দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের সভা স্থগিত রাখা হয়। তখন মেয়র ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় যা লিখেছেন তার কিছুটা অংশ তুলে দেওয়া হলো।

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ

"মর্ত্যের তামসী নিশি' যখন আষাঢ়ের আচ্ছন্ন ঊষায় মিলাইয়া যাইতেছিল সেই সময় মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশের জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল। আবার শ্রাবণের এই 'ঘন বাদল বরিষণে' রামকৃষ্ণের শেষ সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। দেশবাসীর আকুল আবেদন, জনক জননীর কাতর প্রার্থনা সবই নিষ্ফল হইল। আইনের অমোঘ আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইল।

এই দুই তরুণের জীবনদীপ নির্বাপিত করিয়া 'মানব সভ্যতার কোন্ চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা আমরা জানিনা। তবে জনমতকে পদদলিত ও জনক জননীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করায় দেশবাসী যে কতখানি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কর্পোরেশনে শ্রদ্ধাঞ্জলি, বাংলার শহরে শহরে শোভাযাত্রা, শোকসভা বা হরতাল তাহারই পরিচয়।

দেশবাসী তাঁহাদের জীবন ভিক্ষা শুধু চাহিয়াছিল—সসম্মানে মুক্তির দাবী করে নাই। আশা কুহকিনী, তাই লাহোরের ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির পরও আবার দয়াভিক্ষা করিয়াছিল। ভিখারীর অশ্রুজল ব্যর্থ হইয়াছে, প্রবলের রুদ্ধদ্বার অসহায় দুর্বলের প্রার্থনায় উন্মুক্ত হয় নাই। অথচ প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় নয়। লাহোরে তাহার নজীর রহিয়াছে।

জনমতকে পদদলিত করিয়া ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির পর লাহোরেই ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে জনৈক আসামীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হইয়াছে। আইনের মর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সাম্রাজ্যের কাঠামোও ধূলিসাৎ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দীনেশ ও রামকৃষ্ণের মৃত্যুদণ্ড রহিত করিলে কি অন্যথা হইত ?" [বেণুঃ শ্রাবণ সংখ্যা ১৯০১ সাল]

জনমতকে উপেক্ষা করে দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে ফাঁসির আদেশ দেন বিচারপতি মিঃ গার্লিক। বাংলার বিপ্লবীরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিপ্লবীদের বিচারে মিঃ গার্লিকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো। বিপ্লবীরা চান দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসির আগে যাতে শুনে যেতে পারেন মিঃ গার্লিককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই আলিপুর সেসন জজের কোর্টে মিঃ গার্লিক যথারীতি বিচারকের আসনে বসে বিচার করছেন। বিপ্লবী বীর কানাই ভট্টাচার্য আদালতের মধ্যে ঢুকলেন। এবং মিঃ গার্লিকের কপাল লক্ষ্য করে রিভলবারের গুলি ছোঁড়েন। মিঃ গার্লিকের ভবলীলা সাঙ্গ হলো। মিঃ গার্লিককে গুলি করার পর কানাই ভট্টাচার্য বীরের ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। বিপ্লবী নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কানাই ভট্টাচার্যকে মিঃ গার্লিক হত্যার জন্য পাঠান।

মিঃ গার্লিককে হত্যার আগের ঘটনা। তখনো রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্ত ফাঁসির প্রতীক্ষায়। তাঁদের ফাঁসি দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত উত্তাল। ইংরেজ সরকার দু'জনকে ফাঁসি দেবেনই।

দীনেশের বিপ্লবী বন্ধুরা মেদিনীপুরে গর্জে উঠলেন। তারাও বদলা নিতে কসুর করবেন না। স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অবদান অসামান্য। তাদের শান্ত বুকে সমুদ্রের ঢেউ তুললো।

সমুদ্র উপকূলে মেদিনীপুর। সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে তাঁরা চিরপরিচিত। বন্ধুত্ব। সাগরের অশান্ত ঢেউ মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা বুকে ধারণ করেছেন।

সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ যেমন পাহাড়-পর্বতকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলিকণায় পরিণত করে তেমনি বিপ্লবতীর্থ মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত গুঁড়িয়ে দেবে।

মেদিনীপুরের অধিবাসীরা সহজ, সরল ও সংগ্রামী। প্রকৃতির সাথে নিয়তই সংগ্রাম করে চলে।

তাঁরা স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ। স্বাধীনতার আকাশে ডানা মেলে উড়ার সাধ অনেক দিনের। কেবল সময়ের প্রতীক্ষায়।

মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য অনেক। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মেদিনীপুরে যতো ইংরেজ শাসক আসবেন তাঁদের খতম করা হবে।

বাস্তবে হলোও তাই। ১৯৩১ সালের ৭ এপ্রিল দুর্দান্ত জেলাশাসক মিঃ পেডিকে বিমল দাশগুপ্ত ও যতিজীবন ঘোষ হত্যা করলেন। এবং বিপ্লবীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

হিসাবনিকাশ করলে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্তের বদলা নিতে বিপ্লবীদল বনাম ইংরেজ সরকারের খেলা দুই—একে আপাততঃ পরিসমাপ্তি ঘটলো। ইংরেজ দলে পড়ে গেলো দুই মহারথী—মিঃ গার্লিক ও মিঃ পেডি। বিপ্লবীদলে আত্মবিসর্জন দিলেন কানাই ভট্টাচার্য।

খেলা এখানে শেষ নয়।

পেডির পরে মেদিনীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন মিঃ ডগলাস।
৩০ এপ্রিল, ১৯৩২ সাল। জেলাবোর্ড ভবনে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল রিভলবারের গুলিতে মিঃ ডগলাসকে হত্যা করেন।
ডগলাসের পর মেদিনীপুরে জেলাশাসক হয়ে এলেন মিঃ বার্জ।
২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সাল। ফুটবল খেলার মাঠে অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত মিঃ বার্জকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করেন।
মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা তিনজন ইংরেজ জেলাশাসককে হত্যা করলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক নজির।

কলকাতায় যখন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর বিচার চলছিল, তারও আগে থেকে মাস্টারদার নির্দেশে বিপ্লবীরা পূর্ণউদ্যমে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করে চলেছেন। কর্মকাণ্ড বিরাট। পথ ক্ষুরধার।
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের (ল্যাণ্ড্‌মাইন্‌ বিস্ফোরণে বন্দিমুক্তি ও প্রশাসন অচল করার প্রচেষ্টা) পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানে অর্ধেন্দু গুহের ভূমিকা অনন্য। ষোল-সতের বছরের তরুণ অর্ধেন্দুর পেছনে ছ' জন গোয়েন্দা ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। ছ' জন গোয়েন্দার বারোটি শকুনির মতো চোখ সদাসতর্ক। জামিনে মুক্ত অর্ধেন্দুর প্রথম কাজ ছিল জেলের বন্দীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ মাস্টারদাকে দেওয়া। এবং মাস্টারদার প্রেরিত সমাচার বন্দীদের কাছে পৌঁছানো। এখন সেই কাজের পরিধি অনেকদূর প্রসারিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রস্থলে তিনি দাঁড়িয়ে।
অর্ধেন্দু গুহের দায়িত্ব অপরিসীম। জেলের ভেতরেরও জেলের বাইরের বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কাজকে ত্বরান্বিত করা। প্রাণের আবেগে তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সমস্ত কিছু তদারকের ভার তাঁর ওপর বর্তিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় আট মাস ধরে ল্যাণ্ড্‌মাইনের জন্য দশ মণ বারুদ তৈরির কাজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন অর্ধেন্দুর বিপ্লবী সাথী – অনিল রক্ষিত, আশু দে, রাখাল বসাক, অনিল দে, অপূর্ব সেন ও কালীকিঙ্কর দে প্রমুখ।
কালীকিঙ্কর দে একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবীদলের কর্মী। সুমধুর ব্যবহার। বেঁটে। অনন্ত সিংহ ব্যায়ামের মাধ্যমে তাঁর দেহকে করে দিয়েছেন যেন ইস্পাত।
কালীর বাড়ি গোসাঁইনডাঙ্গা (বর্তমান ১৮৫ ষ্ট্র্যাণ্ডরোড, চট্টগ্রাম)। শিশুকালে তাঁর মা মারা যান। জেঠীমাকে মা ডাকেন। কালী বাড়ির সকলের বড়ই আদরের। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম।
বাবা দীনবন্ধু দে মা মরা ছেলে কালীর প্রতি স্নেহান্ধ। কালীকে দেখলে রাজকুমারীর কথা মনে পড়ে। বুক টনটন করে। রাজকুমারীর শেষ উপহার কালীকিঙ্কর। দীনবন্ধুর ওপর কালীর দায়িত্ব দিয়ে রাজকুমারী চলে গেলেন।
সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক কালীকিঙ্কর দে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে সুবোধ ছেলে সেজে আছেন। একদিন কালীর গৃহশিক্ষক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে কালী অংশগ্রহণ করেছেন জেনে গৃহশিক্ষক আনন্দে তাঁকে

জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরে একটি প্রাইভেট কারখানায় চাকরি করেন। কারখানার মালিক একজন হিন্দু।

কালীর গৃহশিক্ষক কারখানার মালিকের সঙ্গে আলোচনা করে কালীকে সেখানে চাকরি দিলেন। যুব-বিদ্রোহের আগে থেকে কারখানায় হাজিরার ব্যবস্থা করলেন। পুলিশ কারখানায় হাজিরার খাতায় কালীর উপস্থিতি দেখে তাঁকে রেহাই দিলো।

কালীর বাবা ভাবলেন, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিলে হয়তো পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে। তিনি এক অনাথা মেয়ের সাথে কালীর বিয়ের ঠিক করলেন। মেয়েটি তার মেসো-মাসীর কাছে আশ্রিতা।

বিয়েতে কালীর প্রবল আপত্তি। শেষপর্যন্ত বাবা ও জেঠীমার সম্মান রক্ষার্থে রাজি হলেন। কালীর জন্মের এগারো মাস পরে তিনি মাকে হারান। জেঠীমা নয়নতারার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছেন। জেঠীমা তাঁর অন্তরের সবটুকু জায়গা জুড়ে আছেন। বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে জেঠীমার বিশখানা গিনি চুরি করে নিয়ে তিনি দান করেছেন। বাবা ও জেঠীমার চোখের জল তিনি আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তদুপরি পাত্রীর মেসো নাছোড়বান্দা।

কালীকিঙ্কর পাত্রীর মেসোকে বললেন, "আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আপনারা ভালোভাবে জানেন। আপনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখুন। আমি আমার পথ থেকে সরে আসবো না। এসব জেনেও যদি আপনি এগুতে চান তবে আমার আপত্তি নেই।"

পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের অভিভাবকেরা ভাবলেন, বিয়ের পর সংসার মায়ায় জড়িয়ে পড়লে কালীর বড় বড় বাত উবে যাবে। কালী সংসার জীবনে পা বাড়ালেন। ফুলশয্যার রাতে নির্জন কক্ষে চার চোখের মিলন ঘটলো। বিপ্লবীর জীবনে স্নিগ্ধ-সুন্দর মিলন মধুর সন্ধিক্ষণ। প্রেমলতা কি পারবেন তাঁর স্বামীকে প্রেমডোরে বেঁধে ফেলতে। কি আশায় তিনি বাসর রচনা করতে চলেছেন ?

কালী রাইফেল ও রিভলবারের সাথে মিতালি করে জালালাবাদের বীর সৈনিকের গৌরব অর্জন করেছেন। গ্রাম্য অনাথা মেয়ে প্রেমলতা বধূবেশে কালীর জীবনের সাথে জীবন যোগ করতে চলেছেন।

প্রেমলতা জানেন তাঁর স্বামীর মাথার ওপর ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। বীরের গলায় মালা পরাতে পেরে তাঁর নারীজীবন ধন্য। হোক না ক্ষণিকের। তবুও এ পাওনা ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি তৃপ্ত। পূর্ণ।

ফুলশয্যার রাতে কালী তাঁর স্ত্রী প্রেমলতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তুমি কি শুনেছো ?"

প্রেমলতা ব্রীড়ানম্র সুরে বললেন, "শুনেছি, জালালাবাদ পাহাড়ে আপনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমার ইচ্ছে হয় আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে শুনতে।"

কালী বললেন, "তুমি আমার স্ত্রী। আমারও পবিত্র কর্তব্য তোমাকে জানানো। আমার সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা থাকলে, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি সচেতন থাকতে পারবে। যাঁরা স্বদেশী তাঁদের চলার পথ বন্ধুর। তোমাকে যখন তখন পুলিশের ঝামেলা পোহাতে হতে পারে। আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে হটিয়ে দিতে চাই। কেননা ইংরেজরা

আমাদের দেশের ধনসম্পদ লুটেপুটে তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের লোক ভুখা মরছে।"

কিছুক্ষণ বলার পর কালী চুপ করে রইলেন। প্রেমলতা জিজ্ঞেস করলেন, "কই, আপনি কিভাবে বিপ্লবীদলে যোগ দিলেন তা তো বললেন না ?"

স্ত্রীর শোনার আগ্রহ দেখে কালী ফের বলতে শুরু করলেন, "১৯২৮ সাল। রাজবন্দীরা জেল থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছেন। চট্টগ্রামে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন জোয়ার বইছে। আমি সদরঘাট ব্যায়াম ক্লাবে যোগ দিলাম। আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী পুলিন ঘোষ আমাকে বিপ্লবীদলের সদস্য করলো। পুলিন ঘোষের বাড়ি আমাদের গ্রামে। আমাদের গ্রুপ লীডার কালীপদ চক্রবর্তী (পণ্ডিতদা) আমাকে মাস্টারদার সাথে দেখা করার সুযোগ করে দিলেন। সেদিন ছিল শনিবার। ইস্কুল ছুটির পর পণ্ডিতদার নির্দেশে চট্টেশ্বরী কালীবাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। বাঁ-হাতে ইস্কুলের বই, ডান হাতে পরিচয়ের প্রতীক ফুল। চট্টেশ্বরী কালীবাড়ির পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে পৌঁছতেই একটি লোক আমার হাত থেকে ফুল কেড়ে নিলেন। ছিনে গড়ন মানুষটিই মাস্টারদা, এক লহমায় বুঝে নিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। মাস্টারদা নানা প্রশ্ন করে চললেন। আমি উত্তর দিতে লাগলাম। হঠাৎ দু'জন গোয়েন্দার উপস্থিতিতে মাস্টারদা কথা বন্ধ করে দিলেন। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। আমাকেও সঙ্গে করে কাছাকাছি একটি পাহাড়ে নিয়ে গেলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মাস্টারদা বললেন, "ক্ষুদিরাম, কানাইলালের আদর্শই আমাদের আদর্শ। সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে আমাদের জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই আমাদের সব সময় তৈরি থাকতে হবে চরম আত্মত্যাগ করার জন্য। কালী, তুমি কি পারবে ?"

আমি বিনীতভাবে বললাম, "আশীর্বাদ করুন, আস্থা রাখুন। তারপর বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে পরিচিত হলাম। ঝড়ের বেগে আমাদের পরিকল্পনা এগিয়ে চললো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর আমরা পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। চারদিন না খেয়ে না দেয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলাম। পাঁচদিনের দিন জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হলো। তুমুল যুদ্ধ। বারোজন বিপ্লবী বন্ধু শহিদ হলো। আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী পুলিন ঘোষ তাঁদের মধ্যে একজন।"

ফুলশয্যার রাতে কালী তাঁর স্ত্রীকে বিপ্লবের প্রথম পাঠ দিলেন। প্রেমলতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বামীর বিপ্লবী জীবনের পূর্ববৃত্তান্ত শুনলেন। এবং জানতে চাইলেন, "আপনাদের বিপ্লবীদলে মেয়ে সদস্য আছে ?"

জবাবে কালী বললেন, "এতোদিন পর্যন্ত বিপ্লবীদলে মহিলা সদস্য নেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।"

যার অন্তরে প্রেম নেই তার বন্ধু নেই। ভালোবাসার সাগরে কালী যেন ডুবোজাহাজ। বন্ধুমহলে তিনি অতি প্রিয়জন। প্রেমলতা ভাবলেন, তাঁর স্বামী এক মহান্ আদর্শে ব্রতী হয়েছেন। যদি সেই আদর্শের প্রতি প্রেরণা যোগানো যায়, তাহলে তাঁর স্বামী ইতিহাস

সৃষ্টি করতে পারবেন। সেখানেই নারীজীবনের সার্থকতা।

প্রেমলতা ভাবাবেগে বললেন, "আমাকে আপনাদের দলে নিলে, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করবো।"

"বেশ ভালো কথা। সময় মতো আমি মাস্টারদাকে তোমার কথা বলবো।" কথা কটি বলেই কালী সাগরের তলদেশে যেন ডুব দিলেন। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে প্রেমলতা তাঁর স্বামীর গম্ভীর মুখখানি দেখলেন। মুখখানি দেখে মনে হয় চাঁদকে যেন একখণ্ড কালো মেঘে ঢেকে রেখেছে।

কালী মুখ খুললেন, "তুমি জানো না, আমার পেছনে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে। প্রমাণের অভাবে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। আমার অভিভাবকেরা তোমাকে আমার প্রহরী নিযুক্ত করেছেন। তোমার অতি প্রিয়জনকেও আমার বিপ্লবী জীবনের কোন ঘটনা ঘুণাক্ষরে বলবে না। এতে বিপদ হতে পারে। মনে রেখো, যে-কোন সময় পুলিশ তোমাকে হয়রানি করতে পারে। আমাদের বাসরঘর নিয়তির খেলাঘর। যে-কোন দিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতে পারে। তোমার সাথে আলাপ করার সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।"

কালীকিঙ্কর দে বিয়ে করার পর বিপ্লবী বন্ধুরা ভাবলেন, তিনি দল ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে বিপ্লবী সাথীরা তাঁর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছেড়ে দিলেন। তিনি সাথীদের আচরণে বুঝলেন, তাঁর প্রতি তাঁরা সন্দেহের ভাব পোষণ করেন। এদিকে তাঁর বিপ্লবী মন পরবর্তী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তাড়া দিচ্ছে।

কালী বিয়ে করে ভালো ছেলে সেজে বাড়ির সকলের মন জয় করে নিলেন। এবং মাস্টারদার ডাকের প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন। মাস্টারদার ডাকের বিলম্ব দেখে, একদিন তিনি মাস্টারদার গুপ্ত আস্তানায় গিয়ে দেখা করলেন।

প্রেমলতার দেওয়া একজোড়া সোনার বালা মাস্টারদার হাতে দিয়ে কালী বললেন, "আমার স্ত্রী এই সোনার বালা দুটি আপনাকে উপহার দিয়েছে। তার একান্ত বাসনা তাকে যেন দয়া করে আমাদের দলে স্থান দেন।"

কালীর কথাগুলি মাস্টারদা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মাস্টারদা কালীর চোখে চোখ রাখলেন। কালীর মনে হলো, মাস্টারদার চোখ দুটি তাঁর অন্তর্জগৎ জরিপ করে চলেছে। পাথর হাজার বছর জলে থাকলেও তাতে জল ঢুকতে পারে না। কালী জন্ম-বিপ্লবী তা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

মাস্টারদা বললেন, "কালী, যথাসময়ে তোমাকে কাজে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবো।" মাস্টারদার নির্দেশের প্রতীক্ষায় কালীকিঙ্কর দে।

এক সময় মাস্টারদার নির্দেশ এলো। যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ে দশমণ বন্দুকের বারুদ তৈরির ভার পড়লো অর্ধেন্দু গুহের ওপর। অর্ধেন্দু এবং আরো কয়েকজন বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে প্রবল উদ্যমে কালী দে বারুদ তৈরি ও ল্যাণ্ডমাইন বসানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কেবল একা নন—সপরিবারে। কালীর পরিবারে যাঁরা বারুদ তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন—কালীর বাবা দীনবন্ধু দে, কাকা নিশি দে, জেঠীমা নয়নতারা, কাকীমা জয়কুমারী ও স্ত্রী প্রেমলতা।

বন্দুকের বারুদ ও ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করতে একটি ছোট কারখানার দরকার। কালীর অসীম সাহসী কাকা নিশি দে এগিয়ে এসে তাঁর থাকার একটি ঘর বিপ্লবীদের কাজের জন্য ছেড়ে দিলেন। বাবা চট্টগ্রাম রেলওয়ে কারখানায় সাব-পারম্যানেণ্ট ওয়ে ইন্‌স্‌পেক্টার পদে কাজ করেন। তিনি ভালো বাজি তৈরি করতে জানেন। তাই কাঠকয়লার গুঁড়ো প্রস্তুতে তাঁর অবদান অসমান্য।

বারুদ তৈরিতে কুল কাঠের কয়লার প্রয়োজন। দরকার সোরা ও গন্ধক ইত্যাদি। এসব ঢেঁকিতে কুটে গুঁড়ো করা। তারপর কাপড়ে ছেঁকে মিহি গুঁড়ো মজুত করা। এসব কাজ কালীর পরিবারের সকলেই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুসম্পন্ন করলো। পরিবারের মধ্যে কালীর প্রভাব অপরিসীম। তাই বিপ্লবের কাজে তিনি পরিবারের সকলকে যুক্ত করতে পেরেছেন।

'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ' (দ্বিতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃঃ) গ্রন্থে অনন্ত সিংহ লিখেছেন, "প্রেমলতা যে সময়ে বিপ্লবী সংগঠনের কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই সময়ে মাস্টারদার সঙ্গে আমাদেরও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। যুব-বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি পুরোদমে চলেছে। দশ মণ বারুদ তৈরির দায়িত্ব অর্ধেন্দু গুহের উপর ন্যস্ত। অর্ধেন্দুর বিপ্লবী নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা ছিল। কালী দে তার সর্বশক্তি নিয়ে অর্ধেন্দুর সঙ্গে যোগ দিল। কালীর কাকা, বাবা, মা (জেঠীমা) ও স্ত্রী—সকলেই বন্দুকের বারুদ তৈরির 'উৎসবে' লেগে গেলেন।"

ল্যাণ্ডমাইন তৈরির বিরাট কর্মযজ্ঞে মাস্টারদা কল্পনা দত্তের (জোশী) ওপর দায়িত্ব দিলেন, অ্যাসিড সংগ্রহ ও গান-কটন তৈরি করার। কল্পনা বৈপ্লবিক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে ছিলেন। কাজ তিনি পেলেন। বড়ই কঠিন কাজ। অর্ধেন্দুর মাধ্যমে কল্পনা কাজ পেলেন। অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করে, কল্পনা দত্তকে অ্যাসিড যোগাড়ের গুরুত্ব অনুধাবন ও দায়িত্ব পালনের জন্য একখানি চিঠি লেখেন।

বসন্তের আগমনবার্তায় প্রকৃতি যেমন পত্র-পুষ্পে নিজেকে নয়নাভিরাম করে সাজিয়ে তোলে তেমনি বিপ্লবী বন্দীরা বন্ধকারার রুদ্ধদ্বার খোলার জন্য শত-সহস্র আশা বুকে নিয়ে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করে চলেছেন।

যৌবন চিরবন্দিত। কারাপ্রাচীরের অন্ধকার থেকে বিপ্লবীরা আলোরজগতে ছুটে আসতে চান। ফুলের বুকে যেমন সৌরভ, পাখির কণ্ঠে যেমন গান তেমনি বিপ্লবীদের বুকে অফুরন্ত আশার ঝর্ণাধারা। প্রকৃতি চায় বসন্তের প্রেমময় স্পর্শ। বিপ্লবীরা চান পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন।

বিপ্লবীদের পরিকল্পনা হলো—রাত বারোটায় জেল-প্রাচীর ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবেন। একই সঙ্গে জেলের বাইরে দুটি মিলিটারি পোস্ট লক্ষ্য করে মুক্ত বিপ্লবীরা বোমা ছুঁড়বেন। মিলিটারিরা তখন পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

অদূরে নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাক নিয়ে দু'জন দলের সদস্য প্রতীক্ষা করবেন। এই সুযোগে ভাঙ্গা প্রাচীরের পথে বিপ্লবীরা পালাবেন। এবং দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে উঠবেন।

ট্রাক কর্ণফুলি নদীর দিকে ছুটবে। কর্ণফুলিতে দুটি সাম্পান ঠিক করা থাকবে। সেই নৌকায় মাঝি সেজে থাকবেন দু'জন বিপ্লবী সদস্য। বিপ্লবীরা কর্ণফুলি নদীর ঘাটে

পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সাম্পানে করে তাঁদের গ্রামের [illegible] নিয়ে যাবে।"

মহাকবি নবীন সেনের দেশের বিপ্লবী তরুণেরা কেবল [illegible] চলেছেন। মায়াবিনী আশা কোথায় তাঁদের নিয়ে যাবে তা তাঁরা জানে [illegible] মতো আশা তাঁদের নাচাচ্ছে! কথায় বলে, যতোদিন শ্বাস ততোদিন [illegible] জীবনের মৃত্যু। আশাহীন মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই কারাপ্রাচীরের অন্ধকা[illegible] তাঁরা বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। তাঁরা ভাবছেন, তাঁদের আরব্ধ কাজ এখনো অসমাপ্ত।

কল্পনা দত্ত বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালনে সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে, বিপ্লবী সাথী নিবারণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা পৌঁছলেন। প্রয়োজন. প্রচুর পরিমাণে পিওর নাইট্রিক ও পিওর সালফিউরিক অ্যাসিড। অ্যাসিড যোগাড়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন রেণু রায় ও কমলা ব্যানার্জী প্রমুখ। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রায় ৮০ পাউণ্ড অ্যাসিড সংগ্রহ হলো। অ্যাসিড সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তারপর পুলিশের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে ট্রাঙ্কে করে অ্যাসিড কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম নিয়ে এলেন—কল্পনা দত্ত, কুমারী নলিনী পাল ও নিবারণ ঘোষ। কুমারী নলিনী পাল এম. এ. পাস।

কল্পনা দত্ত 'স্মৃতিকথা' (৭৭ পৃঃ) গ্রন্থে লিখেছেন "১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। আই. এস্. সি. পরীক্ষার কিছুদিন আগে কলকাতা যাই দলের কাজে। মার্চ মাসে পরীক্ষা —তাই ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা যাওয়া অস্বাভাবিক ঠেকেছিল, প্রীতি করেছিল সন্দেহ। শেষকালে দাদাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যখন আবার জিনিসপত্র নিয়ে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে আসি, ও হয়েছিল মনে মনে অসম্ভব আহত। আমারও কষ্ট হয়েছিল, আমিও জানতাম, প্রীতির মত বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ নাই।"

অ্যাসিড আনার পর কল্পনা দত্তের ওপর গান-কটন তৈরি করার ভার পড়লো। কল্পনা কেমিস্ট্রির ছাত্রী। গণেশ ঘোষ জামিনে মুক্ত বিপ্লবী সাথীদের দিয়ে জেলের মধ্যে ইন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিট্যানিকা "জী" আনলেন। সেই বই পড়ে তিনি গান-কটন তৈরির ফরমূলা জেনে নিলেন।

গণেশ ঘোষ গান-কটনের ফরমূলা লিখে নিয়ে গোপন পথে কল্পনা দত্তের কাছে পাঠালেন। কল্পনা নিজের বাড়িতে ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করলেন। এবং গান-কটন তৈরির পরীক্ষা শুরু করে দিলেন।

ল্যাণ্ডমাইন তৈরি করার মালমসলার সাথে কল্পনা দত্তের কলকাতা থেকে আনা এক ট্রাঙ্ক অ্যাসিডও কালীকিঙ্কর দের বাড়ি এসে গেলো। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাতদিন কাজ করে চলেছেন—অপূর্ব সেন, কালী দে, প্রফুল্ল মল্লিক, সুশীল সেন, রবি সেন এবং আরো কয়েকজন।

ল্যাণ্ডমাইন তৈরি হবার পর, নিশি দে ল্যাণ্ডমাইনগুলো জায়গায় জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবার ভার নেন। চারদিকে পুলিশ অতি সতর্ক। সন্ধ্যার পর নিশি দের পরিচিত রহিমবক্সের ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ল্যাণ্ডমাইনগুলি অতি গোপনে দেওয়ানবাজার মধুগুহের বাড়ি এবং বক্সীহাটে নিবারণ ঘোষের বাড়ি পৌঁছাতে লাগলেন। ল্যাণ্ডমাইন তৈরি ও মাটিতে পোঁতা পর্যন্ত সময় লেগেছে প্রায় দীর্ঘ আট মাস।

ল্যাণ্ডমাইনগুলি পাচার [redacted] নাশ দে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। বিপ্লবী সদস্য রবি সেন [redacted] সুন্দর চেহারার রবি সেনকে নিশি দের স্ত্রী জয়কুমারী শাড়ি [redacted] তারপর নিশি দের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বৌ সেজে [redacted] ভাবলো, নিশিবাবু সপরিবারে কোথায় যেন চলেছেন। সেই [redacted] বিশ পাউণ্ড ওজনের কয়েকটি ল্যাণ্ডমাইন। একই পদ্ধতিতে নিশি [redacted] ইনগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় সময় মতো পৌঁছাতে লাগলেন।

[redacted] বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম শহরের সাংগঠনিক দায়িত্বে আছেন শচীন সেন। মাস্টারদার নির্দেশে তিনি বিপ্লবী সদস্যদের কাজে নিযুক্ত করেন। মনোনীত সদস্যদের অর্ধেন্দু গুহের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। যাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানে পরিকল্পনার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তাঁরা হলেন, ফকির রায়চৌধুরী, বেণু ঘোষাল, রমণী ব্যানার্জি, চিত্ত সেন, মধু গুহ, বঙ্কিম মজুমদার, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, শরৎ কানুনগো ও রবি আচার্য প্রমুখ।

সকলে সব কাজের উপযুক্ত নয়। মাস্টারদা বেছে বেছে যোগ্যতা অনুসারে সদস্যদের কাজে নির্বাচন করেন।

'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়' প্রবন্ধে অর্ধেন্দু গুহ লিখেছেন, "সেই সময়ে চট্টগ্রামে ব্যাপক ফৌজি, পুলিশ ও গুপ্তচরের অস্বাভাবিক তৎপরতা ও তল্লাসীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে পাথরঘাটার ইটখোলায় নির্জন একটি বাড়িতে, কুমিরা গ্রামের সুবোধ রায়-এর বাড়িতে, কর্ণফুলি নদীর অপর তীরে রাখালসখা বসাকের গ্রামের বাড়িতে এবং বিশেষভাবে শহরের দক্ষিণপ্রান্তে কালী দে এবং তাঁর কাকা নিশি দের বাড়িতে ল্যাণ্ডমাইনের বারুদ ও ল্যাণ্ডমাইন তৈরী করতে আমরা যে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলাম তার কোনও তুলনা হয় না।

"সর্বোপরি বিনোদিনী মাসীমা (শহিদ রজত সেনের মা) ও মনোরমা মাসীমা (শহিদ দেবু গুপ্তের মা) আমাদের এই সব বৈপ্লবিক কাজে সক্রিয়ভাবে নানারূপ সহযোগিতা করেছেন। সেই সময় বিনোদিনী মাসীমার বাড়িতে তাঁর দায়িত্বে আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি রাখা হত।"

পরিকল্পনা মতো জেলের ভেতর সব অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে গেছে। জেলের বাইরে শহরের নানা স্থানে ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রশাসন অচল করার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বিপ্লবীরা দিন গুনছেন।

এই সন্ধিক্ষণে চন্দননগরে যেসব ইংরেজ সার্জেন্ট জীবন ঘোষালকে হত্যা করেছিলেন, এবং গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে নির্মম অত্যাচার করেছিলেন তাঁরাই চট্টগ্রাম আদালতে সাক্ষী দিতে এলেন। সার্জেনদের দেখে বিপ্লবী বন্দীদের প্রতিশোধবহ্নি দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো। বিপ্লবীরা সার্জেনদের লক্ষ্য করে গালাগালি দিতে শুরু করলেন। হাতে হাতকড়া অবস্থায় পুলিশের সাথে বিপ্লবীদের মৃদু ধাক্কাধাক্কি হলো। ফলে মিঃ সুটার ফকির সেনের নাকে প্রচণ্ড এক ঘুষি চালালেন। ফকির সেনের নাক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রক্ত ঝরছে।

ঘটনাটা ঘটলো আদালত থেকে জেলে ফেরার পথে। গাড়িতে তাঁরা উঠবেন এমন সময়।

অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিপ্লবী বন্দীদের হাতে হাতকড়া। তাঁদের চারদিকে পুলিশ ও মিলিটারিতে ঘিরে রয়েছে। সহানুভূতিশীল দর্শকবৃন্দ অসহায়ের দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ফকির সেনের নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে দেখে অনন্ত সিংহের মাথায় খুন চাপলো। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না।

অনন্ত সিংহ সিংহের হুঙ্কার দিয়ে পুলিশ সুপার মিঃ সুটারকে বললেন, "সুটার আমি তোমাকে সাবধান করছি। থামো। তোমার বৃটিশ আচরণের জন্য তোমাকে প্রচুর মাসুল দিতে হবে।..."

অনন্ত সিংহের মুখ দিয়ে যেন কামানের গোলা বের হয়ে আসছে। অনন্ত সিংহের রুদ্রমূর্তি দেখে মিঃ সুটার ভড়কে গেলেন।

পরদিন অর্ধেন্দুর মারফত অনন্ত সিংহ মাস্টারদার কাছে খবর পাঠালেন সাত দিনের মধ্যেই পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব যাতে তিনি শেষ করেন।

সেদিন রাতে অর্ধেন্দু মাস্টারদার সাথে দেখা করলেন। মাস্টারদার তাঁর দূরদৃষ্টিতে ঘনায়মান একটা অশুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন।

মাস্টারদা অর্ধেন্দুকে বললেন, "অনন্তলাল মিঃ সুটারকে আলটিমেটাম দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে। এই সময় অধৈর্য হওয়া মোটেই উচিত হয়নি।"

সুটার সাহেবকে আলটিমেটাম দেওয়ার দু-তিন দিনের মধ্যে জামিনে মুক্ত ছ'জন বিপ্লবীদের ফের বন্দী করে জেলে নিয়ে গেলো।

অর্ধেন্দু এখন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। মাস্টারদা, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং ভাবনায় পড়লেন। মাস্টারদা অর্ধেন্দুর অভাবে অধীর হয়ে উঠলেন। কাকে দিয়ে পরিকল্পনার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাবেন।

জামিনে মুক্ত বিপ্লবীদের জেলে আটক করে মিঃ সুটার খুশি হলেন না। তারপর জেলের মধ্যেও কড়াকড়ি শুরু হলো। জেল-প্রাঙ্গণে বিপ্লবী বন্দীদের অবাধ ঘোরাঘুরি বন্ধ। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে লক্-আপ থেকে সেলে ঢুকানো হলো।

সেলের সামনে এণ্টি-সেল। এণ্টি-সেল পাকা করতে রাজমিস্ত্রী এলো। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের বুক দুরদুর করছে। এণ্টি-সেলের মাটির নীচে বারুদের অনেক বোতল এবং সিগারেটের কৌটোয় মোটরের হেড্‌লাইটের তিনটি বালব্ রাখা আছে। এই বুঝি সব বের হয়ে পড়লো। তা হলে এতোদিনের সাধনা পণ্ড হয়ে যাবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে সব চিন্তার অবসান হলো। মাটি খুঁড়তে গিয়ে প্রথমে সিগারেটের কৌটোয় ইলেক্‌ট্রিক বালব্ পেয়েই সেপাই, জমাদারেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তারপর জেলার, ডেপুটি-জেলার ও জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এলেন। জেলের বড় ঘণ্টা বাজতে লাগলো। পাগ্‌লা-ঘণ্টি বাজার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারি দিয়ে জেল ঘিরে ফেললো।

বিপ্লবীদের ভাগ্যের পাশাখেলায় ভাগ্যদেবী শকুনির চাল দিয়ে বসলো। তিনটি ইলেক্‌ট্রিক বালব্ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের হুকুমে জেল-কম্পাউণ্ডের মাটি হতভাগ্য কয়েদীদের দিয়ে ওলটপালট করে দিলো। মাটির তলা থেকে একে একে প্রায় সব অস্ত্রশস্ত্র বের হয়ে পড়লো। বিপ্লবী বন্দীদের সাত-আট দিন ধরে হাজতে রাখা হলো।

অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ ভাবলেন, যে করেই হোক অর্ধেন্দুকে জেল থেকে বের করতে হবে। অর্ধেন্দুর সঙ্গে যাঁরা জামিনে মুক্ত ছিলেন তাঁদের অভিভাবকেরাও আইনগত প্রশ্ন তুলে জজসাহেবের কাছে আবেদন করলেন। আবেদন মঞ্জুর হলো। আবার ছ'জন জামিনে মুক্তি পেলেন।

জেল থেকে বন্দিমুক্তি প্ল্যানটি মাঠে মারা গেলো। এখন একমাত্র ভরসা দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি। শাসকগোষ্ঠি তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। অনন্ত সিংহ অর্ধেন্দুকে খুব সাবধানে বাইরের কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। গোয়েন্দারা অর্ধেন্দুর সাথে বুদ্ধির খেলায় বারবার হেরেছে। এবার কি তিনি জয়ী হতে পারবেন ?

অর্ধেন্দু গুহ জামিনে মুক্তি পেয়ে তিন-চার দিন পরে একরাতে মাস্টারদার সাথে দেখা করতে গেলেন। জেলের ভেতর অস্ত্রশস্ত্র ধরাপড়ায় মাস্টারদার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বিপ্লবী বন্দীদের ফুলের মতো সুন্দর মুখগুলো তাঁর মানসপটে বারবার ভেসে উঠছে। বন্দী বিপ্লবীদের চিন্তায় তিনি বিচলিত। তাঁদের তিনি আর বাঁচাতে পারলেন না।

এ মতো অবস্থায়ও মাস্টারদা অর্ধেন্দুকে বললেন, "অনন্তলাল ও গণেশকে বলবি, তারা যেন হতাশ না হয়। এখনো সময় আছে। নিরাশ হবার কিছুই নেই। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সব সময় অঙ্কের হিসাবে মেলে না।"

অর্ধেন্দু লক্ষ্য করলেন, মাস্টারদার প্রতিটি কথায় বিপ্লবী বন্দীদের জন্য মমতা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

চট্টগ্রাম শহরে কারাফিউ। কঠোর পুলিশ ও ফৌজি প্রহরা। সান্ধ্য আইনের মধ্যে অর্ধেন্দু ও তাঁর সাথীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। এতো সতর্কতার মধ্যেও পুলিশ বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় হানা দিলো। দশ মণ বারুদ জলে ফেলে দিয়ে তাঁরা রেহাই পেলেন। আবার ছ মণ বারুদ তৈরি করলেন।

কার্‌ফিউর মধ্যে বাইরে কাজ করা মানে প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া। মিলিটারির চোখে পড়লেই রাইফেলের গুলিতে প্রাণ যাবে। বিপ্লবীরা রাত বারোটা থেকে রাত তিনটার মধ্যে মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়ে ল্যাণ্ডমাইন পুঁতে চলেছেন।

চট্টগ্রাম শহরের সুরক্ষিত আদালত ভবনের কাছে আটটি ল্যাণ্ডমাইন দু'ভাগে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে বসানো হলো। উদ্দেশ্য—কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি যাবার সময় মাইন বিস্ফোরণে প্রথমে যমালয়ে পাঠাতে হবে।

ঘটনা ঘটে যাবার পর পুলিশ ও মিলিটারি অফিসারেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এলে দ্বিতীয় দফায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হবে।

তারপর লাভলেইন নামে রাস্তাটিতে তিনটি মাইন পোঁতা হলো; কেননা এই রাস্তা দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারেরা সব সময় যাতায়াত করেন। সুযোগ বুঝে তাঁদের কবর দিতে হবে। এই দুই জায়গায় ফাঁদ পেতে ঘুঘু হয়তো ধরা সম্ভব হবে না। তাই তাঁরা ল্যাণ্ডমাইন পোঁতার পরিধি আরো বিস্তার করতে প্রয়াসী হলেন।

পুলিশ সুপারের বাড়ির পাশের রাস্তার ধারে তিনটি মাইন মাটির নীচে বসানো হলো। সময় মতো পুলিশ সুপারকে যীশুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা।

না, এতেও যথেষ্ট নয়। তাঁরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁদের নজরে এলো

পলটন মাঠে ইংরেজ সাহেবেরা ক্রিকেট খেলেন। এবং অনেক ইংরেজ অফিসার খেলা দেখেন। খেলা দেখায় যখন মত্ত থাকবেন তখন ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে তাঁদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে। সেখানে কাঠের খুঁটির ওপরে একটি কাঠের ছোট ঘরে বড় বড় ইংরেজ অফিসার খেলা দেখেন।

বিপ্লবীরা কথায় আর কাজে এক। ভাবার সাথে সাথে তাঁরা কাজে লেগে গেলেন। সেই ঘরটির নীচে মাটির তলায় চারটি মাইন পোঁতা হলো।

এরপরও বিপ্লবী মন শান্ত হতে চায় না। তাঁরা সার্কিট হাউসের কথা ভাবলেন। এখানে জেলার প্রধান প্রধান শাসকেরা সময়-সময় মিলিত হয়ে গোপন পরামর্শ করেন। তাই সার্কিট হাউসের গেটের রাস্তার ধারে তিনটি মাইন পোঁতা হলো।

দাবার শেষ চালটি হলো – আস্কর খাঁর দিঘির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে। বাড়িটি প্রীতিলতার পাশের বাড়ি। অবিনাশ দত্ত বাড়িটির মালিক। এই বাড়িতে কিছু-দিন কালীকিঙ্কর দে ছিলেন। বাড়িটি ভাড়া নেওয়ার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। বিপ্লবীরা প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হওয়ায় ঘরে তালা ঝুলিয়ে চলে যান। তালার চাবি তাঁর কাছে রাখলেন। ঘরে এক ট্রাঙ্ক অ্যাসিড ছিল। বাড়ির পেছনে কলা বাগানে ট্রাঙ্কটি কালীকিঙ্কর দে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। বাড়িটি খালি।

খালি বাড়িটিতে প্ল্যান অনুযায়ী ল্যাণ্ডমাইন পোঁতার ব্যবস্থা হলো। বিপ্লবীরা রাতে খালি বাড়ির তালা খুলে ঘরের মেঝেতে একটি ল্যাণ্ডমাইন পুঁতলেন। বাড়িটির উঠানে পুঁতলেন তিনটি, সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার সংযোগ করা হলো যাতে ব্যাটারির সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। উদ্দেশ্য—ঘরের মধ্যে একটি বোমা ফাটানো হবে। অথবা ঘরটি বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল বলে পুলিশকে ফোনে খবর দেওয়া হবে। পুলিশ অফিসারেরা ঘটনাস্থলে এলে মাইন বিস্ফোরণে তাঁদের খতম করা হবে।

দশ ও বিশ পাউণ্ড ল্যাণ্ডমাইনগুলি কম পক্ষে পনের ইঞ্চি গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটির তলায় বসাতে হয়। তারপর বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করে দূর থেকে ব্যাটারির সাহায্যে বিস্ফোরণের ব্যবস্থাদি করতে, একরাতে একজনে একটি ল্যাণ্ডমাইন বসাতে সক্ষম হয়।

শেষ দিন দুটি মাইন পোঁতার জন্য দু'জনের যাওয়ার কথা। ভাগ্যের এমন পরিহাস সে রাতে কাজের জায়গায় একজন অনুপস্থিত। দুটি মাইন একজনের পক্ষে এক রাতে গভীর করে মাটি খুঁড়ে বসানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তার ওপর চট্টগ্রামের পাহাড়ী মাটি। শক্ত। নিবারণ ঘোষ একা একটি মাইন গভীর মাটির তলায় বসালেন। তাতেই রাতের শেষ প্রহর। তিনি ভাবলেন, আর একটি মাইন ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বেচারা নিবারণ সারারাত একা পরিশ্রম করে ক্লান্ত। অবসন্ন। গায়ে কাদা লেপটে আছে।

ভোর হবার আগে নিবারণ ঘোষ সেই মাইনটি মাথায় চাপিয়ে থানার পাশ দিয়ে গন্তব্য-স্থলের দিকে চললেন। একটা সেপাই তাঁকে দেখতে পায়। পুলিশটার ডিউটি ছিল না। সামনের দিঘিতে প্রাতঃক্রিয়ার জন্য গিয়েছে। নিবারণ ঘোষকে দেখে সেপাইটির সন্দেহ হয়। এবং তাঁকে আটক করে।

২ জুন, ১৯৩১ সাল। একটি ল্যাণ্ডমাইন সহ নিবারণ ঘোষ ভোর রাতে পুলিশের হাতে

ধরা পড়েন। দ্বিতীয় বিপ্লবী যদি উপস্থিত থাকতেন তবে নিবারণ ঘোষ ল্যাণ্ডমাইন সহ ধরা পড়তেন না। অনেক লোকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম পণ্ড হতো না। অনুপস্থিত ব্যক্তিটির জন্য মহাযজ্ঞ ধ্বংস হলো।

পুলিশ নিবারণ ঘোষের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। ফলে কিছু খবর আদায় করতে সক্ষম হয়। সেদিনই পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক ল্যাণ্ডমাইন উদ্ধার করে। শহরে নানাস্থানে খানাতল্লাশী শুরু হয়।

বঙ্গবাণী পত্রিকার খবর :

চট্টগ্রাম শহরময় ভীষণ চাঞ্চল্য

চট্টগ্রামে কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আদালত গৃহসমূহের নিকট ভূগর্ভ হইতে পুলিশ চারটি বাক্স খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। ঐগুলি ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত মাটির নিচ দিয়া প্রায় ৫০ ফুট দূর পর্যন্ত গিয়াছিল। বাক্সগুলি ডিনামাইট পূর্ণ বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে। ঐগুলি খোলা হয় নাই—শীলমোহর করিয়া রাখা হইয়াছে।

আর এক স্থানে একটি বাড়িতে খানাতল্লাশ করিয়া পুলিশ অনুরূপ তিনটি বাক্স পাইয়াছে। প্রত্যুষে নিবারণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি একটি টিন বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ধৃত হয়। উহার বাড়ি কুমিল্লায়। প্রকাশ, তাহারই এজাহারের ফলে নলপাড়ায় একটি বাড়ি খানাতল্লাশ কালে অনুরূপ আরও তিনটি টিন পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে আদালতের বাড়ীসমূহের নিকট কাছাড়ী পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরও চারটি টিন পাওয়া যায়। ঐগুলির চারদিকে ইলেকট্রিক তার দিয়া বাঁধা ছিল এবং তারের একপ্রান্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠের নীচে প্রায় ৫০ ফুট পর্যন্ত গিয়াছিল।

টিনগুলি যখন ১৫ ইঞ্চি গভীর মৃত্তিকাতল হইতে উত্তোলিত করা হয়; তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তথায় ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারকারী স্পেশাল ট্রাইবিউনালের কমিশনারগণ পরে ঐ স্থান পরিদর্শন করেন। [বঙ্গবাণী ঃ ৩-৬-১৯৩১]

নিবারণ ঘোষ গ্রেপ্তার হবার পরদিন খুব ভোরে, শহরের দক্ষিণপ্রান্তে গোঁসাইনডাঙ্গা (বর্তমান ১৮৫ স্ট্র্যাণ্ড রোড) গ্রামে কালীকিঙ্কর দের কাকা নিশি দের বাড়িতে পুলিশ অতর্কিতে হানা দেয়। এবং বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তখনো বিপ্লবীরা ল্যাণ্ডমাইন তৈরির কাজে ব্যস্ত। এ সময়ে ধরা পড়লেন—অর্ধেন্দু গুহ, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মল্লিক। অপূর্ব সেন ও কালীকিঙ্কর দে পালিয়ে যান।

ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রশাসনে অচল অবস্থা সৃষ্টি করার পরিকল্পনায়ও ভাগ্যদেবী যবনিকা টেনে দিলো।

পুলিশ ল্যাণ্ডমাইন কারাখানা আবিষ্কার করতে পেরে, কালীর পরিবারের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। বৃদ্ধ নিশি দে-কে বেদম মারে। এবং গ্রেপ্তার করে।

ঠিক এই সময় কালীকিঙ্করের মা (কালী জেঠীমাকে মা ডাকেন) স্বপ্ন দেখলেন তাঁর কালীকে পুলিশ তাড়া করছে। কালীর মা তখন হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে তাঁর বাপের বাড়িতে। ঘুম থেকে জেগে কালীর মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাড়ির লোকজন নয়নতারার

কাছে ছুটে গেলেন। সবার একই জিজ্ঞাসা তিনি কেন এমন করে কাঁদছেন।

নয়নতারা বললেন, "আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখলাম, কালীকে পুলিশ তাড়া করছে।"

বাপের বাড়ির লোকজন নয়নতারাকে নানান রকম প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি কিছুতেই শান্ত হলেন না।

নয়নতারা তাঁর ভাইকে ডেকে বললেন, "ভাই, আমার কালীর কি হলো তুই একবার শহরে গিয়ে দেখে আয়। নতুবা আমাকে নিয়ে চল। আমি যে আর থাকতে পারছি না।"

শিশু যেমন ভয় পেলে দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের বুকে মুখ লুকায় তেমনি কালী ছুটে চলেছেন তাঁর মায়ের কাছে। বাতাস যেন কালীর কানে কানে বলছে—আয়—আয়—আয়। কালীর মায়ের পীড়াপীড়িতে কালীর মামা শহরে রওনা দিলেন। হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের শেষপ্রান্তে মামার সাথে কালীর দেখা হয়ে গেলো।

কালীকে দেখতে পেয়ে তাঁর মা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কালী সংক্ষেপে তাঁর মাকে দু-চার কথা বললেন। কালী ভাবলেন, মামার বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

কালী তাঁর মাকে বললেন, "মা, তুমি মামার বাড়ির পাশের বাড়িতে বলে আমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করো। পুলিশ আমার খোঁজে মামার বাড়ি আসতে পারে।"

কালীর কথা মতো তাঁর মা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। সেখান থেকে কালী হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের দলের সদস্যদের মাধ্যমে মাস্টারদার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। পুলিশ মোট এগারোজন বিপ্লবীকে বন্দী করলো। তাঁদের বিরুদ্ধে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা চলতে লাগলো।

ইংরেজ সরকার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ দমন করার জন্য বরিশাল জেলার গোয়েন্দা বিভাগ থেকে খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে চট্টগ্রামে নিয়ে এলেন। ইংরেজ সরকারকে খুশি করার জন্য দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার চালানোর পুরস্কার স্বরূপ তিনি খাঁ বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন।

ইংরেজ সরকারের লোক নির্বাচন যথার্থ। চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য ডি. এস. পি. আসানুল্লা হলেন একমাত্র উপযুক্ত লোক। চট্টগ্রামে এসে আসানুল্লা হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালাতে শুরু করলেন। হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ তাঁর অত্যাচার থেকে কেউ রেহাই পায়নি। তিনি শত শত ফৌজ নিয়ে শহর ও গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আসানুল্লার নির্মম অত্যাচার থেকে চট্টগ্রামবাসীরা মুক্তি পেতে চায়।

এ সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী বন্দী হলেন। অম্বিকা চক্রবর্তী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। দুর্বল। গ্রেপ্তার হবার পর আসানুল্লা বুট পায়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর বুকে, পিঠে ও মাথায় অসংখ্য লাথি মারেন। অম্বিকা চক্রবর্তীর দেহ থেকে সমানে রক্ত ঝরছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে। জল চাইলেন তিনি। আসানুল্লা জলের পরিবর্তে প্যান্ট খুলে অম্বিকা চক্রবর্তীর মুখে···।

মাস্টারদা এ খবর শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। খতমের তালিকায় আসানুল্লার নাম যুক্ত হলো।

আসানুল্লার গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য মাস্টারদা হরিপদ ভট্টাচার্যকে চট্টগ্রাম

শহরে পাঠালেন। শহরের লালদিঘির পশ্চিম পাড়ে বিপ্লবী সদস্য পান্নালাল সেন, রামচন্দ্র সিং-এর সোডা-ওয়াটারের দোকানে কাজ করেন। হরিপদ পান্না সেনের সঙ্গে দেখা করলেন। মাস্টারদার লেখা চিঠিটি তাঁকে দিলেন। দু'জনে অনুসন্ধান চালিয়ে আসানুল্লার খবর সংগ্রহ করলেন।

শহর থেকে ফিরে এসে হরিপদ মাস্টারদাকে বললেন, "আসানুল্লার বাড়িতে বহু সশস্ত্র পুলিশ দিনরাত পাহারায় মোতায়েন থাকে। খাঁ বাহাদুর বাইরে বের হলে, চারজন দেহরক্ষী রিভলবার নিয়ে তার গাড়ির মধ্যে থাকে। শহরে থাকলে বিকেলবেলা প্রায় ফুটবল খেলা দেখতে মাঠে যায়। মাঠে তাকে ঘিরে থাকে বহু মিলিটারি। রাতে যায় রেয়াজুদ্দিন বাজারের এক পতিতার বাড়ি।"

মাস্টারদা স্থির করলেন, ফুটবল খেলার মাঠেই আসানুল্লাকে হত্যা করতে হবে। হত্যার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য মাস্টারদা তিনজন তরুণ বিপ্লবীকে আক্রমণের জন্য চট্টগ্রাম শহরে পাঠালেন। তাঁদের নাম হলো—বিনোদ দত্ত, সুশীল দে ও শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। হরিপদ আক্রমণকারী দলটির সঙ্গে গেলেন। নির্বাচিত বিপ্লবীরা খেলার মাঠে গিয়ে দেখেন আসানুল্লা অনুপস্থিত। কয়েকদিন পর বিপ্লবীরা আবার ফুটবল খেলার মাঠে গেলেন। খেলা শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে অতি বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেলো। বিপ্লবীরা বাধ্য হয়ে গ্রামের বিপ্লবী ঘাঁটিতে ফিরে গেলেন।

হরিপদ মাস্টারদাকে অনুরোধ করলেন, "আপনি আমাকে আসানুল্লা হত্যার সুযোগ দিন। আমি একাই তাকে হত্যা করতে পারবো। ফেরারী বিপ্লবীদের পুলিশ চিনে ফেলতে পারে। এতে আক্রমণের আগে বন্ধুরা পুলিশের কাছে ধরা পড়তে পারে। পুলিশের খাতায় আমার নাম নেই।"

মাস্টারদা হরিপদর প্রস্তাবে রাজি হলেন। এবং তাঁকে পরদিন রাতে তৈরি হয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন।

রাতে মাস্টারদার গোপন আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে হরিপদ তাঁর মায়ের সঙ্গে ঘুমোলেন। ঘুম তাঁর উবে গেছে। আসানুল্লাকে মারতে গিয়ে তাঁরও মৃত্যু হতে পারে। মাকে ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে হরিপদ মামার বাড়ি গেলেন। বিকেলে কয়েকজন বিপ্লবীবন্ধুর সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করলেন। তাঁর মনোজগতে বয়ে চলেছে প্রচণ্ড ঝড়।

নির্ধারিত রাতে হরিপদ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। রাতের গাঢ় অন্ধকার। তিনি কালী মন্দিরে গেলেন। বুকের রক্ত দিয়ে কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন, "মা, আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন আসানুল্লাকে হত্যা করতে পারি। প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতনেও যাতে আমি অবিচল থাকি।"

কালীমন্দির থেকে বের হয়ে হরিপদ মাস্টারদার গুপ্ত আস্তানায় হাজির হলেন। সেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন—মাস্টারদা, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও সরোজ গুহ।

হরিপদ ভট্টাচার্যের গ্রাম পোপাদিয়া। থানা বোয়ালখালী। জেলা চট্টগ্রাম। বাবার নাম অম্বিকা ভট্টাচার্য। মায়ের নাম সত্যভামা দেবী।

সুদর্শন যুবক হরিপদ ভট্টাচার্য। গায়ের রঙ ধব্‌ধবে। সারোয়াতলী হাই ইস্কুলে পড়েন। কাঁধে ঝুলানো মোটা পৈতে। পাতলা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে বাড়ি বাড়ি পুজো করেন। স্বভাব লাজুক। নিরীহ।

নির্মল সেন ভাবগম্ভীরস্বরে বললেন, "আপনারা দাঁড়িয়ে হরিপদর বিপ্লবী অভিযানের সাফল্যের জন্য ভগবানের কাছে এক মিনিট প্রার্থনা করুন।"

বিদায়লগ্নে উপস্থিত, সকলের চোখে জল। পরিবেশ থমথমে। হরিপদর এই যাত্রা হয়তো জীবনের শেষ যাত্রা।

মায়ায় আচ্ছন্ন সকলকে কর্তব্যে সজাগ করার জন্য মাস্টারদা একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, "মহান্ কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি। মায়া, মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা কোনটাই আমাদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। আমরা বিপ্লবী। সব বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রতিজ্ঞা।"

নেতা নির্মল সেন, হরিপদর কোমরে বেল্ট্ পরিয়ে দিলেন। মাস্টারদা একটি রিভলবার সরোজ গুহের হাতে দিয়ে বললেন, "তোর হাত দিয়ে রিভলবারটি হরিপদকে দে। তুই হরিপদকে রিভলবার ট্রেনিং দিয়েছিস। তোর হাত পয়া হাত।"

হরিপদের কোমরে রিভলবার গুঁজে দিয়ে সরোজ গুহ বললেন, "মনে রেখো, দেশবাসী তোমার কাজের সফলতার প্রতীক্ষায় রয়েছে। বীরদর্পে এগিয়ে যাও।"

এবার বিদায়ের পালা। বিদায়ক্ষণে হরিপদ মাস্টারদাকে মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট দিলেন।

রাত তখন একটা। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র নির্মল সেন (বুলবুল) এসে মাস্টারদাকে বললেন, "সাম্পানের ব্যবস্থা করে এসেছি। সাম্পান নিয়ে মাঝি খেয়াঘাটে তৈরি।"

নির্মল সেনের ডাকনাম বুলবুল।

নির্মল সেনের কাঁধে হাত রেখে হরিপদ বললেন, "চল ভাই, আর দেরি করা উচিত নয়।"

হরিপদের সহযোগী হিসেবে চললেন নির্মল সেন। তাঁরা সমবয়সী ও বন্ধু। বিপ্লবী দু'জন সাম্পানে উঠলেন। মাঝি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সাম্পানের দাঁড় টানতে লাগলো। শুরু হলো— দু' বন্ধুতে বিপ্লব বিষয়ক আলোচনা।

হরিপদ তাঁর অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুললেন, "গভীর রাত। ঘুমন্ত পৃথিবী। আমি ও মাস্টারদা চলেছি কদুরখিল গ্রামের একটি বিপ্লবীশিবিরে। আমার পেছনে মাস্টারদা। আচমকা পেছন থেকে মাস্টারদা আমার মাথায় চাটি মারলেন। এবং আঙুল দিয়ে যেদিকে ইঙ্গিত করলেন, তার ভাষা বোঝা গেলো না। একটু পরে দেখতে পেলাম আশ্রয়কেন্দ্রটি মিলিটারিতে ঘিরে ফেলেছে। পলকে আমরা বাঁশ ও সুপারি বাগানের ভেতর দিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেলাম।"

কর্ণফুলি নদীতে নৌকোয় চলতে চলতে দু' বন্ধুতে অনেক গল্প হলো। গল্পের বিষয়বস্তু হলো—অনেকগুলি বিপ্লবী ঘাঁটিতে দু'জনে একসঙ্গে কতো কাজ করেছেন। বহু গোপন আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন। বহু রাত অতন্দ্র প্রহরী হয়ে নিষ্ঠার সাথে মাস্টারদাকে পাহারা দিয়েছেন। এ ধরনের নানান গল্প করতে করতে রাত গড়িয়ে চললো।

পুবের আকাশে উষার হাসি ফুটে উঠেছে। ভোরের পাখির মধুর প্রভাতী সঙ্গীত শুরু হয়েছে। ঘুমন্ত শহর সবে জেগেছে। হরিপদ ও নির্মল চট্টগ্রাম শহরের নদীর ঘাটে এসে পৌঁছলেন। হরিপদকে পোপাদিয়া গ্রামের বলাই আচার্যের শহরের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে নির্মল সেন (বুলবুল) বিদায় নিলেন। তবে তিনি চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে চলে যাননি। কেননা হরিপদর কাজের অগ্রগতির খবর মাস্টারদাকে দিতে হবে।

বেলা তিনটা। হরিপদ ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর পরনে ছেঁড়া ময়লা পোশাক। কাপড়ের তলায় নাভির কাছে রিভলবার। ফুটবল খেলার মাঠে লোক চলেছে কাতারে কাতারে। রাস্তার দুধারে বিস্তর পুলিশ। যুবক দেখলে পুলিশ তল্লাসি চালাচ্ছে। গ্রাম্য ছেলের মতো বুকের ওপর ছাতা ঝুলিয়ে মাঠে পৌঁছলেন তিনি।

চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠে দর্শকের ভিড়। ফৌজী বেষ্টনীর মধ্যে বসে আসানুল্লা ফুটবল খেলা দেখছেন। শত চেষ্টা করেও হরিপদ আসানুল্লার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে মাঠ থেকে ফিরে এলেন।

মাঠ থেকে ফিরে হরিপদ সোজা রেয়াজুদ্দিন বাজারের একজন পতিতার বাড়ির উঠানে গিয়ে হাজির হলেন। উঠানে দাঁড়িয়ে হরিপদ ডাকলেন, "মা, মা।"

একজন মহিলা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। গৌরাঙ্গপ্রতিম হরিপদকে দেখে মহিলার মাতৃহৃদয় গলে গেলো! মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে বাবা?"

হরিপদ বললেন, "মা, আমি দুদিন কিছুই খাইনি। আমাকে খেতে দিন।"

মহিলাটি হরিপদকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বসালেন। একথালা মিষ্টি খেতে দিলেন। হরিপদ গোগ্রাসে সব মিষ্টি খেয়ে নিলেন।

মহিলা হরিপদের বাড়িতে কে কে আছে জানতে চাইলেন। হরিপদ ভুয়ো নাম ও ঠিকানা দিয়ে বললেন, "বাবা হাটহাজারী থানায় কবিরাজী করেন। মা মারা গেছেন। সৎমা আছেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।"

মাতৃরূপা মহিলা হরিপদকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "তোমার সৎমায়ের কাছে তোমাকে আর যেতে হবে না। তুমি যখন আমাকে মা ডেকেছো তখন তুমি আমার ছেলে। আমার ছেলে বেঁচে থাকলে ফর্সা, সুন্দর এবং তোমার মতো বড়ো হতো।

মহিলাটি রাতে নিজ হাতে রান্না করে হরিপদকে খাওয়ালেন। তারপর তাঁকে একটা ঘরে শুতে দিয়ে তিনি দোতলায় চলে গেলেন। হরিপদ ভাবছেন, কখন খাঁ বাহাদুর আসবেন। ভাবতে ভাবতে এক সময় তাঁর ঘুম এসে গেলো। ভোরবেলা ঘুম থেকে জাগলেন তিনি। পাশাপাশি কয়েকজনের আলোচনা শুনে হরিপদ বুঝলেন, রাতে আসানুল্লা এসেছিলেন। ঘুমের জন্য শিকার ফসকে গেছে।

পরদিন হরিপদ তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার অছিলায় পতিতালয় থেকে বের হয়ে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়তলী ফুটবল খেলার মাঠে পৌঁছলেন। মাঠে অসংখ্য দর্শক। ফাইনাল খেলা।

যথাসময়ে ফুটবল খেলা শেষ হলো। খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার ফুটবল টীম্ 'টাউন ক্লাব' জিতলো।

বিজয়ী টীমের ক্যাপ্‌টেন দু হাতে কাপ উঁচুতে তুলে 'হিপ্ হিপ্ হুররে' ধ্বনি দিতে দিতে

তাঁদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আসানুল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন কাপটি আসানুল্লার হাতে দিলেন। খাঁ বাহাদুর আত্মরক্ষার কথা ভুলে গিয়ে কাপ নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। দর্শক ও খেলোয়াড়েরা আসানুল্লার চারপাশে ভিড় করলো।

সুযোগের অপচয় না করে হরিপদ জনতার মধ্যে মিশে গেলেন। পা পা করে আসানুল্লার একদম কাছাকাছি এসে পড়লেন। কোমর থেকে রিভলবার বের করে পরপর তিনবার গুলি করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে খাঁ বাহাদুর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

হরিপদ ফাঁকা মাঠ দিয়ে দৌড়তে লাগলেন। খাঁ বাহাদুরের দেহরক্ষীরা তাঁকে তাড়া করলো। ছুটতে ছুটতে অবশিষ্ট তিনটি গুলি দেহরক্ষীদের লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। গুলি লক্ষভ্রষ্ট হলো। এ সময় খেলার পোশাকে দারোগা সিদ্দিক দেওয়ানও হরিপদের পিছু ধাওয়া করলেন। একজন দেহরক্ষীর লাঠির ঘা পড়লো হরিপদের মাথায়। তিনি জ্ঞান হারালেন।

হরিপদের সারা শরীরে কাদা মাখা। দেহ ক্ষতবিক্ষত। প্রচুর রক্ত ঝরছে। মাঠ থেকে তাঁকে থানায় আনা হলো। তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন।

চট্টগ্রামের অ্যাডিশন্যাল্ পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্ মিঃ সুটার ভাঙা ভাঙা বাংলায় হরিপদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে দৈহিক টর্‌চারের সরঞ্জাম আনার আদেশ দিলেন। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যাকৃতির চার-পাঁচজন সেপাই একগোছা ছুঁচ, আট-দশটা বেত, ব্যাটারি চার্জ করার সেট্ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। এমনকি রেক্‌টাম্ দিয়ে গরম ডিম ঢুকানোর ব্যবস্থা হলো।

মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ যেন ধীর পায়ে হরিপদের দিকে এগিয়ে আসছে। পুলিশী নির্যাতনের ফলে হরিপদের অনেকবার রক্ত বমি হলো। বার বার জ্ঞান হারাচ্ছেন। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত। হরিপদের মনোবলের কাছে শেষ পর্যন্ত পুলিশ হার মানলো। নির্মম অত্যাচারের পরও হরিপদ কিভাবে বেঁচে রইলেন তা যেন এক বিস্ময়।

৩০ আগস্ট, ১৯৩১ সাল। হরিপদ আসানুল্লাকে হত্যা করলেন। পরদিন সকালে হরিপদকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৫০০ সৈন্য গেলো সারোয়াতলী গ্রামের ইস্কুলে। এদিকে চট্টগ্রামে শহরের ইংরেজ কর্মচারীরা রাগে অন্ধ হয়ে দলবদ্ধভাবে 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকা অফিসে ঢুকে প্রেস ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো। আক্রমণের ফলে ছাপাখানার ম্যানেজার আহত হন। ইংরেজ কর্মচারীদের প্ররোচনায় মুসলমানেরা শহরের হিন্দুর দোকান লুঠ করলো। কিন্তু মুসলমান নেতাদের যথাসময়ে হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনাটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিতে পারেনি

মিলিটারিরা কয়েকদলে বিভক্ত হয়ে সারোয়াতলী গ্রামের হাই ইস্কুলটি ঘিরে ফেললো। একদল সৈন্য হরিপদকে ইস্কুলের টীচারস-রুমে নিয়ে গেলো। সেখানে আট-দশজন শিক্ষক বসে আছেন। মাস্টারদের লক্ষ্য করে একজন মিলিটারি অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ইস্কুলের ছাত্র হরিপদ ভট্টাচার্যকে চিনতে পারছো?"

কপাল ফেটে, মুখ ফুলে হরিপদের চেহারা এতোই বিকৃত হয়েছে তাঁকে চেনা দায়। শিক্ষকেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

শিক্ষক সুরেশ লালা জবাব দিলেন, "না"।

লাঠির ঘা পড়লো সুরেশ লালার মাথায়। হেডমাস্টার যতীন্দ্রমোহন দস্তিদার এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। মিলিটারিরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো লাঠিপেটা। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

এবার ছাত্রদের শায়েস্তা করার পালা। সৈনিকেরা লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে ইস্কুলের শত শত ছাত্রদের ওপর চালালো বেদম প্রহার। অনেক ছেলের মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। হাত, পা ও কোমর ভেঙ্গে বেশ কিছু ছাত্র এলোপাতাড়ি পড়ে আছে। তাদের করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠলো।

বিকেলবেলা মিলিটারিরা হরিপদকে পোপাদিয়া গ্রামে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলো। তাকে উঠানের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। ক'জন মিলিটারি অফিসার ঘরের ভেতর ঢুকে তাঁর ভাইদের মারধোর করতে লাগলেন। এবং বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। এবার হরিপদের বাবা ও মায়ের ওপর অত্যাচারের পালা। একজন অফিসার তাঁর মায়ের চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সামনের সুপারি বাগানে নিয়ে গেলেন। অনুরূপ-ভাবে তাঁর বাবাকেও নিয়ে গেলেন সুপারি বাগানে। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধলেন তাঁর বাবা ও মাকে সুপারি গাছের সঙ্গে। এমতো অবস্থায় হরিপদকে তাঁর বাবা ও মায়ের সামনে আনা হলো। ওঁরা জানেন না, হরিপদ কোন অপরাধে অপরাধী? কেনই বা তাঁদের ওপর দৈহিক নির্যাতন? প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে হরিপদের বাবা ও মায়ের স্মৃতি যেন বিস্ময়করভাবে লোপ পেলো। দৃষ্টি তাঁদের স্থির। একদৃষ্টিতে তাঁরা হরিপদের দিকে চেয়ে আছেন।

অফিসারেরা হরিপদের বাবা ও মাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। কোন জবাব পেলেন না। পরিশেষে খেপে গিয়ে মারতে শুরু করে দিলেন। দু'জনই জ্ঞান হারালেন। একই সঙ্গে হরিপদের ওপরও চললো লাঠিপেটা। তিনিও সংজ্ঞা হারালেন। ওষুধে হরিপদের জ্ঞান ফিরে এলো।

তারপর পেট্রল ঢেলে মিলিটারিরা হরিপদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিলো। হরিপদকে সঙ্গে নিয়ে সৈনিকেরা সারোয়াতলী ইস্কুলে ফিরে গেলো। এখন ইস্কুলটি সেনাবাহিনীর সাময়িক ঘাঁটি।

গভীর রাত। হরিপদকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি। চারজন গুর্খা সৈন্য তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। একজন গুর্খা সৈন্য একবাটি ভাত ও একবাটি মাংস হরিপদের সামনে রেখে বললো, "বাচ্ছা, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। কেউ দেখতে পেলে আমাদের নোকরি থাকবে না।"

গুর্খা সৈন্যটির মমতাপূর্ণ ব্যবহার দেখে হরিপদের দু চোখে বান ডাকলো। হরিপদের কান্না দেখে পাহারারত সেপাইদের মধ্যে একজন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কেঁদো না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

সামনে খাবার। পেটে আগুন জ্বলছে। মোট আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে হরিপদ ভাতের মুখ দেখলেন। কিন্তু ভাত চিবানোর শক্তি তাঁর নেই। মাংসের ঝোল মেখে অতিকষ্টে কয়েক গ্রাস ভাত গিলে খেলেন।

দ্বিতীয় দিন। সারোয়াতলী গ্রামের হাট বসেছে। মিলিটারিরা হরিপদকে হাটে নিয়ে

গেলো। বন্দী অবস্থায় হরিপদকে দেখে জনতা থ।
একজন অফিসার হরিপদকে চিৎকার করে বলতে আদেশ করলেন, "ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘজীবী হোক। সূর্য সেন নিপাত যাক।"
হাটে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের সামনে হরিপদ সদর্পে চিৎকার করে বললেন, "মাস্টারদা দীর্ঘজীবী হোন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হোক।"
এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারিরা হরিপদকে মারধোর শুরু করে দিলো। তিনি জ্ঞান হারালেন।
তৃতীয় দিন। সৈনিকেরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলো। একটা দলে আছেন হরিপদ। তাঁর হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। এই সেনাবাহিনী গ্রাম পরিক্রমার সময় সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে মারধোর করছে। তাছাড়া হরিপদের সামনেই পঞ্চাশ-ষাটখানি বাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দিলো।
চার-পাঁচ দিন পর সারোয়াতলী গ্রাম থেকে হরিপদকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে গেলো। এতোদিন হরিপদের কোন চিকিৎসাই হয়নি। ক্ষতস্থান থেকে পুঁজ বের হচ্ছে। এবার তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো।
বিচারের জন্য হরিপদকে কোর্টে হাজির করা হলো। আদালতে উপস্থিত হয়েছেন— হরিপদের বাবা, বড় মামা এবং তাঁর কয়েকজন আত্মীয়। হরিপদকে দেখে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন, আসামীপক্ষের কোন উকিল আছেন কিনা।
ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের জবাবে হরিপদ বললেন, "আমাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে তা বিচারের আগেই স্থির হয়ে আছে। উকিলের যুক্তি-তর্কে কোন কাজ হবে না। আমাদের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। আমার আত্মীয়স্বজনও গরিব। আমার কেস্-এ আমিই ডিফেণ্ড করবো।"
হরিপদ যেন ফাঁসির দড়ি গলায় পরার জন্য তৈরি। আদালত থমথমে। এমন সময় ভগবানের আশীর্বাদের মতো একজন দেশপ্রেমিক অ্যাডভোকেট এগিয়ে এসে ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, "আমি এই কেস্ ডিফেণ্ড করবো। আমার মক্কেলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"
অ্যাডভোকেটের বক্তব্য শুনে হরিপদের বাবার বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেলো। তিনি ভগবানকে স্মরণ করলেন।
ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি পেয়ে অ্যাডভোকেট অন্নদাচরণ দত্ত হরিপদের কাছে এসে বললেন, "আমরা কয়েকজন উকিল মিলে তোমার মামলা পরিচালনা করবো। কোন পয়সা লাগবে না। তুমি রাজি না হলে আমাদের অপমান করা হবে।"
হরিপদের বয়স কম। তাই হাইকোর্টের বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। তারপর তাঁকে পাঠানো হলো আন্দামানে। ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান।
খাঁ বাহাদুর আসানুল্লাকে হত্যা করার পর, চট্টগ্রামে হিন্দুদের ওপর যে সীমাহীন অত্যাচার শুরু হয়েছে তা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জানতে পেরে কলকাতায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। তদন্ত কমিটির সেক্রেটারি ব্যারিস্টার নিশীথ সেন ও আরো পাঁচজন সদস্যকে

সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রমোহন চট্টগ্রামে গেলেন। তদন্ত কমিটি উপদ্রুত এলাকা ঘুরে ঘুরে জনগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন।

যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরে এলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভায়, চট্টগ্রামের হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাসমূহ তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরলেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব ঃ

কলিকাতার নাগরিকদের এই সভার মতে ৩০শে ও ৩১শে আগষ্ট এবং ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে যে শোচনীয় ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব নহে। উহা কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী য়ুরোপীয়ান, পুলিশ এবং অন্যান্য স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টার ফল। বঙ্গের কতকগুলি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পত্রিকা এবং য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কতকগুলি সদস্য যে প্রতিহিংসার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, ইহার উৎপত্তি উহা হইতেই।

এই ঘটনা সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা না করার জন্য, কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের নিন্দা করিতেছে। [দৈনিক বসুমতী]

'অত্যাচারী ডি. এস. পি. আসানুল্লা' প্রবন্ধে হরিপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমার বাবার কাছে একটি ছোট কবিতার মাধ্যমে তাঁর বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই সাথে ২০০ টাকা।"

চট্টগ্রামে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবিধান করার জন্য যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মনঃপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। এ সমস্যা সমাধান হওয়ার আগেই তাঁর কাছে আর একটা বেদনাদায়ক সংবাদ এলো।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সাল। হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের ওপর ইংরেজ সরকার গুলি চালালেন। ফলে সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। এবং বহু রাজবন্দী আহত হন।

সন্তোষকুমার ছিলেন মধ্য কলকাতার কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি। তারকেশ্বর ছিলেন বরিশালের একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী।

মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের কাছে হিজলী বন্দীনিবাস। খবর পেয়ে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত কলকাতা থেকে হিজলী গেলেন। বন্দীনিবাসের কম্যাণ্ডাণ্টের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করলেন। এবং বন্দীনিবাস পরিদর্শন করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেন না।

হিজলী থেকে ফিরে এসে যতীন্দ্রমোহন খড়্গপুর হাসপাতালে গেলেন। আহত রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন। গুলিচালনার বৃত্তান্ত তিনি আহতদের কাছ থেকে জানতে পারলেন। তারপর তিনি ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষের কাছে শবদেহ দুটির দাবি করলেন। দাবি মঞ্জুর হলো। সন্তোষকুমার ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ একটি স্পেশাল ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলো। বিরাট জনতা। একটি শবাধারে দু'জন শহিদ। মরদেহ ফুলে ফুলে সাজানো।

দেশবাসী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কেওড়াতলা শ্মশানে দু'জন শহিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলো।

বন্দীদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদে মনুমেণ্ট ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় সভাপতি ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বরেণ্য কবি জনসভায় বলেছিলেন ঃ

'প্রথমে ব'লে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র—আন্দোলনের বাহিরে। কর্তৃপক্ষের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব সম্পর্কে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এতবড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব ক'রে দিয়েছে।

'যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা ক'রে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধ'রে নিতেই হবে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অবমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের 'পরে, সেইসব শাসনকর্তা এবং তাঁহাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই, এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

'এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশী রাজা যত পরাক্রমশালী হোন না কেন, আত্মসম্মান হারানো তাঁর পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরায়ণতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিবৃত্ত করতে পারে কোন্ শক্তি! এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

'আমি আজ উত্তেজনা-বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাই না এবং সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এ কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যত উচ্চে ধ'রে আছে, তত ঊর্ধ্বে আমাদের ধিক্কার-বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছতে পারবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা নিজেরা চিত্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে ক'রে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করার ধৈর্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্বাসিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি। উপসংহারে

শোকসন্তপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একদা সম্পূর্ণ অবসান হ'লেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্যশিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।'
হিজলীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশ উত্তাল। বিক্ষোভ চরমে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন – সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ও বীরেন শাসমল।
হিজলী বন্দীনিবাসে গুলি চালনার ব্যাপারে তদন্ত কমিটি বসল। রায় প্রকাশিত হলো।

হিজলীতে গুলী চালাইবার কোনই সঙ্গত কারণ ছিল না
সরকরী তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত

'হিজলীর গুলী চালনা ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে বিচারপতি মিঃ এস. সি. মল্লিক (চেয়ারম্যান) ও মিঃ জে. জি. ড্রামণ্ডকে লইয়া যে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল, উক্ত কমিটি তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন ঃ
'...আমাদের মতে সিপাহীরা যে বন্দী-নিবাসের উপর বেপরোয়া গুলী চালাইয়া (২৯ বার গুলী ছোঁড়া হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়) দুইজন রাজবন্দীকে নিহত ও অপর কয়েকজনকে জখম করিয়াছিল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বন্দী-নিবাসের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন সিপাহী যে অপরাপর কয়েকজন রাজবন্দীকে নানাভাবে জখম করিয়াছিল তাহারও কোন সঙ্গত কারণ নাই।' [আনন্দবাজার ঃ ৩০-১০-৩১]

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবার পর চট্টগ্রামে পুলিশের তৎপরতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ঃ

হিন্দু যুবকগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি

চট্টগ্রাম, ৮ই জুন। অদ্য অপরাহ্নে ১৫ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকদিগের উপর সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছে। উপরোক্ত বয়সের যুবকগণ এবং ছাত্রগণ সর্বদা লাল দীঘি ও নদীর তীরে অপরাহ্নে বেড়াতে যান। তাহারা দ্রুতপদে রাত্রি ৭ ঘটিকার মধ্যে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে উপরোক্ত স্থান সমূহ ও রাস্তাঘাট হইতে হিন্দু ভদ্রলোকগণ চলিয়া যাওয়ায় শহর মরুভূমির ন্যায় দেখা যাইতেছে।
[বঙ্গবাণী ঃ ৯-৬-১৯৩১]

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় আটজন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হলো। অভিযুক্ত বিপ্লবীরা হলেন—(১) অর্ধেন্দু গুহ, (২) অনিল রক্ষিত, (৩) রবি সেন, (৪) নিবারণ ঘোষ, (৫) সুশীল সেন, (৬) প্রফুল্ল মল্লিক, (৭) হৃদয় দাস, (৮) প্রভাত দত্ত।
বেকসুর খালাস পান—নিশি দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসু। ট্রাইবিউনালের সভাপতি হলেন মিঃ এ. এন. সেন।।
মামলা শুরু হবার আগে সরকার পক্ষ একটি সন্ধির প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি অনন্ত সিংহের

কাছে নিয়ে আসেন ডি. এস. পি. রায়বাহাদুর মন্মথ সেন। প্রস্তাবটির মর্মার্থ হলো—বাংলা দেশের বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ করার বিপ্লবীরা দায়িত্ব নিলে, চট্টগ্রাম জেলে বিচারাধীন বিপ্লবীদের ফাঁসি হবে না।

অনন্ত সিংহ প্রথমে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। পরে কৌশল গত উপায় হিসাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। সরকারি মুখপাত্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো। উভয়পক্ষ একমত হলেন—কয়েকটি সর্তে :

প্রথম সর্ত হলো—প্রাণদণ্ড রহিত হলে তাঁরা বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ করবেন। দ্বিতীয়—ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মামুলী সাজা দেবেন সরকার। তৃতীয়—কার কি সাজা হবে অভিযুক্ত বিপ্লবীরা তা আলোচনা করে স্থির করবেন। চতুর্থ—অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল কোর্ট প্রসিডিংস বিলম্বিত করা বন্ধ করবেন, যেদিন ডিনামাইট কেস মিটবে।

সন্ধির সর্তগুলি উভয় পক্ষের অনুমোদন লাভ করলো। খসড়াটি মাস্টারদার কাছে পাঠানো হলো। মাস্টারদা ভাবলেন, শিলা যেন জলে ভাসছে। সন্দেহ থাকলেও তিনি অনুমোদন করলেন।

বিপ্লবীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের সন্ধি করার কারণ হলো—জেলের বাইরে মিলিটারি, জেলের ভিতরে ইংরেজ জেলার, ইংরেজ ওয়ার্ডার, তাঁদের সঙ্গে আছে, কুড়ি-বাইশ বছরের বিশ্বাসী সেপাই। জেল যেন সুরক্ষিত দুর্গ। তবু লক্ষীন্দরের বাসরঘরে সাপ ঢোকার মতো যখন জেলের মধ্যে এতো আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকে পড়েছে তা হলে উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসারদের নিরাপত্তা কোথায় ? নিশ্চয়ই সর্ষের মধ্যেই ভূত।

আদালতে বন্দী বিপ্লবীরা যেভাবে কোর্ট প্রসিডিংস দীর্ঘায়ত করার কৌশল অবলম্বন করছেন তার ফলে তাঁরা আরো অনেক কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। তাই ইংরেজ অফিসারেরা বাঁচার পথ বের করেছেন—বন্দীর সঙ্গে সন্ধি।

শুরু হলো ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা। ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট আসামীদের প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের কিছু বলবার আছে ? তোমরা দোষী না নির্দোষ ?"

চারজন ছাড়া, সকলেই পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে দোষ স্বীকার করলেন। ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট রায় লিখতে শুরু করলেন। বিপ্লবীরা সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে যার যা দণ্ডকাল স্থির করেছিলেন, প্রেসিডেণ্ট তাঁর রায়ে চুক্তির কোন হেরফের করলেন না। ভারতবর্ষ অধিকার করার সময় ইংরাজেরা অনেক বেইমানি করেছিলেন। তা হলেও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এই রকম :

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা

চট্টগ্রাম, ১লা অক্টোবর : নূতন স্পেশাল ট্রাইবিউনালের সমক্ষে গত সোমবার ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। সোমবার আরম্ভ করিয়া মঙ্গলবারের জলযোগের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী উকিল রায়বাহাদুর রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা হইতে আগত) তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করতঃ মামলার বিবরণ কমিশনারগণের সমক্ষে উপস্থিত করেন।

এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী শেষ না হইতেই কমিশনারগণ রায় প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবার সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইবার পর প্রথম সরকারী সাক্ষী এস. ডি. ও মিঃ রায় সাক্ষ্য দেন ও বলেন, তিনি নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেন আসামীদ্বয়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তৎপর আসামীদের বিরুদ্ধে কি রকম চার্জ হইতে পারে সরকারী উকিল তাহা বুঝাইয়া দিলে প্রেসিডেণ্ট সকল আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন। অতঃপর ৭ জন আসামী শ্রী অর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, সুশীল সেন প্রভাত দত্ত ও অনিল রক্ষিত উক্ত ধারায় আপনাদিগকে দোষী বলিয়া এবং অপর ৪ জন হৃদয় দাস, চন্দ্রকুমার বসু, নিশি দে ও আশুতোষ দে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করে।
অতঃপর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ সেন (অবশ্য অন্য দুইজন কমিশনারের সম্মতিক্রমে) নিশি দে, আশুতোষ দে ও চন্দ্রকুমার বসুকে বেকসুর খালাস দেন ও অপর ৮ জনের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ, নিবারণ ঘোষ ও রবীন্দ্র সেনকে ৩ বৎসর, সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মল্লিককে দুই বৎসর এবং অনিল রক্ষিত ও প্রভাত দত্তকে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রেসিডেণ্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে কারাগারে বি শ্রেণীভুক্ত রাজবন্দীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে। এক্ষণে শুধু একজন আসামী হৃদয় দাসের বিরুদ্ধে এই স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মামলা চলিতেছে। [বঙ্গবাণী : ৬-১০-১৯৩১]

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলার সওয়াল জবাব শেষ। এবার রায় দানের পালা।

রায় প্রকাশ আসন্ন

কর্তৃপক্ষের সতর্কতা অবলম্বন

চট্টগ্রাম, ১২ই ফেব্রুয়ারী : লাল পতাকা দ্বারা চিহ্নিত জেলের নিকটবর্তী সীমানায় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জরুরী ক্ষমতা জারি করিয়াছেন। পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেটেলমেণ্ট এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় প্রকাশ সম্পর্কেই এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায় দেওয়া হইবে।

[বঙ্গবাণী : ১৪-২-১৯৩২]

বিপ্লবী বন্দীদের ওয়ার্ডে যেসব সেপাই পাহারা দেয় তাদের মধ্যে একজন সহানুভূতিশীল সেপাই দেখতে পেয়েছে, জেল-সুপার অসময়ে জেলে এসে জেলারের সাথে দরজা বন্ধ করে গোপন পরামর্শ করেছেন। সেপাইটির ধারণা বন্দী বিপ্লবীদের ফাঁসি হতে পারে। সেপাইটি গোপনে খবরটা বিপ্লবীদের জানালো।
ক্লাইভ বংশধরদের সন্ধিসর্ত ভঙ্গ করা অসম্ভব নয়। আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে বিপ্লবীদের মন। একদিন চার নম্বর হাজত ঘরে সকাল আটটায় কোর্ট বসলো। সশস্ত্র পুলিশ বন্দী বিপ্লবীদের ঘিরে ফেললো।
বিচারকেরা এলেন। ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ জে. ইউনী রায়ের মূল অংশটুকু পড়ে গেলেন।
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের প্রথম মামলার ঐতিহাসিক রায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজ সরকার এই মামলার নাম দিয়েছিলেন 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার রায়

অনন্ত সিংহ প্রভৃতি বারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুইজনের সশ্রম কারাদণ্ড : পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত।

চট্টগ্রাম, ১লা মার্চ : সুদীর্ঘ ১৯ মাসকাল বিচার চলিবার পর আজ চট্টগ্রামের লোমহর্ষক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যবনিকাপাত হইল। বিচারকগণ নিম্নলিখিত ১২ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়েছেন :

(১) অনন্ত সিংহ (২) গণেশ ঘোষ (৩) লোকনাথ বল (৪) আনন্দ গুপ্ত (৫) ফণী নন্দী (৬) সুবোধ চৌধুরী (৭) সহায়রাম দাশ (৮) ফকির সেন (৯) লালমোহন সেন (১০) সুখেন্দু দস্তিদার (১১) সুবোধ রায় এবং (১২) রণধীর দাশগুপ্ত।

আসামী অনিল দাশকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং নন্দলাল সিংহকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ফ্রী প্রেসের বিবরণে প্রকাশ, আসামী অনিল দাশকে তিন বৎসর বোরষ্টাল স্কুলে আটক রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ১৬ জন আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছেন।

(১) নিতাই ঘোষ (২) শান্তি নাগ (৩) অশ্বিনী চৌধুরী (৪) ননী দেব (৫) মলিন ঘোষ (৬) শ্রীপতি চৌধুরী (৭) মধুসূদন গুহ (৮) সুবোধ বিশ্বাস (৯) সুবোধ মিত্র (১০) সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী (১১) সুকুমার ভৌমিক (১২) সুবোধ বল (১৩) হেরম্বলাল বল (১৪) বিজয় সেন (১৫) আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং (১৬) বীরেন্দ্র দস্তিদার। কিন্তু মুক্তি পাইবার পর ইহাদিগকে পুনরায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দণ্ডিত আসামীগণকে দ্বিপ্রহরের সময় চট্টগ্রাম হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিচারকগণ সমস্ত আসামীকেই জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রায় ৪ মাস কাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে তদন্ত চলে। ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিম খাঁই প্রধানতঃ এই তদন্ত কার্য পরিচালনা করেন। তিনি পরিশেষে ৫৬ জন আসামীর বিরুদ্ধে (মৃত ১৯ জন বাদে) চার্জ সিট দাখিল করেন। তন্মধ্যে ৩২ জন ধৃত হইয়া বিচারার্থে প্রেরিত হয় এবং ২৪ জন ফেরার হয়।

১৯৩০ সালের ২৪ শে জুলাই চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট এই মামলার বিচার আরম্ভ হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসে স্যার চার্ল'স টেগার্ট কলিকাতার একদল পুলিশ লইয়া চন্দননগরে ৪ জন ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তন্মধ্যে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আনন্দ গুপ্তকে বিচারার্থে স্পেশাল ট্রাইবিউনালের নিকট পাঠান হয়। (অপর আসামী জীবন ঘোষাল চন্দননগরেই মারা যান) আসামীদের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) আবার নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারকালে অন্যান্য ফেরারী আসামীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে ইন্সপেক্টার তারিণী মুখার্জীর হত্যা সম্পর্কে চাঁদপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। এই হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণের ফাঁসি এবং কালীপদর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আরও একটি শাখা গজায়। চট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খানবাহাদুর আসানুল্লার হত্যাকাণ্ডের আসামী হরিপদ ভট্টাচার্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

হয়। অন্যান্য ফেরারীদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তীকে এবং সম্প্রতি আরও একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের পরে বিচার হইবে। ইহাদের ছাড়া আরও ১৭ জন আসামী ফেরার আছে। ইহাদের ধরিবার জন্য ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

মোট ৩৫ জন আসামীকে কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুইজনের (অর্ধেন্দু গুহ ও অনিল রক্ষিত) বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। তাহাদিগকে পরে এখানে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত করা হয়।

আরও তিনজন আসামী—রঞ্জনলাল সেন, গোলাপলাল সিং (উভয়েই উকিল) এবং যোগেন্দ্র—ওরফে মনা গুপ্তকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই মামলায় ৩১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়। ইহাদের সাক্ষ্য প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠার টাইপকরা কাগজে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তদন্তকারী ইন্সপেক্টার আব্দুল আজিম খাঁর জবানবন্দীতেই ৭০০ পৃষ্ঠা গিয়াছে। উক্ত ইন্সপেক্টার প্রায় ৪ মাসকাল জবানবন্দী দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া সরকার পক্ষ প্রায় ১২০০ একজিবিট দাখিল করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, মাস্কেট, বেআইনীভাবে আমদানী করা অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-গুলি-বারুদ, একটি লুইস বন্দুক, ৪ খানা মোটর গাড়ি, খাকি পোশাক জলপূর্ণ বোতল ও অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিস বিপ্লবী ইস্তাহার, বিপ্লবী সংগ্রহ তালিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জিনিস কতক বিভিন্ন স্থানে এবং কতক অন্যতম প্রধান আসামী গণেশ ঘোষের গৃহে পাওয়া যায়।

কমিশনারগণ বলিয়াছেন : ফকির সেন, সুবোধ রায়, সুখেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাশগুপ্ত সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের অল্প বয়স সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত স্কুলের ছাত্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু আইন অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা তাঁদের কর্তব্য। [বঙ্গবাণী : ২-৩-১৯৩২]

আসানুল্লা হত্যার পর মাস্টারদা ঢাকার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। জালালাবাদ যুদ্ধের বীর সৈনিক বিনোধ চৌধুরী ঢাকা শহরে আত্মগোপন করে আছেন। মাস্টারদা সরোজ গুহকে ঢাকায় পাঠালেন। সরোজ গুহ বিনোদ চৌধুরীর সঙ্গে ঢাকায় গিয়ে মিলিত হলেন। দুইজন বিপ্লবী অনুসন্ধান চালিয়ে ঢাকার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাটি করলেন। সাত—আটজন সশস্ত্র বিপ্লবীর অভাবে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে গেলো। এরপর বিপ্লবীরা ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্ণোকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

২৮ অক্টোবর ১৯৩১ সাল।

সরোজ গুহ রমেন ভৌমিককে বললেন, "আজ শনিবার। সরকারি অফিস ও আদালত হাফ্ ছুটি। আমি মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসছি। তুমি কোর্টের দিক থেকে একবার ঘুরে এসো।"

ঢাকার নবাবপুর রোডের বিলাতী মদের দোকানে মিঃ ডুর্ণো প্রায় দিনই মদ কিনতে

আসেন। মদের দোকানের বিপরীত দিকে মিষ্টির দোকান। বিপ্লবীরা মিষ্টির দোকানে বসে মিঃ ডুর্ণোকে অনুসরণ করছেন। দেখতে দেখতে একখানা মোটর গাড়ি মদের দোকানের সামনে এসে থামলো। ততক্ষণে রমেন ভৌমিক মিঃ ডুর্ণোর মোটর গাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। রমেন ইশারায় সরোজকে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন।

সরোজ গুহের পরনে খদ্দরের ধুতি আর সার্ট। তিনি শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালেন। কোমর থেকে রিভলবার বের করলেন। প্রথমে মোটর গাড়ির ড্রাইভারের হাতে গুলি চালালেন তিনি। গুলির আঘাতে ড্রাইভার গাড়ির মধ্যেই এলিয়ে পড়লো। তারপর মিঃ ডুর্ণোর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন। মিঃ ডুর্ণো ড্রাইভারের সীটের আড়ালে ঝুঁকে পড়লেন। গাড়ির ভেতর ধোঁয়ায় অন্ধকার। তিনি পরপর ছ'টি গুলি করলেন। ম্যাগাজিন শেষ। মিঃ ডুর্ণোর মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত হতে পারলেন না। দ্বিতীয় রিভলবারটি বের করলেন। গাড়ির ভেতর মোট বারোটি গুলি চালালেন।

গুলির আওয়াজ শুনে জনতা যে যেদিকে পারছে পালাতে লাগলো। এই সুযোগে সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক পলায়মান জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা নৌকোপথে ঢাকা থেকে ত্রিপুরা গিয়ে পৌঁছলেন। এবং কুমিল্লা শহরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

সরোজ গুহের আক্রমণে মিঃ ডুর্ণো গুরুতর আহত হন। কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান।

অখিল নন্দী কুমিল্লা যুগান্তর পার্টির নায়ক। তাঁর দল সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েদের এ্যাকশনে পাঠানোর প্রস্তুতি হিসেবে প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম, শান্তি ও সুনীতিকে রিভলবার ছোড়া শেখানোর প্রয়োজন। একদিন বিকেলে তাঁদের ঘোড়ার গাড়ি করে কোটবাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে গেলেন প্রফুল্লনলিনীর ভাই সুধীর। অখিল নন্দী গেলেন সাইকেলে। বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও সতীশ রায় আগে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন।

কুমিল্লা শহরের কাছে কোটবাড়িজায়গাটা ছোট ছোট পাহাড় ও টিলায় ঘেরা। চারদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি। নির্জন।

সতীশ রায় বাঁকুড়া মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্র। দানবীর মহেশ ভট্টাচার্যের আত্মীয়। এখনো পুলিশের নজরে আসেননি। তাঁর সঙ্গে শান্তি ও সুনীতিকে পরিচয় করানো হলো। কেননা এ্যাকশনের দিন সতীশ রায় ঘোড়ার গাড়ি করে শান্তি ও সুনীতিকে ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্সের কুঠিরে নিয়ে যাবেন।

শান্তি ও সুনীতিকে রিভলবার ছোড়ার ট্রেনিং শুরু হলো। ট্রেনিং দিচ্ছেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও অখিল নন্দী। সুনীতিকে দেওয়া হলো '৩২ বোরের ছোট রিভলবার। শান্তিকে '৪৫ বোর রিভলবার। দু'জনের হাতে দুটি রিভলবার পেয়ে তাঁরা আনন্দে নেচে উঠলেন। শান্তি অতি সহজে রিভলবার ছুড়লেন।

সুনীতি ছোট মেয়ে। ক্লাস এইটের ছাত্রী। জন্ম ১৯১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। ছোট আঙ্গুল। প্রথম অবস্থায় তিনি রিভলবারের ট্রিগার টানতে পারলেন না। তাঁর দৈহিক শক্তি কম হলেও মনোবলের মোটেই অভাব নেই। সুনীতি শেষ পর্যন্ত তর্জনীর পরিবর্তে মধ্যমা দিয়েই রিভলবারের গুলি ছুঁড়লেন।

পড়ন্ত বেলা। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মির আলোকছটায় বনানীকে সুশোভিত করে তুলেছে। শান্তি সুগায়িকা। পাহাড়ের চূড়ায় বসে শান্তি মনের আনন্দে গান গাইতে শুরু করলেন, "একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে"।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল।

বেলা দশটা। কর্মচঞ্চল কুমিল্লা শহর। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ইস্কুলে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন। সতীশ রায় ঘোড়ার গাড়িতে প্রথমে সুনীতিকে তুলে নিলেন। তারপর শান্তিকে তুলে নিলেন শান্তির বাড়ির কাছ থেকে।

ডিসেম্বর মাস। কনকনে ঠাণ্ডা। শান্তি ও সুনীতির গায়ে সিল্কের চাদর। পরনে শাড়ি ও ব্লাউজ। দুটি রিভলবার দু'জনের ব্লাউজের ভিতর লুকানো। তাঁদের সাজগোজ বেশ পরিপাটি।

শান্তির বয়স বছর পনর। স্বাস্থ্যবতী। স্বর্ণচাঁপার মতো গায়ের রঙ। খুব গম্ভীর প্রকৃতির। ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

টগবগ করে ঘোড়া ছুটছে। শান্তি ও সুনীতি ঘোড়ার গাড়িতে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। আর হাসছেন। হাসি দেখে মনে হয়, দুটি ফুটন্ত গোলাপ যেন হাওয়ায় দুলছে। তাঁদের ভাবখানা এমনি যেন পরীক্ষার পর দু'বোন মামার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন। জীবন-পেয়ালা থেকে তাঁদের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির কাছে শান্তি ও সুনীতিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে সতীশ রায় সরে পড়লেন। শান্তি ও সুনীতি সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের দুয়ারে গিয়ে হাজির। তাঁরা আর্দালীকে ইণ্টারভিউ স্লিপ দিলেন।

আর্দালী স্লিপ নিয়ে ভেতরে গেলো। তারপর বাঙ্গালী এস. ডি. ও. সহ মিঃ ষ্টিভেন্স শান্তি ও সুনীতির সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

শান্তি ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর দরখাস্ত দিলেন। দরখাস্তের বিষয়বস্তু হলো—ইলা সেন (শান্তি ঘোষ) একজন ঢাকার অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পেক্টারের মেয়ে। তিনি সাঁতারে পটু। তের ঘণ্টা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। দক্ষতার অনেক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট আছে। বাংলার মেয়েদের সাঁতারে উৎসাহ দেয়ার জন্য তিনি বাংলার মফস্বল শহরগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিশোরগঞ্জে প্রদর্শনী করেছেন। এবং ময়মনসিংহে মেয়েদের সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কুমিল্লা শহরে সুইমিং ক্লাব গড়তে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য চান।

দরখাস্ত পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট কুমিল্লা ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষায়িত্রী মিস্ বিশ্বাসের কাছে যেতে বললেন। শান্তি ও সুনীতি ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁরা মিস্ বিশ্বাসকে না চেনার ভান করলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্স সুনীতির আবেদনপত্র ফয়জেন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাছে ফর্‌ওয়ার্ড করার জন্য ভেতরে গেলেন। শান্তি ও সুনীতি ভাবলেন, শিকার বুঝি ফসকে গেলো। দরখাস্তটা আর্দালীর হাত দিয়ে যদি পাঠিয়ে দেন ? তা হলে সব পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবে।

মিঃ ষ্টিভেন্স আবেদনপত্রের উপর তাঁর মন্তব্য লিখলেন, "হেড্ মিস্ট্রেস্ কর্ ফেভার্ অভ্ সাজেস্‌শন্।"

শান্তি ও সুনীতির আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিরসন করে ফের এস. ডি. ও. এবং মিঃ ষ্টিভেন্স এসে তাঁদের সামনে হাজির হলেন।

তার আগেই শান্তি ও সুনীতি তাঁদের ব্লাউজের ভেতর থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিলেন। এবং রিভলবার চাদরের তলায় ঢেকে রাখলেন। আর সুযোগের অপচয় করা উচিত নয়। একই সঙ্গে দু'জনের রিভলবার গর্জে উঠলো। দু'জনেরই লক্ষ্য মিঃ ষ্টিভেন্স।

রিভলবারের গুলি লাগার পর মিঃ ষ্টিভেন্স ঘরের ভেতর ছুটলেন। বাঙ্গালী এস. ডি. ও. সাহেবও দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

এস. ডি. ও. সাহেব তারস্বরে চিৎকার করে বললেন, "পাকড়ো, পাকড়ো।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন এসে শান্তি ও সুনীতির হাত থেকে রিভলবার দুটি ছিনিয়ে নিলো। তারপর দু'জনকে গরুর দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। শুরু হলো— পাইকারিহারে লাথি ঘুষি কিল চড়। দুটি বালিকাকে বেদম মার দেওয়ার পরও ঠেঙ্গাড়েদের আশ মেটেনি। দেহতল্লাশির সময় তাঁদের পরনের শাড়ি খুলে নেওয়া হলো।

সুনীতি চৌধুরী 'আমাদের ত্রিপুরা' পত্রিকায় 'স্মৃতিচারণ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে চলেছি বাড়ির সকলের চলাফেরা কথাবার্তা, ঘটনাটা কি ঘটল বুঝতে হবে তো। যখন দরজার ভারী পর্দাটা একটু উড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাশের ঘরে কেউ যেন শুয়ে আছে চাদর গায়ে। লোকজনও ঘরে আসছে যাচ্ছে, বড় ধীর পদক্ষেপে, চারদিকে যেন স্তব্ধ ভাব।

ভাবছি তবে কি সফলকাম, না বিফল? আহত হলে ডাক্তার আসা, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির একটা ব্যস্ততা থাকতো।...জানি, এই কার্যের সফলতার সঙ্গে জড়িত শুধু আমাদের ব্যক্তিগত সফলতা নয়, সমগ্র বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাফল্য, সমগ্র নারী জাতির মর্যাদা। আমরা যে 'চ্যালেঞ্জ' নিয়ে এসেছি- মেয়েরাও পারে সফলতার সঙ্গে দৃঢ়হস্তে অস্ত্র ধারণ করতে- কম্পিত না তাদের হৃদয়, তাদের হস্ত। পুরুষেরই শুধু একচেটিয়া অধিকার নয় অস্ত্র ধারণে।...পাহারারত পুলিশকেই জিজ্ঞাসা করিনা কেন?...জিজ্ঞাসা করতেই মুখ খিঁচিয়ে উঠল—একদম মার ডালা, ফিন পুছতা হ্যায়।...শোবার আগে একে অন্যকে (আমি ও শান্তি) একবার দেখলাম কোথায় কার কত লেগেছে। সারা গায়ে ব্যথা— যন্ত্রণা, সব ফুলে ফুলে কাল কাল হয়ে উঠেছে তবুও ঘুম এসে গেল।'

কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যার পর সুনীতির পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার অমানুষিক চক্রান্ত শুরু করে দিলো।

সুনীতির বাবা উমাচরণ চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। ইংরেজ সরকার তাঁর পেনসন বন্ধ করে দিলেন।

উমাচরণ চৌধুরীর চার ছেলে এবং দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। চার ছেলের নাম হলো—সুকুমার, শিশির, সুখেন্দু ও সুধীর।

সুনীতির মেজদা শিশির চৌধুরী মিঃ ষ্টিভেন্স হত্যার দিন গ্রেপ্তার হন। প্রমাণের অভাবে

মুক্তি পান। কিন্তু তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। তিনি ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে আরো এক বছর গৃহবন্দী রাখা হয়।

সুনীতির পরিবারের ওপর ইংরেজ সরকারের চক্রান্তের এখানেই শেষ নয়। সুনীতির বড়দা সুকুমার চৌধুরীকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে বন্দী করা হয়। তিনি দেউলী বন্দীনিবাসে ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বন্দী থাকেন।

সুনীতির বাবার পেনসন বন্ধ। তার ওপর দু' ছেলে জেলে বন্দী। আয়ের সমস্ত পথ বন্ধ। ইংরেজ সরকার সুনীতির পরিবারকে হাতেও মারছেন, ভাতেও মারছেন। নিদারুণ দুঃখ কষ্টের দিনে সুনীতির মা সুরসুন্দরী ভাবলেন, ছেলে দুটিকে দুমুঠো ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা দায়। তাই উমাচরণ চৌধুরী ও সুরসুন্দরী পরামর্শ করে শহর ছেড়ে তাঁদের ত্রিপুরা জেলার নবীননগর থানার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন। গ্রামে তাঁদের জীবননির্বাহের খরচ কমলো। কিন্তু আয়ের অভাবে তাঁরা দরিদ্রতার কালগ্রাস থেকে রেহাই পেলেন না। আর্থিক চাপে পড়ে ছেলেদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হলো। আত্মীয়েরা সাহায্যের হাত বাড়ালে পুলিশ তাঁদের অত্যাচার করতে শুরু করলো।

সুনীতির তৃতীয় ভাই সুখেন্দু চৌধুরী। তিনি মিঃ ষ্টিভেন্স হত্যার পর পুলিশের অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হন। তাঁর লেখাপড়া বন্ধ। নিয়মিত খাওয়া জুটছে না। সুনীতির পরিবারের দুঃখ দুর্দশা দেখে কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা বসন্ত মজুমদার সুখেন্দুকে কোন একটি ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলেন।

সুখেন্দুর বয়স মাত্র বারো-তেরো বছর। এমনি ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কংগ্রেস নেতা বসন্ত মজুমদার পুলিশের উৎপীড়ন এড়াতে তাঁর বাড়ি থেকে সুখেন্দুকে চলে যেতে বাধ্য করেন।

সুখেন্দুর জীবনে সুখ সহ্য হলো না। রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফুটপাতে এসে হাজির হলেন। তিনি বস্তিতে ঘর ভাড়া নিলেন। তারপর কলকাতার ফুটপাতে বসে কাটা-কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করলেন।

ফুটপাতে সময়-সময় হল্লার উৎপাত। কেননা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করা বেআইনী। ফুটপাতে ব্যবসায়ীরা রাস্তা জ্যাম করে রাখলে পথচারীদের পথ চলতে অসুবিধে হয়। তাই হল্লা গাড়িতে পুলিশ এসে ফেরিওয়ালা উৎখাত অভিযান চালায়। পুলিশ ফেরিওয়ালাদের ধরে নিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে রাখে। পরদিন হাজত থেকে ফেরিওয়ালাদের পুলিশ কোর্টে নিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ফেরিওয়ালাদের জরিমানা দিতে হয়।

সুখেন্দুর দুঃখের রাত আর ভোর হতে চায় না। জীবনের বন্ধুর পথ চলতে চলতে একদিন কলকাতা করপোরেশনের এক কর্মীর সঙ্গে সুখেন্দুর পরিচয় হলো। ভদ্রলোক সুখেন্দুকে সুনীতি চৌধুরীর ভাই বলে জানতে পেরে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান। ভদ্রলোক সুখেন্দুকে তাঁর ছোট মেয়ের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। সুখেন্দুর থাকার ব্যবস্থা হলো। তিনি সুখেন্দুকে করপোরেশনের কাজে নিযুক্ত করলেন। কাজটি হলো—কলকাতা শহরের গ্যাসবাতি জ্বালানো আর নিবানো। পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে সুখেন্দুর মৃত্যু হয়।

শান্তি ও সুনীতির মামলার রায় প্রকাশিত হলো। সংবাদপত্রের ভাষায়ঃ

শান্তি ও সুনীতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

'গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স তাঁহার নিজ বাংলোয় পিস্তলের গুলিতে নিহত হন। পুলিশ এই সম্পর্কে শান্তিসুধা ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নাম্নী দুইটি বালিকাকে গ্রেপ্তার করে। উহারা উভয়েই স্থানীয় ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী।

উহাদের বিচারের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সন, বিচারপতি মিঃ পি মল্লিক এবং বিচারপতি মিঃ এস. কে. ঘোষকে লইয়া একটি বিশেষ আদালত গঠিত হয়। গতকল্য বুধবার বিশেষ আদালত এই মামলার রায় প্রদান করেন। বিচারে শান্তি ও সুনীতি উভয়েই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা হন।

বিচারকগণ আসামীদ্বয়কে স্বেচ্ছায় ও মিলিতভাবে মিঃ স্টিভেন্সকে হত্যা করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।' [আনন্দবাজার : ২৮-১-৩২]

লেখকের সঙ্গে বীরাঙ্গনা সুনীতির সাক্ষাৎকার ও তাঁর চিঠির ভিত্তিতে এই তথ্য পরিবেশিত।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলার রায় প্রকাশের প্রায় এক মাস আগে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রভাবে বাংলার নারী সমাজ জেগে উঠলো।

৬ ফেব্রুয়ারি। ১৯৩২ সাল। কলকাতা সেনেট হলে কন্‌ভোকেশনের সময় বাংলার মেয়ে বীণা দাস (ভৌমিক) গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন-কে রিভলবার চালিয়ে আক্রমণ করেন। গভর্নর বেঁচে যান। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বীণা দাস সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলেন।

কলকাতা সেনেট হলে সমাবর্তনের সময় এ বছর খুব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। তাই গভর্নর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করলেন না। ইউনিভার্সিটির কর্মীরা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সীটে এসে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন।

বীণা দাস এখন নিরুপায়। তিনি ভাবলেন, অ্যাক্‌শন নিতেই হবে। তিনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে গভর্নরের আসন অনেক দূরে। এগিয়ে গেলেন তিনি। কিছুদূর থেকে গভর্নরকে গুলি করলেন। গুলি গভর্নরের কানের পাশ দিয়ে চলে গেলো। কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ পলকে বীণার হাত ও গলা সজোরে টিপে ধরলো। এ মতো অবস্থায়ও তিনি পরপর আরো কয়টি গুলি ছুঁড়লেন।

বীণা দাসের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কারণ হলো—তিনি রিভলবার চালনার ট্রেনিং নেননি। কমলা দাশগুপ্ত বীণাকে রিভলবার সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। কিভাবে রিভলবার চালাতে হয় তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ খুব সতর্ক। বীণা কলকাতার এক হোস্টেলে থেকে বি. টি. পড়ছেন। এ পরিস্থিতিতে রিভলবার চালনার অনুশীলন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাসের মেয়ে বীণা দাস। মায়ের নাম সরলা।

বেণীমাধব দাসের জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রাম।

বেণীমাধব দাসের তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে।

২৪ আগস্ট ১৯১১ সালে কৃষ্ণনগরে বীণার জন্ম। ডাকনাম মনু।

বীণার দিদি কল্যাণী কলকাতা ছাত্রীসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি দর্শনে এম. এ.। জেল খেটেছেন।

বীণা তাঁর বাবার কাছে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা পান। বেণীমাধব দাস অহিংসার পূজারী। কিন্তু অগ্নিকন্যা বীণা রিভলবারে বীণার ঝঙ্কার তোলেন।

কমলা দাশগুপ্ত বীণার দিদি কল্যাণীর বান্ধবী। এম. এ. পড়েন। এ ঘটনার পর তিনিও বন্দী হলেন। বীণা দাস ও কমলা দাশগুপ্তের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয় হয়েছে।

বন্দী হবার পর বীণাকে রোজ গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যেতে লাগলো। গোয়েন্দা অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো বেণীমাধবকেও।

একদিন এক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার বেণীমাধব দাসকে বললেন, "আপনার মেয়েকে বলুন, রিভলবার কোথা থেকে পেয়েছে জানাতে। তা হলে আপনার মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে।"

বীণা পুলিশ অফিসারকে পাল্টা জবাব দিলেন, "আমার বাবা তাঁর মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক হতে শেখাননি।"

বিচারে বীণা দাসের ন' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রীতির হৃদয়ে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ প্রীতির জীবনে যেন পরশপাথর। যার স্পর্শে প্রীতির জীবন ত্যাগের মন্ত্রে সোনায় পরিণত হয়েছে। বিপ্লবে প্রীতি দেহ-মন সঁপে দিলেন।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রীতিলতা কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর বাবার চাকরি নেই।

প্রীতির বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। অল্প বেতনের চাকরি। তাও চলে গেলো। শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। প্রাইভেট টিউশানী করেন। বাড়ি পটিয়া থানার ধলঘাট। গ্রামে জমিজেরাত আছে। চট্টগ্রাম শহরে ছোটখাটো তিনখানা বাড়ি। কিছু টাকা বাড়িভাড়া পান।

জগবন্ধু ওয়াদ্দাদারের দু' ছেলে এবং চার মেয়ে। মধুসূদন ও সন্তোষ দু' ছেলে। মেয়েদের নাম হলো—প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা ও আশালতা।

বড় ছেলে মধুসূদন পঁচিশ বছর বয়সে নিরুদ্দেশ। ছোট মেয়ে আশালতা অল্প বয়সে মারা যান।

প্রীতির বাবার চাকরি চলে যাওয়ার ফলে প্রীতির মা প্রতিভাময়ী বাস্তবের কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হলেন। বড় সংসার। তেল আনতে নুন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ।

প্রীতি দেখলেন, সংসারে অভাব। তাঁকে আয়ের পথ খুঁজতে হবে। তিনি নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ে (বর্তমানে অপর্ণাচরণ উচ্চ-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়) প্রধানা শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হলেন। প্রীতির ওপর তাঁর বাবা ও মায়ের প্রত্যাশা অনেক।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতমাতার ডাক প্রীতি শুনতে পেয়েছেন। তিনি বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার কিছুদিন পর মাস্টারদার কাছ থেকে

প্রীতির ডাক এলো। সেই ডাকে তিনি সাড়া দিলেন।
তখন বিকেল। প্রীতিলতা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে রওনা দিলেন। প্রীতি তাঁর মাকে বললেন, "মা, আমি সীতাকুণ্ড যাবো।"
প্রীতি ধলঘাট গ্রামে সাবিত্রী দেবীর বাড়ি পৌঁছলেন। সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে প্রীতির দেখা হলো।
১৩ জুন। ১৯৩২ সাল। প্রীতিলতা সাবিত্রী দেবীর বাড়ি এসেছেন আজ তিন দিন।
রাতে মাস্টারদার সঙ্গে প্রীতিকে ভাত খেতে দিয়েছে। মাস্টারদার সাথে খেতে না বসে প্রীতি লজ্জায় একদৌড়ে দোতলায় চলে গেলেন। সেখানে নির্মল সেন ও অপূর্ব শুয়ে আছেন।
এমন সময় মাস্টারদা তীরবেগে ঘরের ভেতরের মই বেয়ে দোতলায় উঠে বললেন, "পুলিশ এসেছে, পুলিশ!"
প্রীতি দোতলার ওপর বিপ্লবীদের সঙ্গে থাকতে চাইলেন। কিন্তু মাস্টারদা প্রীতিকে ঘরের ভেতরের মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে আদেশ দিলেন। এবং বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থাকতে বললেন। মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতি নীচে নেমে এলেন। এবং সাবিত্রী দেবীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।
দোতলার ওপর রইলেন মাস্টারদা, নির্মল সেন ও অপূর্ব। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বীরদর্পে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে ওপরে উঠছেন। কতো যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন। জীবনের বন্ধুর পথ পার হয়ে তিনি ক্যাপ্টেন হয়েছেন। এই পথ পরিক্রমায় মাসুলও তাঁকে কম দিতে হয়নি। বিগত যুদ্ধে শত্রুপক্ষ তাঁর একটি হাত ছিনিয়ে নিয়েছে। তিনি হয়তো ভাবছেন, তাঁর মতো খ্যাতিমান যোদ্ধাকে দেখলে বাঙ্গালী ছেলেদের হাত থেকে ভয়ে রিভলবার খসে পড়বে। প্রমোশনের মোহে তিনি দিশেহারা।
সাবিত্রী দেবীর বাড়ি মাটির। দোতলা। টিনের ছাউনি। দোতলায় উঠার দুটি সিঁড়ি। একটি ঘরের ভেতর দিক থেকে উপরে ওঠার। অন্যটি বাইরের দিক থেকে উপরে ওঠার সিঁড়ি। বাড়ির চারদিকে বেতগাছ ও গাছগাছড়ায় ভরতি। বাড়ির তিনদিকে গড়খাই। বেতগাছ লতার মতো বাগানটিকে ঢেকে রেখেছে। দূর থেকে দেখলে বাড়ি আছে বলে মনে হয় না।
সাবিত্রী দেবী বৃদ্ধা। বিধবা। এক ছেলে ও বিবাহিতা এক মেয়ে নিয়ে আছেন। তাঁর বাড়িতে বিপ্লবীরা সময়-সময় আশ্রয় নেন। তিনি বিপ্লবীদের মাসীমা। একান্ত আপনজন।
এদিকে পুলিশ ও মিলিটারিতে চারদিক ঘিরে ফেলেছে। পরিস্থিতি গুরুতর। বিপ্লবীরা আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন হাতে রিভলবার নিয়ে চুপ করে আছেন। মাস্টারদা কাগজপত্র ও টাকাকড়ি গুছিয়ে নিলেন। এমন সময় বিপ্লবীরা ভারি বুটের আওয়াজ শুনতে পেলেন। বুটের শব্দ নিকটতর হলো। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বন্ধ কপাটে ধাক্কা দিলেন। নির্মল সেন সুযোগের অপচয় করলেন না। নিমিষে দরজা খুলেই নির্মল সেন মিঃ ক্যামেরনের বুকে গুলি করলেন।
নির্মল সেনের পাশে দাঁড়ানো অপূর্ব সেন। তিনিও পরপর গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের মৃতদেহ গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলো। দোতলা লক্ষ্য করে সৈনিকেরা

চারদিক থেকে প্রচণ্ডভাবে রাইফেল চালাচ্ছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর দক্ষিণের জানালা দিয়ে একটি বুলেট এসে নির্মল সেনের বুকে লাগলো।

নির্মল সেন বললেন, "মাস্টারদা, আপনি ভোলা (অপূর্ব সেন) ও প্রীতিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এস্কেপ্ করুন, দেরি হলে আর বের হতে পারবেন না। আমি গুরুতর আহত।"

নির্মল সেনের বুক থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। মাস্টারদা নির্মল সেনের ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

নির্মল সেন ফের জোর দিয়ে বললেন, "মাস্টারদা তাড়াতাড়ি যান। আর দেরি করবেন না। আমি আর বেশিক্ষণ নেই। আমি অনবরত গুলি চালিয়ে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি বাড়ির সামনের দিকে আকর্ষণ করছি। এই ফাঁকে আপনারা বাড়ির পেছনের দিকে পালাবার চেষ্টা করুন।"

আহত অবস্থায় নির্মল সেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। প্রচণ্ড রক্ত ক্ষরণে তাঁর দেহ অবশ হয়ে পড়েছে।

নির্মল সেনের আর্তনাদ শোনা গেলো, "উঃ! মাস্টারদা চললাম। রানী—রানী! বিদায়।"

প্রীতিলতার ডাক নাম রানী। নির্মল সেনের কাতর চিৎকার শুনে মই বেয়ে প্রীতি ছাদের ওপর উঠতে চেষ্টা করলেন। সাবিত্রী দেবী তাঁর ছেলেমেয়ে মিলে তাঁকে চেপে ধরলেন। দুঃখে অধীর হয়ে প্রীতি সাবিত্রী দেবীর মেয়েকে ঘুষি দিলেন। তবুও তাঁরা প্রীতিকে ছাড়লেন না।

ছায়াসঙ্গী ও বন্ধু নির্মল সেনকে শেষবারের মতো একটি বার দেখে নিয়ে মাস্টারদা অপূর্ব সেনকে সঙ্গে নিয়ে ছাদ থেকে নেমে এলেন। অপূর্ব ও প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে মাস্টারদা ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন।

গাঢ় অন্ধকার। অতি সন্তর্পণে তাঁরা এগিয়ে চললেন। সবার আগে অপূর্ব। তাঁর পেছনে মাস্টারদা ও প্রীতি। কিছুদূর এগুতেই ঝোপের আড়াল থেকে রাইফেলের গুলি এসে অপূর্ব সেনের বুকে লাগলো। অপূর্ব চিরবিদায় নিলেন। মাস্টারদা ও প্রীতি কিছুদূর পেছন দিকে সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। প্রীতিলতা মাস্টারদার পাশ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে অপূর্বের দিকে এগুতে লাগলেন। মাস্টারদা বুঝতে পেরে প্রীতিকে হাত দিয়ে টেনে ধরলেন।

প্রীতিলতা মাস্টারদার কানে কানে বললেন, "ভোলাদার (অপূর্ব সেন) কাছে রিভলবার আছে। ওটা নিয়ে আসি।"

মাস্টারদা প্রীতিকে নিষেধ করলেন। তারপর দু'জনে বুকে ভর দিয়ে এগুতে লাগলেন। সামনে গড়খাই। বৃষ্টির জলে টইটম্বুর। সাঁতরিয়ে পার হতে হবে। প্রীতির হাতে একটি পাণ্ডুলিপি।

এই পাণ্ডুলিপিটি হলো—প্রীতিলতা কাজিন্ পরিচয় দিয়ে ফাঁসির প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রায় চল্লিশবার দেখা করেছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিলেন।

সেই পাণ্ডুলিপি প্রীতি ধলঘাটে এনেছিলেন। একদিকে জীবন বিপন্ন। পাণ্ডুলিপি বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাই পাণ্ডুলিপি জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর পরিখা সাঁতরিয়ে পার হয়ে গেলেন।

গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। পথ-ঘাট জলে জলময়। অন্ধকারের মধ্যে অতিকষ্টে মাস্টারদা প্রীতিকে সঙ্গে নিয়ে চললেন মণি দত্তের কাছে। মণি দত্ত ধলঘাট গ্রামে এক বাড়ির গৃহশিক্ষক। তিনি সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদার সঙ্গে তিনদিন ধরে ছিলেন। মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে বাসায় ফিরেছেন। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। মাস্টারদা বেশ কয়েকবার মণি দত্তের নাম ধরে ডাকলেন। কোন সাড়া পেলেন না। বর্ষার রাতে বাড়ির লোকজন অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

মাস্টারদা আবার মণি দত্তের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। মাস্টারদার ডাকে মণি দত্তের ছাত্রের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ছাত্রটি মণি দত্তকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন।

এতো রাতে ভিজে কাপড়ে মাস্টারদাকে দেখতে পেয়ে মণি দত্ত চমকে উঠলেন। বুক দুরুদুরু। তিনি ছুটে মাস্টারদার সামনে এসে হাজির হলেন। উদলা গা।

মাস্টারদা বললেন, "সাবিত্রী দেবীর বাড়ি মিলিটারিতে ঘিরে ফেলেছে। দুইপক্ষেই গুলি বিনিময় হয়েছে। নির্মলবাবু ও ভোলা নিহত।"

নির্মলদা এবং ভোলা নেই ? তিন ঘণ্টা আগে যাঁদের সঙ্গে আলাপ করে ফিরেছি তাঁরা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন ? মণি দত্তের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো।

মণি দত্ত মাস্টারদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রীতিদি" ?

মাস্টারদা জবাব দিলেন, "প্রীতি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, চল্ তাড়াতাড়ি। ভেবে ঠিক কর কোথায় আমাদের নিয়ে যাবি।"

মণি দত্তের বাড়ি পটিয়া থানার কাশীয়াইস। খুব গরিব ঘরের ছেলে। তাঁরা দু' ভাই এক বোন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তাঁকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ছিলেন। সারোয়াতলী ইস্কুলের ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয়। লম্বা ছ' ফুট। স্বাস্থ্যবান। প্রত্যুৎপন্নমতি।

মণি দত্ত ভাবলেন, ভোর হতে না হতেই পুলিশ মাস্টারদাকে গ্রামে গ্রামে খুঁজে বেড়াবে। মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন। কেননা জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামটির অবস্থান পাহাড় এবং নদীর সংযোগস্থলে। ধলঘাট থেকে গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ছ' কিলোমিটার। পুলিশ আসার খবর পেলে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে সুবিধে হবে। প্রয়োজনবোধে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে অন্য আশ্রয়েও যেতে পারবেন।

মাস্টারদা ও প্রীতিকে নিয়ে মণি দত্ত চললেন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের উদ্দেশ্যে। ক'দিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে রাস্তা-ঘাট অনেক জায়গায় জলের তলায়। মাঠে জল থৈথৈ করছে। কোথাও কোমর জল। আবার কোথাও সাঁতার কাটতে হচ্ছে। তার ওপর জলের স্রোত তো আছেই। পথ চলতে চলতে তাঁরা লুইসগানের শব্দ শুনতে পেলেন। তারপর তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের 'কুটির' নামক বাড়িতে। আশ্রয়কেন্দ্রের 'কুটির' নামটি বিপ্লবীদের দেওয়া।

ধলঘাট যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ঃ

চট্টগ্রামে সৈন্য ও বিপ্লবীতে সংঘর্ষ

সেনাদলের ক্যাপ্টেন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত

'দার্জিলিং, ১৪ই জুন—এইখানে এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, গতরাত্রে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার নিকটে বিপ্লবী ও সৈন্যদের এক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরন ও দুইজন বিপ্লবী নিহত হইয়াছেন। বিপ্লবীদের নিকট দুইটি রিভলবার ও গুলি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নিহত বিপ্লবীদের একজনকে নির্মল সেন বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।' [আনন্দবাজার ঃ ১৫-৬-১৯৩২]

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (দ্বিতীয় খণ্ড) বইতে (পৃঃ ১৩০) গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ

"এদিকে পরদিন সকালবেলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহমধ্যস্থ সকলের আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পড়ায় গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর লুইস্‌গানের গুলি চালাইয়া বাটীর একাংশকে ধ্বংস করিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিক তল্লাস করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন ক্যামেরন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃতদেহ, রিভলবার, কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পত্র .....দুইখানি পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি।"

ইংরেজ সরকার সাবিত্রী দেবী, তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণ ও বিবাহিতা মেয়ে স্নেহলতার বিরুদ্ধে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করলেন। মামলা চলতে লাগলো।

ধলঘাট সংঘর্ষের দু' দিন পর প্রীতিলতার বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে কিনা জানার জন্য মাস্টারদা মণি দত্তকে চট্টগ্রাম শহরে পাঠালেন।

মণি দত্ত প্রীতির মাকে জিজ্ঞেস্ করলেন, "আপনাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল ?"

প্রীতির মা প্রতিভাময়ী মণি দত্তের পরিচয় জানতে চাইলেন। প্রীতিলতার শেখানো কথা মতো মণি দত্ত বললেন, "আমি প্রীতিদির বান্ধবীর ভাই, তিনি আমাকে বাড়ির খবরাখবর জানতে পাঠিয়েছেন।

প্রীতির মা জানতে চাইলেন, "রানী এখন কোথায় ? আমাদের বাসায় পুলিশ এসেছে কিনা তুমি জানতে এসেছো। এর হেতু কী ? কোন দুঃখে আমাদের বাসায় পুলিশ আসবে ?"

মণি দত্ত জবাব দিলেন, "প্রীতিদি আমাদের বাসায় আছেন। পুলিশ চারদিকে ধড়পাকড় শুরু করছে। তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। মাসীমা, প্রীতিদি ভালো আছেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।"

মণি দত্ত নিজের পরিচয় গোপন করে ভুয়ো নাম বললেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতির মায়ের কাছে জানতে পারলেন, পুলিশ এখনো পর্যন্ত প্রীতির খোঁজখবর করেনি।

মাস্টারদা মণি দত্তের কাছে প্রীতির বাড়ির খবর জানলেন। মাস্টারদা প্রীতিকে বাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মণি দত্ত প্রীতিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলেন। প্রীতি যথারীতি

ইস্কুলের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। তাঁর জীবনযাত্রায় চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই। খুবই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছেন।

একদিন প্রীতি ইস্কুলে গেছেন, তাঁদের বাড়ি পুলিশ এলো। প্রীতির বোন কনকলতা তখন বাড়িতে উপস্থিত। পুলিশ প্রীতির বাবাকে একটি মোটা পাণ্ডুলিপি দেখালো। সাবিত্রী দেবীর বাড়ি তল্লাসির সময় গড়ের জলে খাতাটি ভাসতে দেখে পুলিশ কুড়িয়ে এনেছে। খাতাটির কিছু লেখা জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু হলো— 'অমিতা দাস' (প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার) নামে একটি মেয়ে 'কাজিন' পরিচয় দিয়ে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসির প্রতীক্ষারত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ।

কনকলতা দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তাঁর দিদি বাড়িতে বসে এই খাতায় লিখতে তিনি দেখেছেন। দিদির লেখা খাতা পুলিশের হাতে দেখতে পেয়ে তাঁর মনের মধ্যে যেন ছেঁকা লাগলো। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় বোবা হয়ে গেলেন তিনি।

পুলিশ প্রীতির বাবাকে পাণ্ডুলিপিটি হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "জগদ্বন্ধুবাবু, এই হাতের লেখা আপনার মেয়ে প্রীতিলতার কিনা বলুন ?"

প্রীতির বাবা মৌন। তিনি যেন মানসিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। হতভম্ব হয়ে পুলিশের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দাদার আমতা-আমতা করে বললেন, "অনেকটা আমার মেয়ের হাতের লেখার মতো দেখতে।"

এদিকে সাবিত্রী দেবীর মেয়ে স্নেহলতা গ্রেপ্তার হবার পর পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। তার কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে মাস্টারদার সঙ্গে একজন মেয়ে বিপ্লবীও ধলঘাট থেকে পালিয়ে গেছেন। সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে প্রীতির কাপড়-চোপড় পেয়েছে পুলিশ। স্নেহলতা প্রীতির নাম জানে না। তবে পুলিশের কাছে প্রীতির চেহারার বর্ণনা দিয়েছে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে স্নেহলতা যতোটুকু জানে তা ফাঁস করে দিয়েছে। এমন কি মামলায় মা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও ত্রুটি করেনি।

কল্পনা দত্ত প্রীতিকে নিয়ে ধলঘাটে মাস্টারদার সঙ্গে এই সংঘর্ষের আগে দেখা করতে গিয়ে ছিলেন। তাই কল্পনা দত্তকে স্নেহলতা ধলঘাটে দেখেছে। কিন্তু নাম জানে না। স্নেহলতার কাছে দু'জন বিপ্লবী সদস্যার চেহারার বর্ণনা শুনে, কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নাম পুলিশের সন্দেহের তালিকায় স্থান পেলো।

প্রীতিলতার আয়ের ওপর পরিবারের ভরণপোষণ চলছে। সংসারের দায়িত্ব প্রীতি পরম পবিত্রতার সাথে পালন করে চলেছেন। বাবা, মা, ভাই ও বোনদের স্নেহ মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ সুন্দর জীবন প্রীতিকে আর ধরে রাখতে পারলো না। পরাধীন ভারতবাসীর ক্রন্দনরোল তিনি শুনতে পেয়েছেন। তাঁর শান্ত হৃদয়ে প্রলয়ংকরী ঝড়ের মাতামাতি শুরু হয়েছে।

বিদায় আসন্ন। মায়ার বাঁধন কেটে প্রীতি সংসার ছেড়ে চলে যাবেন। প্রীতি আত্মগোপন করার জন্য মাস্টারদার লোক পাঠানোর কথা। বিকেলবেলা প্রীতি খালি গলায় উদাসী সুরে গান ধরলেন :

"শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও
জননী এসেছে দ্বারে।"

প্রীতির ছোট বোন কনকলতা দিদিকে করুণ সুরে গান করতে দেখে কাছে এলেন। দিদির দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। কনকলতা উপলব্ধি করলেন দিদির মন যেন কোন সুদূরে চলে গেছে। তাঁর উপস্থিতি দিদি টেরই পেলেন না। তন্ময় হয়ে গান করছেন।

এমন সময় মণি দত্ত প্রীতিলতার ঘরে ঢুকে চুপি চুপি বললেন, "প্রীতিদি. তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। আপনাকে নিয়ে যেতে মাস্টারদা আমাকে পাঠিয়েছেন।"

মণিলাল দত্তের মুখে খবরটি শুনে প্রীতির ধ্যানভঙ্গ হলো। মনে আনন্দের ঢেউ উঠলো। সেই আনন্দসাগরে সাঁতার দিয়ে তিনি যেন কোন অজানায় পাড়ি জমাতে চান।

প্রীতিলতা তাঁর মাকে বললেন, "মা, আমি পড়াতে যাচ্ছি।"

প্রতিভাময়ী প্রীতিকে বললেন, "আজ রথযাত্রা। আজো পড়াতে যাচ্ছিস ?"

প্রীতি জবাব দিলেন, "মা, আমি আজ যাবো বলে ছাত্রীকে বলে এসেছি।"

প্রতিভাময়ী মেয়ের কথা শুনে চুপ করে রইলেন। অভাগিনী মা বুঝতে পারলেন না তাঁর রানী চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

প্রীতির বাবা ঘরে ফিরেই প্রীতির খোঁজ করলেন। প্রীতির মা বললেন, "এইমাত্র রানী ছাত্রী পড়াতে বের হয়েছে।"

প্রীতির মায়ের কাছে প্রীতির খবর শুনে, প্রীতির বাবা হন্তদন্ত হয়ে খড়ম পায়ে খটাস্—খটাস্ শব্দে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রীতি ও মণি দত্তকে তিনি দেখতে পেলেন। প্রীতির বাবাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়ে মণি দত্ত সরে দাঁড়ালেন। প্রীতির সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর বাবার কথা হলো। পড়াতে যাবার অছিলায় প্রীতি তাঁর বাবার কাছ থেকেও বিদায় নিলেন। প্রীতি ও মণি দত্ত হাঁটতে হাঁটতে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। সেখানে বীরেশ্বর রায় তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রীতি ও মণি দত্তকে দেখে বীরেশ্বর রায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। তিনজনেই এক গাড়িতে চাপলেন। দেখতে দেখতে তাঁরা শহরের সীমানা পার হয়ে গেলেন।

প্রীতিলতা ছাত্রী পড়ানোর ছলনায় বিপ্লবীদলে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। আর বাড়ি ফিরলেন না। জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার তাঁর অনেক আত্মীয়ের বাড়ি মেয়ের খোঁজ—খবর নিলেন। কোথাও প্রীতির সন্ধান পাওয়া গেলো না। সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হলো। প্রীতির অন্তর্ধানের খবর শেষ পর্যন্ত থানায় জানানো হলো।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার যোগেন গুপ্ত প্রীতির বাবাকে বললেন, "আপনি না হয় বাৎসল্যস্নেহে প্রীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই সমস্ত ঘটনা জেনেও গোপন করেছিলেন। আমি পুলিশের লোক। আমি সব জেনেও কেন আপনার মেয়েকে বন্দী করলাম না। এখন বেশ অনুশোচনা হচ্ছে আমার। কেননা কর্তব্যে আমি বেশ অবহেলা করেছি। এবং মেয়েটিকে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছি।"

প্রীতি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন বুঝতে পেরে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টার ছুটলেন কল্পনা দত্তের বাড়ির দিকে। কল্পনাও পালায়নি তো ? কল্পনাকে বাড়িতে দেখতে পেয়ে ইন্সপেক্টার আশ্বস্ত হলেন।

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার কল্পনা দত্তকে বললেন, "এতো শান্তশিষ্ট মেয়ে প্রীতি। এতো

সুন্দর কথা বলে। ভাবতেও পারি না তার ভেতর এতো কিছু আছে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে সে চলে গেলো।"

প্রীতিকে বন্দী করার জন্য পুলিশ উঠেপড়ে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি আত্মগোপনের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো।

চট্টগ্রামের পলাতকা

ধরিবার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা

'চট্টগ্রাম ১২ই জুলাই—চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।' [আনন্দবাজার ১৩-৭-১৯৩২]

প্রীতিলতার ফেরারী জীবনে ডাক্তার হেমন্তকুমার ঘোষের বাসায় ডাক্তারের শ্যালিকা পরিচয়ে আছেন। ডাক্তার ঘোষ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পরিচালিত পরৈকোড়া দাতব্য হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁর বাড়ি ঢাকা। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য। আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের তিনি গোপনে চিকিৎসা করেন। এমন উদারচেতা ও মহান চরিত্রের মানুষটিকে তাঁর স্ত্রী ভুল বুঝলেন। প্রীতিকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেবার জন্য তাঁর স্ত্রীর মনের আকাশে ঘন কালো মেঘ জমে উঠলো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলো। বিপ্লবীর বাড়িতেই গৃহ বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাঁর স্ত্রী রাগের মাথায় কি অঘটন ঘটিয়ে বসেন কে জানে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে শান্ত করার কথা ভাবলেন।

একদিন ডাক্তার হেমন্তকুমার ঘোষ পরৈকোড়ার জমিদারের ছেলে সুশীল দাশগুপ্তকে ডেকে বললেন, "সুশীল, তোমরা প্রীতিকে অন্য আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাও। প্রীতি আমার বাসায় আত্মগোপন করে থাক তোমার বৌদি তা চান না। মাস্টারদাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলো, আমার এই অক্ষমতার জন্য তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।"

পুরুষ বিপ্লবীদের আত্মগোপন করা যেখানে সমস্যা তার ওপর প্রীতিকে লুকিয়ে রাখা নিয়ে মাস্টারদা অধিকতর সমস্যায় পড়লেন। বিপ্লবীদলের সভ্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রীতির সমস্যা সাময়িক দূর হলো। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে প্রীতিলতা বুঝলেন, দেশের মানুষের মানসিকতা নারী বিপ্লবীদের আত্মগোপন করার পক্ষে এখনো তৈরি হয়নি। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে মেলামেশা এবং বিপ্লবের প্রয়োজনে সমানতালে পা ফেলে চলা রক্ষণশীল সমাজ সহ্য করতে পারছে না।

যে-সব গরিব আশ্রয়দাতাদের বাড়িতে বিপ্লবীরা আশ্রয় নেন তাঁদের অধিকাংশ বাড়িতে একটি-দুটি ঘরের বেশি কামরা থাকে না। ফলে পুরুষ ও মহিলা বিপ্লবীদের জন্য পৃথক কামরার ব্যবস্থা করা আশ্রয়দাতাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অনেক সময় একই কামরায় পাশাপাশি বিছানার ব্যবস্থা করতে হয়।

বিপ্লবীরা সুদূরের যাত্রী। তাঁদের পথ চলাতেই আনন্দ।

কালীকিঙ্কর দের প্রচেষ্টায় দক্ষিণ-কাট্টলী গ্রামে বিপ্লবীদলের আশ্রয়কেন্দ্র যোগাড় হলো। এই গ্রামে মোট তিনখানি বাড়িতে বিপ্লবীরা আশ্রয় পেলেন। কাট্টলী গ্রামের যোগেশ

মজুমদারের বাড়িখানি বিপ্লবীদের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামখানি চট্টগ্রাম শহরের কাছাকাছি।

যোগেশ মজুমদার চট্টগ্রাম শহরে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে বেয়ারার চাকরি করেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে বিপ্লবীরা তাঁর সাহায্য চাইলেন। ক্লাব আক্রমণে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে তিনি রাজি হলেন। তাঁর সহযোগিতায় বিপ্লবীরা দ্বিতীয়বার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিন ধার্য হলো। ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্ব করবেন শৈলেশ্বর চক্রবর্তী। শৈলেশ্বরের সঙ্গে থাকবেন কালীকিঙ্কর দে ও শান্তি চক্রবর্তী। তাঁরা ক্লাবের মেন্ গেট দিয়ে ঢুকবেন। দ্বিতীয় গেট দিয়ে ঢুকবেন সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী। ক্লাবের উত্তরদিকে বিলিয়ার্ড খেলার রুমটি আক্রমণ করবেন—বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস। ক্লাবের ভেতর থেকে আক্রমণের উপযুক্ত সময়ে আলোর সংকেত দেবেন যোগেশ মজুমদার। আক্রমণের সময় তিন রকমের ইস্তাহার প্রচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

রাত প্রায় আটটা। নির্ধারিত দিনে শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদলটি কাট্টলী গ্রাম থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য বের হয়ে পড়লেন। কাট্টলী গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাবের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবীরা ক্লাবের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। বৈদ্যুতিক আলোতে ইউরোপীয়ান ক্লাব প্রাঙ্গণ আলোয় ঝলমল করছে।

ক্লাবের অদূরে বিপ্লবীদলটি অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ক্লাব আক্রমণ আসন্ন। এমন সময় বিপ্লবীদলের একজন সদস্য বললেন, "ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার আগে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। দেখছ না, সাহেবেরা ক্লাবের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে? এ মতো অবস্থায় এগিয়ে গেলে আমরা ধরা পড়ে যাবো।"

বিপ্লবীরা মরণ ভয়ে ভীত। বিপ্লবীদের মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ার ফলে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ক্লাব আক্রমণ স্থগিত রাখলেন। চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ এবারও ব্যর্থ হলো। এই দুঃখে শৈলেশ্বর পটাসিয়াম-সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

শৈলেশ্বর অকালে ঝরে গেলেন। মাস্টারদার বাহুবল দিন দিন হীনবল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনার নিত্যসহচর নির্মল সেন এবং সহযোদ্ধা আরো অনেককে হারিয়ে তিনি দিশেহারা। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস গণ-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এতোদিনেও হয়ে উঠলো না। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব দুই দুই বার আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। মাস্টারদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে।

চট্টগ্রাম বহুদিন ধরে অগ্নিগর্ভ। শান্তি-সুনীতি কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ ষ্টীভেন্সকে হত্যা করার পর কুমিল্লার অবস্থা সঙ্গিন। কুমিল্লার ইংরেজ এডিশনাল এস. পি. মিঃ এলিসন জনসাধারণের ওপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছেন। কুমিল্লাবাসীরা মিঃ এলিসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। মাস্টারদার মন্ত্রশিষ্য শৈলেশচন্দ্র রায় ভাবলেন, মিঃ এলিসনকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। অথচ তাঁর হাতে রিভলবার নেই।

শৈলেশ রায় রিভলবার যোগাড় করার উপায় অনুসন্ধান করে চলেছেন। তিনি তাঁর দূর

সম্পর্কের ভাগ্নের গলা থেকে সোনার হার চুরি করে নিলেন। সোনার হার বিক্রি করে তিনি রিভলবার কেনার টাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কিভাবে রিভলবাব সংগ্রহ করবেন তার ভাবনায় অধীর হয়ে উঠলেন। রিভলবার তো সহজলভ্য বস্তু নয়। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না।

শৈলেশ রায়ের চিন্তা অন্যদিকে মোড় নিলো। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর যে-সব রিভলবার বিপ্লবীরা সংগ্রহ করেছেন সেই রিভলবার দিয়ে তিনি মিঃ এলিসনকে হত্যা করবেন না। কেননা তিনি মাস্টারদার অগোচরে নিজ প্রচেষ্টায় এই কাজ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই আলোচ্যবিষয়ে শৈলেশ রায় কি লিখছেন দেখা যাক।

ঢাকা (বাংলাদেশ) থেকে প্রকাশিত 'রোববার' পত্রিকায় অগ্নিদিনের কথা' প্রবন্ধে শৈলেশচন্দ্র রায় লিখেছেন ঃ

"...মনে-মনে ঠিক করি, যদি কোনো মতে একটা রিভলবার আর অন্তত কিছু কার্তুজ সংগ্রহ করতে পারি তাহলে অত্যাচারী এলিসনকে আমি হত্যা করবো। যেহেতু মাস্টারদাকে না জানিয়ে করা হবে তখন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রিভলবার ব্যবহার করা সঙ্গত হবে না। তিনি ইংরেজ মারতে পারলে খুশি হবেন নিশ্চয়ই। যে-কোনো ইংরেজ শাসককে হত্যা করতে পারলেই তখনকার বিপ্লবীরা খুশি। তা আমার জানা ছিলো। সে সাহসে ভর করেই এই চিন্তা মনে স্থান দিলাম। একজন ইংরেজ নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু। বিশ্বের সবাই আমাদের সুহৃদ। কিন্তু শোষক-শাসকই আমাদের শত্রু, তা যে-কোন দেশেরই হোক না কেন?"

একদিন শৈলেশ রায়ের সঙ্গে তাঁর সহপাঠী নরেন্দ্র সিংহের দেখা হলো। নরেন্দ্র সিংহের বাড়ি নোয়াখালি সদর থানার গোপালখোর গ্রামে। শৈলেশ রায় জানেন নরেন্দ্র সিংহ যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শৈলেশ রায় নরেন্দ্র সিংহের কাছে রিভলবার কেনার প্রস্তাব করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। নরেন্দ্র সিংহের নির্দেশে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার চণ্ডীপুর গ্রামের বীরেশ গুপ্তের কাছ থেকে মাত্র দেড়শ' টাকায় '৩২ বোরের রিভলবারটি কিনলেন। রিভলবারের সঙ্গে কার্তুজ পেলেন মাত্র দশ-বারোটি। নরেন্দ্র সিংহ, বীরেশ গুপ্ত ও জীতেন ঘোষ বার্মায় বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব করতেন। তখন তাঁরা দেশে চলে এসেছেন।

রিভলবার হাতে নিয়ে শৈলেশ রায় নেড়েচেড়ে দেখলেন। এ দিয়ে মানুষ মারা যাবে তা তিনি ভাবতেই পারছেন না। বীরেশ গুপ্তের সঙ্গে সেখানে আরো ক জন পার্টির সদস্য উপস্থিত। তাঁদের সামনে শৈলেশ রায় হতাশার সুরে বললেন, "হায়! হায়! এদিয়ে মানুষ মারা যাবে তো? আমি সব সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার থেকে সংগৃহীত রিভলবার দেখেছি।"

বীরেশ গুপ্তের সহবিপ্লবীদের একজন আশ্বাস দিয়ে বললেন, "এ দিয়ে মানুষ কেন বাঘও মারা যাবে।"

এতো বড় একটি কাজে নামতে এই কটি কার্তুজ যথেষ্ট নয়। শৈলেশ রায় খবর পেলেন, জীতেন ঘোষের কলকাতার সহকর্মীরাই অনেক কার্তুজ তাঁকে সংগ্রহ করে দেবেন। শৈলেশ রায় কার্তুজের জন্য কলকাতা এলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রিভলবারের কার্তুজ নিয়ে, তিনি কলকাতা থেকে গেলেন নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার করপাড়া গ্রামে নিজের

বাড়ি। তারপর তিনি কুমিল্লায় ফিরলেন। এসব খবর চট্টগ্রাম পার্টির কেউ জানেন না।
রিভলবার ও কার্তুজ সংগ্রহ করাকালীন শৈলেশ রায় আই. এস-সি. পরীক্ষা দিয়েছেন। এখন রেজাল্টের প্রতীক্ষায়। ভাবছেন, মিঃ এলিসনের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মানসিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ তৈরি।

১৯১১ সালের ২২ ডিসেম্বর শৈলেশচন্দ্র রায় কুমিল্লা শহরের কান্দিরপারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বৈকুণ্ঠনাথ রায় কুমিল্লা জজকোর্টের আপার্ ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে অকালে মারা যান। বৈকুণ্ঠনাথের পঞ্চম সন্তান শৈলেশ। তাঁর তিন ছেলের নাম হলো—যোগেশচন্দ্র, শৈলেশচন্দ্র ও সীতেশ। মেয়েদের নাম - পঙ্কজিনী, বিন্দুবাসিনী ও লাবণ্যপ্রভা।

শৈলেশ রায়ের বিধবা মা আশায় বুক বেঁধেছেন। তাঁর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। অভাগিনী মায়ের দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু শৈলেশের জীবনদেবতা শৈলেশকে দেশ উদ্ধারের কাজে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন।

শৈলেশের বয়স যখন ছ'বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর জেঠতুতো দাদা দুর্গাকুমার রায় তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণের ভার নেন। তিনি ভাইদের লেখাপড়ায় আর্থিক অসুবিধে যাতে বিঘ্ন না ঘটায় সেদিকে নজর দেন। দাদা যত্ন নিচ্ছেন ভাইদের লেখা-পড়ার। আর প্রাণের ভাই শৈলেশ যত্ন নিচ্ছেন রিভলবারের।

শৈলেশ রায় রাত ন'টার সময় কুমিল্লার রেললাইনের ধারে গিয়ে রিভলবার টারগেটিং প্রাক্‌টিস্ করছেন। ট্রেন চলাচলের সময় টারগেটিং প্রাক্‌টিস করার উদ্দেশ্য—রেলগাড়ির শব্দের সঙ্গে রিভলবারের গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবে। এভাবে চললো তাঁর অনুশীলন।

প্রস্তুতিপর্ব অনেকদূর এগনোর পর শৈলেশ তাঁর বিপ্লবী জীবনের দীক্ষাগুরু হরলাল চৌধুরীকে মিঃ এলিসন হত্যার পরিকল্পনার কথা জানালেন। হরলাল চৌধুরী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়েন। বি. এ. পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন।

হরলাল চৌধুরী যখন চট্টগ্রামের মীরসরাই থানার দুর্গাপুর এন. সি. এচ্. ঈ. ইস্কুলে পড়েন তখন তিনি শৈলেশ রায়কে বিপ্লবীদলের সদস্যপদে গ্রহণ করেন। শৈলেশ ক্লাস এইটের ছাত্র। হরলাল চৌধুরী দশম শ্রেণীর ছাত্র।

হরলাল চৌধুরী কৃতী ছাত্র। মাস্টারদা বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করার জন্য তাঁকে সারোয়াতলী ইস্কুল থেকে দুর্গাপুর ইস্কুলে পাঠিয়ে দেন। তাঁর বাড়িতে ইস্কুল বদলির বিষয়ে কিছুই জানাননি। মাস্টারদার নির্দেশে তিনি দুর্গাপুর ইস্কুলে চলে গেলেন। বিপ্লবীদলের টাকায় তাঁর বোর্ডিং খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চলছে। পরে তিনি বাড়ির খরচে পড়তেন।

ইস্কুল বোর্ডিংয়ে থাকেন হরলাল। শৈলেশ ও সীতেশ তাঁরা দু' ভাই। একই বোর্ডিংয়ে থাকেন। সেই সুযোগে দু' ভাইকে বিপ্লবীদলে টানার চেষ্টা করলেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। কেননা দুর্গাপুর ইস্কুলের ফিজিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্‌টর মহেন্দ্র ঘোষ শৈলেশ রায়ের সম্পর্কে দাদা হন। শৈলেশ ও সীতেশকে তিনি কড়া নজরে রাখেন। হরলাল অনেক কষ্টে শৈলেশকে দলে টানতে পারলেন। সীতেশকে পেলেন দলের একজন পূর্ণ সমর্থক।

কলেজে পড়ার জন্য সীতেশ রায় কুমিল্লায় এলেন। তিনি আই. এস-সি. পড়ার জন্য

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভরতি হলেন। কুমিল্লার কান্দিরপারে তাঁদের বাসায় শৈলেশ, সীতেশ ও তাঁর জেঠতুতো দাদা নগেন্দ্রমোহন রায় সপরিবারে থাকেন।
মিঃ এলিসনকে হত্যার পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করতে হরলাল চৌধুরী শৈলেশ রায়ের বাসায় এলেন। তিনজন রুদ্ধকক্ষে বসে গভীরভাবে আলোচনা শুরু করলেন। সেই তিনজন হলেন—হরলাল চৌধুরী, শৈলেশ রায় ও সীতেশ রায়। দীর্ঘ আলোচনার পর শৈলেশের ছোট ভাই সীতেশ এক অপূর্ব প্ল্যান বাতলিয়ে দিলেন।
সীতেশ রায় বললেন, "ডানহাতে একটি বন্ধ ছাতা থাকবে। ছাতার বাঁটের এমন জায়গায় ধরতে হবে, ডানহাতের কবজি ছাতার কাপড়ে ঢাকা পড়বে। সাধারণ পথিকের মতো বন্ধ ছাতার ভেতর হাত রেখে চলতে থাকবে। বন্ধ ছাতার বাঁটের সঙ্গে একই মুঠোর মধ্যে ধরা থাকবে রিভলবারটি। মিঃ এলিসন যখন প্রতিদিনের মতো সাইকেলে চড়ে দুপুরবেলা লান্‌চে বাসায় ফিরবেন তখন চট্ করে ছাতাটি ছেড়ে দিতে হবে। ডানহাতের মুঠোয় থাকবে একমাত্র রিভলবারটি। সেই লুকানো রিভলবার দিয়ে মিঃ এলিসনকে আক্রমণ করতে সহজ হবে। তা হলে মিঃ এলিসন আত্মরক্ষার সময় পাবেন না। এবং তাঁর দেহরক্ষীরা ঘটনা বুঝে উঠার আগেই কাজ সমাধা হয়ে যাবে।"
সীতেশ রায়ের প্ল্যানের তারিফ করে হরলাল চৌধুরী বললেন, "তোমার পরিকল্পনা ভারি চমৎকার। আমি মনে করি, এর বিকল্প নেই। শৈলেশ, সাহসের সাথে এগিয়ে যাও। তুমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবে।"
শৈলেশ রায়কে জীবনের শেষবারের মতো দেখে নিয়ে ধীর পায়ে হরলাল চৌধুরী মন্ত্রণাকক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন। শৈলেশকে দেখে তাঁর মনে হলো—শৈলেশের চোখ দুটি বাঘের চোখের মতো জ্বলছে। অত্যাচারী মিঃ এলিসনকে শাস্তি না দিয়ে সে শান্ত হবে না। ধরা পড়লে ফাঁসি। মরণ আর মারণের খেলায় মেতেছেন বিপ্লবী শৈলেশ রায়।
সাতদিন ধরে মিঃ এলিসনকে ওয়াচ্ করার জন্য শৈলেশ রায় বাড়ি থেকে দুপুরে বের হয়ে পড়েন। আর ভাবেন কোন জায়গায় কিভাবে তিনি তাঁকে আক্রমণ করবেন।
শৈলেশ প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন মিঃ এলিসনকে তিনি গুলি করেছেন। কিন্তু তিনি মরেননি। ঘুম ভাঙ্গার পর মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দিন গড়িয়ে চললো।
এবার শৈলেশ রায় ভাবলেন, প্রস্তুতির দিক থেকে কোন ত্রুটি নেই। রিভলবারে কোন যান্ত্রিক গণ্ডগোল নেই। টারগেটিং প্রাক্‌টিস করার সময় বোঝা গেছে কার্তুজ ঠিক আছে। এখন একমাত্র পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, রিভলবার নিয়ে মিঃ এলিসনের মুখোমুখি হলে ঘাবড়াবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা। এ ব্যাপারে একবার অন্ততঃ রিহার্সেল না দিলে নয়। সরোজ গুহ অনন্ত সিংহের হাতে গড়া প্রথমসারির বিপ্লবী সৈনিক। অসীম সাহসী। তিনি এতো চেষ্টা করেও ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্ণোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলেন না। শৈলেশ আগে থেকেই অনেকবার স্বপ্ন দেখেছেন গুলি করার পরও মিঃ এলিসন মরেননি। যতোই স্বপ্ন দেখুন না কেন সংকল্পে তিনি অচল অটল।
নিজেকে পরীক্ষার মানসে শৈলেশ রায় একদিন দুপুরবেলা রিভলবার সহ মিঃ এলিসনের সামনে গেলেন। এলিসন সাহেব সাইকেলে করে শৈলেশের পাশ দিয়ে তাঁর গন্তব্যস্থলে

চলে গেলেন। তিনি নিজেকে নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর বুক মোটেই ধুকপুক করছে না। স্বাভাবিক আছেন

নির্ধারিত দিনটি এলো। শৈলেশ তাঁর ছোট ভাই সীতেশকে ডেকে বললেন, "ভাই, আমি চললাম।"

দুই ভাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সীতেশের দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। দুই ভাইয়ের মিলন দৃশ্য বড়ই করুণ। এ যেন মিলন আর বিয়োগের সন্ধিক্ষণ। নাটক যেন দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

সীতেশ ভাবলেন, তাঁর রাঙ্গাদাদাকে হয়তো জন্মের মতো হারাতে হবে। বাড়িতে দাদা ও দিদিরা জানেন না তাঁদের পরম স্নেহের ভাইকে হারাতে চলেছেন। মা জানেন না, তাঁর মেজছেলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাচ্ছেন। মিঃ এলিসনকে মারতে গিয়ে উলটো আক্রমণে তাঁর রাঙ্গাদার মৃত্যু হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো তাঁরা দাদার মরদেহ দেখতে পাবেন। তখন মায়ের হৃদয় বিদারক কান্নায় আকাশ-বাতাস ভরে উঠবে।

ছোট ভাই সীতেশ কাতর স্বরে বললেন, "আমিও সঙ্গে যাই দাদা।"

শৈলেশ সীতেশকে বললেন, "বড় ভাই বাবার, ছোট ভাই মায়ের, মেজ ভাই দেশ মাতৃকার। সুতরাং আমিই যাই। মাকে বলো – আমি দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে বলি দিতে যাচ্ছি।"

২৯ জুলাই ১৯৩২ সাল। শৈলেশ রায় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি তাঁদের কুমিল্লার বাসা থেকে বেলা বারোটায় বের হয়ে পড়লেন।

বেলা একটা। শৈলেশ রায় দূর থেকে দেখতে পেলেন মিঃ এলিসন সাইকেলে করে এগিয়ে আসছেন। তিনি সাধারণ পথিকের বেশে আস্তে-আস্তে এগুতে লাগলেন। যখন দেখলেন মিঃ এলিসন রিভলবারের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছেন তখন ছাতার ভিতর লুকানো রিভলবার বের করে পরপর তিনটি গুলি করলেন তিনি।

রিভলবারের গুলির আপ্যায়নে মিঃ এলিসন ছিটকে ড্রেনে পড়ে গেলেন। শৈলেশ রায় ড্রেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এলিসন সাহেবকে তাক করে অবশিষ্ট আরো দুটি গুলি করলেন। রিভলবার খালি। পলকে ঘটনাটি ঘটে গেলো।

মিঃ এলিসন হাজার হলেও ইংরেজ। তার ওপর পুলিশের ট্রেনিং প্রাপ্ত অফিসার। মিঃ এলিসন তাঁর কোমর থেকে রিভলবার বের করলেন। ড্রেনের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে শৈলেশ রায়কে তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। রিভলবারে কার্তুজ লোড করার সেই সুযোগ শৈলেশের নেই। তিনি দেখলেন মিঃ এলিসনের দেহরক্ষীরা গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

শৈলেশ রায় মিঃ এলিসন হত্যার নেপথ্য কাহিনীতে কি বলেছেন দেখা যাক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'রোববার' পত্রিকায় 'অগ্নিদিনের কথা' প্রবন্ধে শৈলেশচন্দ্র রায় লিখেছেন : "...তারপর লক্ষ্য করলাম সে গুলি খেয়েও হাঁটু গেড়ে বসে আমাকে তাক করে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। এদিকে তাঁর দেহরক্ষী গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে 'ধর-ধর' বলে আমার পেছনে ছুটলো। আমার রিভলবারে তখন কার্তুজ ভরা নেই। আমি তখন জিগ্‌জাগ্‌

কোর্সে দৌড়াতে লাগলাম। আমি কুমিল্লা জেনারেল পোস্ট অফিস-এর পেছন দিয়ে দৌড়াতে থাকি। একটি ধোপা আমাকে ধরতে পারতো। সে টেনিস লনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমার দু-তিন হাতের মধ্যে ছিলো। তাকে রিভলবার দেখাতেই সে আমাকে ধরলো না। চৌধুরীপাড়ার মোড়ে তেমাথার ওপরে কিছু লোক জড় হয়েছিলো। তারা জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে, আমি বললাম, 'আগুন, আগুন'।

তারপর থানার কাছে একটি গলিতে গিয়ে রিভলবার লোড করলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে লোকজন আমার পেছনে-পেছনে ধাওয়া করেনি। করলেই আমাকে ধরতে পারতো। অনেক ঘুরে বাসায় এলাম।"

সীতেশ রায় তাঁর রাঙাদাকে বাসায় ফিরতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি দেখলেন তাঁর রাঙাদার ডানহাতে গুলি লেগে ছিঁড়ে গেছে। হাত থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। ক্ষতস্থানে পারমেঙ্গানেট অব পটাশ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

- আগস্ট ১৯৩২ সাল। মিঃ এলিসনের জীবনদীপ চিরতরে নিবে গেলো।

সাতদিন ধরে শৈলেশ রায় কুমিল্লা শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর কুমিল্লা রেলস্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে চাপলেন। তাঁর গন্তব্যস্থল চট্টগ্রাম জেলার দুর্গাপুর গ্রাম। সঙ্গে রিভলবার।

দুর্গাপুর থেকে শৈলেশ রায় মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চট্টগ্রামে এক গুপ্ত আস্তানায় মাস্টারদার সঙ্গে শৈলেশের দেখা হলো। শৈলেশের কাছ থেকে মিঃ এলিসন হত্যার পূর্ণ বিবরণ শুনে মাস্টারদা আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। স্নেহচুম্বন দিলেন। তাঁর জীবন সার্থক হলো।

আততায়ীকে ধরার জন্য পুলিশ কুমিল্লা শহর চষে দিচ্ছে। অনেক যুবককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেছে। তবুও আততায়ীর সন্ধান পেলো না। সন্দেহজনক যুবককে বিনা বিচারে বছরের পর বছর জেলে বন্দী করে রাখলো। শেষ পর্যন্ত সরকার মিঃ এলিসনের হত্যাকারীকে ধরে দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন।

শৈলেশের ছোট ভাই সীতেশ খবরের কাগজে, মিঃ এলিসনের হত্যাকারীকে ধরে দেওয়ার জন্য সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন দেখে তাঁর দাদাকে রসিকতার সুরে বললেন, 'রাঙ্গাদা, ইচ্ছে করলে আমি এই পুরস্কার নিতে পারি।"

কতো নির্মম কথা। ছোট ভাই দাদাকে পরিহাস ছলে কতো সুন্দরভাবে উপহার দিলেন। ভাইয়ের কথা শুনে দাদা মিষ্টি-মধুর হাসলেন। অন্য কারো মুখে এই কথা শুনলে শৈলেশের প্রতিহিংসার আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠতো। সেই কথা ভাইয়ের মুখে কতো স্নিগ্ধ-সুন্দর। স্নেহের ভাই সীতেশের ভালোবাসার গভীরতা অতলস্পর্শী তা তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

মিঃ এলিসনকে হত্যা করার পর শৈলেশ রায় চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে বি. এস-সি. পড়ার জন্য ভর্তি হলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি। আততায়ী চিরদিনের মতো পর্দার আড়ালে রয়ে গেলেন। কিন্তু রিভলবারটি শৈলেশ রায় জমা রাখলেন তাঁর বিপ্লবী গুরু হরলাল চৌধুরীর কাছে।

চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই, ফেণী ও কুমিল্লার বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন হরলাল

চৌধুরী। আঞ্চলিক নেতা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। মাস্টারদা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বেশ কিছু সদস্য বিপ্লবীদলে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন—মণীন্দ্র গুপ্ত (কালু), সুকুমার ভৌমিক, বীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সৌরীন্দ্রকিশোর দত্তচৌধুরী, সুধীর সিংহ ও শৈলেশচন্দ্র রায়।

ঢাকার জেলাশাসক মিঃ ডুর্ণোকে আক্রমণ করার পর সরোজ গুহ ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে কুমিল্লায় আত্মগোপন করলেন। কুমিল্লায় কিছুদিন থাকার পর তিনি নোয়াখালি চলে গেলেন।

৩ আগস্ট ১৯৩২ সাল। বর্ষণ মুখর রাত। নোয়াখালি জেলার ধর্মপুর গ্রামের ভৈরব ঘোষের বাড়িতে সরোজ গুহ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। তারপর ২৮ আগস্ট তারিখে কলকাতায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন—চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সদস্য হেমেন্দু দস্তিদার। এবার সরোজ গুহকে সনাক্তকরণের পালা। তাই ঢাকার নবাবপুর রোডের মিষ্টির দোকানের মালিককে সনাক্তকরণের জন্য চট্টগ্রাম আনা হলো। সনাক্তকরণের সময় মিষ্টির দোকানের মালিক সরোজ গুহকে না চেনার ভান করলেন।

পুলিশ রিপোর্টে সরোজ গুহ সম্বন্ধে কি লেখা আছে দেখা যাক।

"Secret Police Abstract of Intelligence, Vol. XXXIX ; S. P. Chittagong"—এরূপ একটি File থেকে "A Brief History of Terrorism" শিরোনামায় একটি Typed document থেকে নীচের তথ্যটি সরবরাহ করা হলো :

"28. 10. 31. Dacca—An Attempt was made on the life of Mr. Durno, I.C.S., Dist. Magistrate, Dacca on 28. 10. 31. He was severely wounded. It is said that Sarojkanti Guha, an absconder of Chittagong committed this outrage." (p. 41 of the Brief History of Terrorism.)

[মহানায়ক সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব : অনন্ত সিংহ : পৃঃ—৩৯]

অম্বিকা চক্রবর্তী, সরোজ গুহ ও হেমেন্দু দস্তিদারকে নিয়ে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাম দিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা দায়ের করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সাল। 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' দ্বিতীয় মামলার রায় প্রকাশিত হলো। বিচারে অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ড এবং সরোজ গুহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়। হেমেন্দু দস্তিদার মুক্তি পান।

অম্বিকা চক্রবর্তী ও সরোজ গুহ হাইকোর্টে আপিলের অনুমতি পেলেন। আপিলে অম্বিকা চক্রবর্তীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এবং সরোজ গুহের দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল রইলো।

সূর্য সেনকে ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার

"১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কার্যে বিপ্লবীদের নেতা বলিয়া কথিত সূর্য সেনকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে বা এমন সংবাদ দিতে পারিবে যাহাতে সে ধরা পড়ে,

তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গত ১৩ই জুন তারিখে পটিয়ার বিপ্লবীদের সহিত যে সংঘর্ষের ফলে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হইয়াছে, সূর্য সেনই নাকি সেই সংঘর্ষের পরিচালক।' [আনন্দবাজার : ৩-৭-১৯৩২]

সূর্য সেন ইংরেজ সরকারকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলতে চান। তিনি মেয়েদের দিয়ে একটি আক্রমণ সংগঠিত করার কথা ভাবছেন। এদিকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারকে বাড়ি থেকে বের করে এনে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় রেখেছেন। প্রীতিলতা আক্রমণে অংশগ্রহণ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সংসারের মায়া ত্যাগ করে এসেছেন তিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

প্রীতিলতা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কয়েকদিন আগে হিজলী বন্দীশালায় পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি সেন্সর হয়ে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের হাতে পৌঁছলো। চিঠিটি বাংলায় লেখা। পূর্ণেন্দু তাঁর বোনের চিঠিটি বারবার পড়েও মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারলেন না। তারপর বন্ধু মনোরঞ্জন রায়কে প্রীতির চিঠিটি পড়তে দিলেন। চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন লেখা হয়েছে।

কেমিস্ট্রির ছাত্র মনোরঞ্জন প্রীতির চিঠির ভাবার্থ বোঝার চেষ্টায় মনোনিবেশ করলেন।

মনোরঞ্জন রায় চিঠিটি পড়ে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, "প্রীতিলতার সঙ্গে মাস্টারদার যোগাযোগ হয়েছে। মাস্টারদা হয়তো প্রীতিকে আত্মগোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা কোন অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই প্রীতি চিঠিতে লিখেছে— 'অজানার পথে চলেছি'। বন্দী অবস্থায় অসুস্থ হয়ে আমি যখন কলকাতা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভরতি ছিলাম তখন প্রীতি আমাকে রোজ দেখতে আসতো। সেই সময় আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম—স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সে কি রকম উদ্‌গ্রীব হয়েছিল।"

এক রাতে কল্পনার সঙ্গে কাট্টলী গ্রামের কাছে সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে প্রীতিলতা ভাবছেন, তাঁর দাদা পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর প্রেরিত চিঠিটি পেলেন কিনা কে জানে।

এমন সময় প্রীতি ও কল্পনার কাছে এসে তারকেশ্বর দস্তিদার বললেন 'কল্পনা, তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কাজ শুরু হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে, খোঁজখবর এখনও সব এসে পৌঁছায়নি। বাসায় ফিরে না গেলে বাড়ির লোকজন অস্থির হয়ে পড়বেন। তোমার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ আছে। পুলিশ জানতে পারলে বিপদ। কাজেও বাধা আসতে পারে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাতে কল্পনাকে বাড়ি ফেরার পথে পা বাড়াতে হলো। ১৭ সেপ্টেম্বর সকালবেলা বাসার কাছাকাছি এসেই দেখতে পেলেন, তাঁদের ঘরের বারান্দায় গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বিপদ বুঝে কল্পনা আর বাড়ি ঢুকলেন না।

দিন গড়িয়ে রাত এলো। কল্পনা দত্ত তাঁর দু'জন বিপ্লবী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে চললেন গোপন বিপ্লবীকেন্দ্র কাট্টলী গ্রামে। কাট্টলী থেকে ফিরে এসে পুনরায় কাট্টলী গ্রামে যাওয়ার পথে, মাত্র কুড়ি ঘণ্টার ব্যবধানে কল্পনা দত্ত পুরুষ পোশাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কল্পনা দত্তের সঙ্গে বন্দী হলেন নির্মল সেন (বুলবুল) ও দীনবন্ধু মজুমদার।

এ সম্বন্ধে লেখককে নির্মল সেন (বুলবুল) চট্টগ্রাম থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিটির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো।

"মাস্টারদার নির্দেশে ভুলুদির (কল্পনার ডাক নাম ভুলু) সঙ্গে আমার সক্রিয় পরিচয় হলো। অতি সন্তর্পণে নিরাপদে ভুলুদিকে গাইড করে নিয়ে যেতাম বিপৎসংকুল পথ অতিক্রম করে মাস্টারদা ও ফুটুদার (তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম ফুটু) আশ্রয়স্থলে। প্রীতিলতার বোনকেও নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর আসে।

তখন আমার বয়স মাত্র ষোল-সতের। যে ভয়াল রাতে পাহাড়তলীতে ভুলুদি সহ ধরা পড়লাম তার কথাই বলি। মাস্টারদা ও ফুটুদার নির্দেশে ভুলুদিকে কাট্টলী গ্রামের গোপন আশ্রয়ে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এলো। আগেও এরকম কাজ সাফল্যের সাথে করেছি।

১৯৩২ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর। ভুলুদিকে নিয়ে দেব পাহাড়ের এক গোপন স্থানে রাতে অন্ধকারে অপেক্ষা করছি। বৃষ্টি এলো। দু'জনেই ভিজে গেলাম।

ভুলুদি পুরুষের পোশাক নিলেন। লম্বা চুলে পাগড়ি জড়ালেন। সুদর্শন শিখ ছেলের মতো সাজলেন। মোটর গাড়ি এলো। গাড়ির ড্রাইভার, দলের লোক। ড্রাইভারসহ আমরা চারজন। পাহাড়তলীর কাছে ভুলুদি, দীনবন্ধু মজুমদার ও আমি গাড়ি থেকে নামলাম।

তখন রাত প্রায় বারোটা। কয়েকজন লোক আমাদের সন্দেহ করলো। বিশেষ করে ভুলুদির অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করলো। ক্রমশঃ তারা দলে ভারি হলো। পালাবার পথ ছিল না।

আমরা তখন ভুলুদিকে ঘিরে রেখেছি। আমাদের নির্ভীকতা দেখে জনতা আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সাহস পেলো না। তাদের লোলুপদৃষ্টি আমাদের দৃঢ়তার কাছে হার মানলো। পুলিশ এসে গেলো। ধরা দিলাম। কেন, কোথায়, কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তারা ভাবতে পারলো না। শুধু ভাবলো—আমাদের কু-মতলবের কথা।"

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে বার বার বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ইউরোপীয়ান ক্লাবটি চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলীতে অবস্থিত। পাহাড়তলী এলাকায় কল্পনা দত্ত কয়েকদিন আগে পুরুষবেশে ধরা পড়েছেন। কল্পনার সঙ্গে বন্দী হয়েছেন আরো দু'জন বিপ্লবী। পুলিশ ও মিলিটারি পাহাড়তলী এলাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে বিপ্লবীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। নির্বাচিত আক্রমণকারীরা প্রস্তুত।

১৮ এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে নরেশ রায়ের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে বিপ্লবীরা দেখেন সাহেবরা কেউ ক্লাবে যাননি। সেদিন ছিল 'গুড্‌ফ্রাইডে'। তাই বিপ্লবীরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বার ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বার ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়েছে বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের ওপর।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতিপর্বে ২২ সেপ্টেম্বর মাস্টারদা দীনেশ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে, কাট্টলী গ্রামে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা যোগেশ মজুমদারের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। দু'জনের পরনে লুঙ্গি ও শার্ট। মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে তাঁদের আসতে হয়েছে

বলেই তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের পোশাক পড়েছেন। মুসলমান পোশাকে বেশ মানিয়েছে মাস্টারদাকে।

আশ্রয়কেন্দ্রে এসে মাস্টারদা উপস্থিত বিপ্লবীদের বললেন, "বার বার মনে হয়েছে, আমার অনুপস্থিতিই গতবারের ব্যর্থতার কারণ। আটজন বন্ধু যাবে মৃত্যুকে হাতে নিয়ে যুদ্ধে। কে ফিরবে, কে ফিরবে না—কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া প্রীতি ওখানেই আত্মাহুতি দিতে দৃঢ়সংকল্প। এবারের যাত্রায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাই না এসে থাকতে পারলাম না!" মাস্টারদা, তারকেশ্বর দস্তিদার ও বিপ্লবীসাথীরা নানাভাবে যুক্তি দিয়ে প্রীতিলতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি যাতে ইচ্ছামৃত্যু বরণ না করেন। প্রীতির যুক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের কাছে সকলেই হার মানলেন।

প্রীতিলতা বললেন, "আমি রামকৃষ্ণদার (শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—আমি তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে যাবো। এবং অ্যাকশনের জায়গায় প্রাণ বিসর্জন দেবো। তা ছাড়া আমার পক্ষে পলাতক জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কারণ আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনাদের মূল্যবান জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা আমি হতে দিতে পারি না।"

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের বিষয়ে প্রীতিলতা তাঁর ডায়েরীতে 'ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পূর্বে মাস্টারদা, শিরোনামায় লিখেছেন, "১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে এক গুপ্ত আস্তানায়। পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপর নৈশ আক্রমণ করা হবে। এর জন্য দলের সাহসী ও বিচক্ষণ কর্মীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। এই দিনের সকল কার্যের নেতৃত্ব করতে হবে আমাকে।

আমি মাস্টারদাকে বললাম, 'মাস্টারদা, জীবনের এই শুভক্ষণটির জন্যই প্রহর গুনেছি। আজ আমার জীবনের যে শুভ প্রভাতের সূচনা আপনি করলেন, তার জন্য মৃত্যুর স্নেহশীতল স্পর্শেও আমার হৃদয় থেকে আপনার জন্য সঞ্চিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা মুছে যাবার নয়। কিন্তু মাস্টারদা, আমি যে অনুবর্তী কর্মী হয়েই কাজ করতে চাই। নায়িকার ভূমিকায় আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন?'

মাস্টারদা দৃঢ় অথচ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'বাংলার ঘরে ঘরে বীর যুবকদের আজ আর অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে কালারপুল পর্যন্ত এঁদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও এবার যে শক্তির খেলায় মেতেছে ইতিহাসের সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেছে। তোমার সাফল্যে বা তোমার আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে উঠুক—এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক যে, এ দেশের মেয়েরাও আজ আর পিছিয়ে নেই।'

মাস্টারদা প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ পথে দূরের ওই পায়ে-চলা পথের দিকে বারে বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। প্রশ্ন করলাম, 'কারো কি আসার কথা, মাস্টারদা?' মাস্টারদা বাইরে দৃষ্টি রেখেই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার সাথে এ কাজে যারা যাবে, তাদেরই প্রতীক্ষা করছি'।"

বিপ্লবীদের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। সময়—সন্ধ্যে প্রায় সাতটা। সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে

দিয়েছে। একটি ঘরে মা-কালীর ছবি দিয়ে আসন সাজানো হলো। তাতে পূজার উপাচার হিসাবে রয়েছে—রাইফেল, বোমা, রিভলবার ও তরবারি প্রভৃতি। বিপ্লবীরা স্নান সেরে মায়ের আসনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পবিত্র মনে রক্তজবা হাতে নিয়ে তাঁরা মায়ের পুজো দিলেন। এতে এক শুচি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

এ পুজোয় পৌরোহিত্য করলেন মাস্টারদা। তিনি প্রাণভরে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। পরিশেষে মাস্টারদা বললেন, "প্রীতি দু' ঘণ্টার মধ্যে আত্মাহুতি দিতে দৃঢ়সংকল্প। আমি আশা করি, প্রীতির দৃঢ়তা সবার মনে বল সঞ্চার করবে। প্রীতি শহিদ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে।"

আটজন বিপ্লবী মায়ের পুজো সাঙ্গ করে নানাভাবে সাজলেন। প্রীতিলতার পরনে মালকোঁচা দেওয়া ধুতি ও পাঞ্জাবি। চুল ঢাকা দেওয়ার জন্য মাথায় সাদা পাগড়ি। পায়ে রবার সোলের জুতো। কেউ দেখলে মনে করবে পাঞ্জাবীর ছেলে। এ পোশাক পরার কারণ হলো—পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছাকাছি পাঞ্জাবীদের কোয়ার্টার। পাঞ্জাবী পাড়া দিয়ে প্রীতিকে যেতে হবে বলেই পোশাকও সেইভাবে নেওয়া হয়েছে।

কালীকিঙ্কর দে, বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও শান্তি চক্রবর্তীর পোশাক ধুতি ও শার্ট।

আক্রমণের প্রাক্কালে লুঙ্গি ও শার্ট পরে সজ্জিত হলেন—মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে ও পান্না সেন।

প্রীতিলতা ও কালীকিঙ্কর ছাড়া অন্য বিপ্লবীদের গায়ে চাদর জড়ানো। তাঁদের রাইফেল ও তরোয়াল চাদরের তলায় ঢেকে রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা।

বিদায় আসন্ন। মাস্টারদার সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন—প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, কালীকিঙ্কর দে, শান্তি চক্রবর্তী, বীরেশ্বর রায়, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস। মোট আটজন।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে এবার শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর স্থলে প্রীতিলতা আক্রমণকারী বিপ্লবী দলটিকে নেতৃত্ব দেবেন। প্রীতিলতা ছাড়া অবশিষ্ট সাতজন বিপ্লবী গতবার শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মা-কালীর আসন থেকে দুটি রিভলবার তুলে নিয়ে মাস্টারদা প্রীতিলতা ও কালীকিঙ্করের হাতে তুলে দিলেন। নল কেটে ছোট করা তিনটি রাইফেল তিনজন বিপ্লবীর হাতে তুলে দিলেন। শান্তি চক্রবর্তীকে দিলেন একটি তরবারি। যাঁরা রাইফেল পেলেন না তাঁদের সঙ্গে রইলো হাতবোমা। তাছাড়া শান্তি চক্রবর্তীকে কৃপাণের সাথে হাতবোমা দেওয়া হলো। বীরেশ্বর রায়কে দেওয়া হলো রিভলবার।

মাস্টারদার পদধূলি নিয়ে প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা যথাসময়ে বের হয়ে পড়লেন। বিপ্লবীদের হেড্‌কোয়র্টার্‌স্ কাট্টলী গ্রাম। আশ্রয়দাতা হলেন, কাট্টলী গ্রামের যোগেশ মজুমদার। বিপ্লবীদের দেওয়া তাঁর গোপন নাম 'জয়দ্রথ'। তিনি ইউরোপীয়ান ক্লাবে বেয়ারার পদে কাজ করেন। তিনিই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বুঝে গোপনে আলোর সংকেত দেবেন। আলোর সংকেত পেলে বিপ্লবীরা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

কাট্টলী গ্রাম থেকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার।

অন্ধকারে মাঠ পার হয়ে তাঁরা ক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছলেন। সামনেই ছোট পাহাড়। বিপ্লবীদলটি পাহাড়ের ঝোপের আড়ালে এসে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছেন। বিপ্লবীরা এখন আলোর সংকেতের প্রতীক্ষায়।

প্রীতিলতা শান্তি চক্রবর্তীকে ক্লাবের আশপাশের জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে পাঠালেন ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ইংরেজদের হত্যার উদ্দেশ্য হলো—চট্টগ্রাম, হিজলী, জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় নির্মম বৃটিশ অত্যাচারের বদলা। অর্থাৎ মারকা বদলা মার।

প্রীতির নির্দেশে শান্তি চক্রবর্তী ক্লাবের পরিস্থিতি দেখার জন্য চলে গেলেন। মন আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে। ঝোপের আড়ালে প্রীতির পাশে বসে আছেন কালীকিঙ্কর দে। দু'জনেই নীরব। প্রীতি ভাবী আক্রমণের কথা ভেবে চলেছেন।

কিছুক্ষণ পর শান্তি চক্রবর্তী দূর থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাব পরিদর্শন করে ফিরে এসে প্রীতিলতাকে বললেন, "দশ মিনিট আগে টহলদারি সৈন্যেরা সঙ্গিন উঁচিয়ে ক্লাবের সীমানা পার হয়ে চলে গেছে।"

যোগেশ মজুমদার (জয়দ্রথ) আলোর সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে গেলেন।

বিপ্লবীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনদিক থেকে ক্লাব আক্রমণ করতে গেলেন। পুবদিকের প্রধান গেট দিয়ে ঢুকলেন –প্রীতিলতা, শান্তি চক্রবর্তী ও কালীকিঙ্কর দে। সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী গেলেন ক্লাবের দক্ষিণের দরজা দিয়ে। বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস এগিয়ে গেলেন ক্লাব ঘরের উত্তরের খোলা জানালার দিকে। বিপ্লবীরা পলকেই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণের জন্য পজিশন নিলেন।

শান্তি চক্রবর্তী সর্বপ্রথম হাতবোমা ছুঁড়ে আক্রমণের সূত্রপাত করলেন। উদ্বোধকের বোমার শব্দে বিপ্লবীরা যেন উদ্বোধন-সঙ্গীতের সুর শুনতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবের তিনদিক থেকে হাতবোমা, রাইফেল ও রিভলবার ছুঁড়তে থাকেন। বোমা ও গোলাগুলির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। বিপ্লবীদের অতর্কিত আক্রমণের জবাব মরিয়া হয়ে ইংরেজ নারী-পুরুষেরাও দিতে লাগলেন। তাঁরা ...তের কাছে যে যা পেলেন তা ছুঁড়তে লাগলেন। কেউ ছুঁড়লেন মদের বোতল। আর কেউ ছুঁড়লেন চায়ের কাপ, গ্লাস ও চেয়ার ইত্যাদি। কেউ কেউ 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। ক্লাবে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল। তাঁরা পাল্টা আক্রমণ করলেন। মিলনক্ষেত্র রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হলো। আহত হয়ে অনেকে আর্তনাদ শুরু করলেন।

একজন মিলিটারি অফিসার তাঁর রিভলবার দিয়ে প্রীতিলতাকে আক্রমণ করেন। ফলে প্রীতির বামপাশে গুলির আঘাত লাগে। সেই আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল কম। ক্লাব আক্রমণ শেষ করে ফেরার সময় কালীকিঙ্কর দেখলেন, প্রীতির পরনের জামা রক্তে লালে লাল। মনে হচ্ছে, প্রীতি যেন হোলি খেলে ফিরছে।

তিনদিক থেকে আক্রমণ চালানোর ফলে ক্লাবঘর ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ঘরের ভেতর কতোজন মৃত এবং আহত হয়ে পড়ে রইলো বিপ্লবীরা তা জানতে পারলেন না।

প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর প্রকৃতি রাজ্যে যে ছবি এঁকে যায় তেমনি কেট্‌লি, ট্রে, চায়ের কাপ-প্লেট, মদের বোতল, সোডার বোতল, চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা এবং দেয়ালগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এক তাণ্ডবের ছবি ক্লাব-ঘরটি বুকে ধারণ করে আছে। আহতেরা কাতরাচ্ছে। প্রীতিলতার নির্দেশে আক্রমণ শেষে বিপ্লবীদলটি স্থান ত্যাগ করলো। বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিলতা বেশ কিছুদূর এগিয়ে এলেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী প্রীতলতা তাঁর নিজের কাছে সযত্নে রাখা পটাশিয়াম-সায়ানাইড মুখে পুরে দিলেন। প্রীতিলতার পা আর চলে না। প্রীতিলতা কালীকিঙ্করকে তাঁর রিভলবারটি দিয়ে দিলেন।

প্রীতিলতা কালীকিঙ্করকে বললেন, "কালীদা, আপনার সায়ানাইড টুকু আমাকে দিন। আমার টুকু আমি খেয়েছি।" এই বলেই প্রীতিলতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কাট্টলী গ্রামের গোপন আস্তানা থেকে প্রীতির নেতৃত্বে বিপ্লবীদলটি যখন রাতের অন্ধকারে ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন তখন মাস্টারদা এক বাণ্ডিল প্রচারপত্র দিয়ে তাঁদের সঙ্গে দীনেশ চক্রবর্তীকেও পাঠিয়ে ছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশে দীনেশ চক্রবর্তী নিরাপদ দূরত্বে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নোটিশ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তার কারণ হলো—ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ হলে তিনি বোমা ফাটার শব্দ শুনতে পাবেন। বোমার শব্দ পেলেই তিনি বিজ্ঞাপনের বাণ্ডিলটি নিয়ে গিয়ে শহরের বিপ্লবী ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে দেবেন।

ক্লাব আক্রমণের শুভসূচনা হিসাবে আক্রমণকারী বিপ্লবীরা বোমা ফাটালেন। বোমা ফাটার শব্দ শুনে দীনেশ চক্রবর্তী চলে এলেন নিত্যগোপাল চৌধুরীর বাসায়। নিত্যগোপাল চৌধুরীর বাসা চট্টগ্রাম শহরের পাথরঘাটা অঞ্চলে। সেখানে অপেক্ষা করছেন শান্তিরঞ্জন সেন (বর্তমানে বিপ্লবতীর্থ স্মৃতি সংস্থার সহসভাপতি। কলকাতা সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক।) ও নরেন্দ্র দাস। দীনেশ চক্রবর্তীর কাছে তাঁরা জানতে পারলেন, ইউরোপীয়ান ক্লাব বিপ্লবীরা আক্রমণ করেছে। দীনেশ, শান্তি ও নরেন্দ্র এক বাণ্ডিল প্রচারপত্র নিয়ে দেয়ালে সাঁটানোর জন্য রাত দশটার পর বের হয়ে পড়লেন।

তিনজন বিপ্লবী মিলে থানার পেছনের দেয়ালে ক্লাব আক্রমণের প্রথম বিজ্ঞাপনটি আঠা দিয়ে লাগালেন। তারপর একটি ইস্তাহার তাঁরা লোটাস সিনেমার কাছে এক চায়ের দোকানের দেয়ালে সাঁটাতে লাগলেন। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দোকানিরা টের পেয়ে বের হয়ে এলো। দু'জন দোকানদার শান্তি সেনকে পাকড়াও করলো।

শান্তির বয়স বছর সতের। চট্টগ্রাম কলেজে আই. এ. পড়েন। সুদর্শন যুবক। ফরসা। দোকানি দু'জন মুসলমান গুণ্ডা। শান্তিকে তারা অশ্লীল প্রস্তাব দিলো।

দীনেশ চক্রবর্তী ভাবলেন, অবস্থা ঘোরালো। মাত্র একশ মিটার দূরে থানা। কার্ফিউ। দু'জন বিপ্লবী, গুণ্ডা দুজনকে আক্রমণ করে অতি সহজে শান্তিকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু কাছে থানা থাকাই বিপদ্। হঠাৎ দীনেশ চক্রবর্তীর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। গুণ্ডাদের টাকার লোভ দেখালেন তিনি। তাতে মন্ত্রের মতো কাজ হলো। শান্তিকে গুণ্ডাদের কবল থেকে উদ্ধার করে তিনজন বিপ্লবী আন্দরকিল্লা, রহমতগঞ্জ, চকবাজার, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম কলেজ ও খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় দেয়ালে দেয়ালে প্রচারপত্র

লাগালেন। বিজ্ঞাপনগুলি লাল কালিতে ছাপানো। প্রচারপত্র গুলো দেয়ালে লাগাতে গিয়ে শান্তি সেনের দেহময় আঠা লেপটে গেছে কাজ করার আনন্দে তিনি বিভোর। শেষ রাতে তাঁরা বাসায় ফিরলেন।

কোয়েপাড়া ইস্কুলে পড়ার সময় বিনয় সেন শান্তিরঞ্জন সেনকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁর বাড়ি পটিয়া থানার গৈরলা গ্রাম। মাস্টারদা ও অন্যান্য আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সঙ্গে নানা সাংগঠনিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ইস্তাহার বিলির পরদিন তাঁর বাড়িতে পুলিশ আসে। পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ তাঁকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়। গৃহবন্দী হন। ১৯৩২ সালের শেষ দিকে গ্রেপ্তার হন। জেলে ছিলেন পাঁচ বছর।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার বিপ্লবীদের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়ে দিয়ে কাটলী গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ক্লাব আক্রমণের পর প্রীতিলতা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। তারপর সাতজন বিপ্লবী দু' দলে বিভক্ত হয়ে প্রফুল্ল দাসের বাড়ি কাটলী গ্রাম ফিরে এলেন। প্রফুল্ল দাসের জিম্মায় রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও তরোয়াল প্রভৃতি রেখে পান্না সেন ও বীরেশ্বর রায় চট্টগ্রাম শহরে ফিরে গেলেন। কালীকিঙ্কর দে, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী ও মহেন্দ্র চৌধুরী গেলেন 'বন্দর' গ্রামে। 'বন্দর' গ্রামের এক আশ্রয়কেন্দ্রে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর ক্লাব আক্রমণের খবরের জন্য অধীর হয়ে আছেন।

ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযান প্রীতিলতার নেতৃত্বে সফল হয়েছে। আক্রমণ শেষে বিপ্লবীরা সকলেই ফিরলেন। কিন্তু প্রীতিলতা হারিয়ে গেলেন। প্রীতির মৃত্যুতে মাস্টারদা কত আঘাত পেয়েছেন তা তাঁর লেখায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মাস্টারদা লিখেছেন, "স্নিগ্ধ সুষমায় ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে এই দীন পূজারীর কাছে এসেছিল মায়ের চরণে অর্ঘ্য হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পূজারীকে কত বড়ই সে মনে করেছিল, কত বড় শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল মায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য! পূজারী ফুলটিকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেছে, তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, সৌরভে মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তার যাওয়ার ব্যাকুলতা দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে, শেষে মায়েরই চরণে তাকে অঞ্জলি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে। সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, মা তাকে কত যত্ন কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন!

পূজারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন আজ ফুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্ত্বটুকু নষ্ট করে না ফেলে।"

[চট্টগ্রাম ঃ বিপ্লবের বহ্নিশিখা—২৮৮ পৃঃ]

প্রচণ্ড সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের সশস্ত্র ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা ভারতে প্রচারিত হতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকার ভাষায় ঃ

২৪-৯-৩২ তারিখে রাত্রিতে পাহাড়তলী-ক্লাব আক্রান্ত হয়। সেখানে তখন whist drive খেলা চলিতেছিল। প্রায় ৪০ জন মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিল। রাত্রি দশ ঘটিকার

সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়া ধুমাচ্ছন্ন হয়। ঘরের বারান্দা ও অন্যান্য দিক হইতে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। মিসেস সলিভান্ হত ও ১১ জন আহত হয়।
কিছুদূরে পুরুষবেশে সজ্জিতা একজন রমণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই রমণী প্রীতিলতা বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। ডাক্তার ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার কয়েকটি আঘাত সাংঘাতিক এবং অনেকগুলি গুরুতর। প্রীতিলতা 'সাইনেড অব পটাশিয়াম' যোগে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন।...তাহার পোষাকের মধ্যে যে ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় তাহাতে সে লিখিয়াছে যে ১৮-৪-৩০ তারিখের সংগ্রামের অনুসরণেই এই সংগ্রাম করা হয়। (The raid was an act of war undertaken in continuation of the fight of 18.4.30).
সেইদিনই চারি রকমের বিপ্লব-সমর্থক ইস্তাহার চট্টগ্রামে বিলি করা হয়। তাতে শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণকে ইংরেজ—শাসন ও ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়।

['পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত]

প্রীতিলতার মৃতদেহ তল্লাশিতে পাওয়া বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া গেলো।
"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !"
"আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি'র চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক। এ বাহিনীর মহান্ আদর্শ হলো আমার মাতৃভূমিকে অত্যাচারী, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কবল থেকে মুক্ত করে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করা।
এই বিখ্যাত চট্টগ্রাম শাখার সাফল্য কেবল বাংলার নয় সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কল্পনাশক্তিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের অবিস্মরণীয় ঘটনা, পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়ের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম এবং তার পরবর্তী সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্যসমূহ তাদের প্রেরণা দিয়েছে। এরূপ একটি গৌরবময় দলের সভ্য হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি।
আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। আজকের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সেই চলমান স্বাধীনতা যুদ্ধেরই একটি অংশ। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতের রক্তমোক্ষণ করে তারা ভারতবর্ষকে রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলেছে। এ বিষয়ে তারা নারী-পুরুষ উভয়কেই শোষণ করেছে। তারাই আমাদের নৈতিক, দৈহিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের একমাত্র কারণ। এবং তারা প্রমাণ করেছে যে তারাই আমাদের দেশের সবচেয়ে ঘৃণ্যতম শত্রু, আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাই আমরা বাধ্য হয়েই সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী নির্বিশেষে সকল ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি, যদিও কোন মানুষের জীবন সংহার করা একেবারেই আনন্দজনক কাজ নয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে কোন বাধাকে, যে কোন উপায়ে দূর করার জন্য আমাদের

অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে।

আমি যখন, আমাদের দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মহান মাস্টারদার কাছ থেকে আজকের সশস্ত্র অভিযানে যোগ দেবার জন্য আহ্বান পেলাম তখন আমি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলাম। আমি দেখতে পেলাম এতোদিনের বহু প্রত্যাশিত অভীষ্টসিদ্ধ হতে চলেছে। অবশেষে আমি পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে এই কর্তব্যভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু সেই মহান নেতা যখন আমাকে এই অভিযানে নেতৃত্ব করতে বললেন তখন আমি আত্মশক্তিতে সংশয় প্রকাশ করলাম। আমি এই বলে আপত্তি জানালাম, এতো যোগ্য ও অভিজ্ঞ ভাইয়েরা থাকতে আমার মতো একটি বোনকে কেন এ দায়িত্ব দিতে চাইছেন? মাস্টারদা তখুনি তাঁর অকাট্য যুক্তির সাহায্যে আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমি আমার নেতার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। আমার আশৈশব পূজিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তিনি যেন আমার এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমাকে সাহায্য করেন।

আমি মনে করি, আমি দেশবাসীর কাছে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত একটি মেয়ে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছে শুনলে চমকে উঠবেন। কিন্তু আমার বিস্ময় জাগে এই ভেবে, মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সংগ্রামে নারী-পুরুষের মধ্যে তারতম্য কেন থাকবে? চিরস্মরণীয় রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সঙ্গে রণাঙ্গনে সংগ্রাম করেছেন এবং দেশের শত্রুদের হত্যা করতে ইতস্ততঃ করেননি—এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই সব মহীয়সী নারীদের বীরোচিত কার্যকলাপের প্রশস্তিতে ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তবে আমরা, আধুনিক যুগের ভারতীয় নারীরা বিদেশীর দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার মহান সংগ্রামে যোগদানে বঞ্চিত হব কেন? যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বোনেরা ভাইদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে তবে বিপ্লবী আন্দোলনের অংশভাগী হবার অধিকারী তারা কেন হবে না? এর কারণ কি এই যে, দুটো আন্দোলনের ধারা ভিন্ন, না মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণের যোগ্য নয়? সশস্ত্র বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যায়, এ পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। বহু দেশে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাফল্য লাভ করেছে। এবং তাতে নারীরা শ'য়ে শ'য়ে যোগদান করেছে। তবে কেন শুধু ভারতবর্ষেই এই পদ্ধতিকে জঘন্য বলে মনে করবে? যোগ্যতার কথা যদি ধরা হয় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীকে সর্বদা পুরুষের চেয়ে দুর্বল ভাবা কি পুরাদস্তুর অন্যায় কাজ নয়? ভ্রান্ত ধারণা দূর করার সময় এসেছে। যদি তারা এখনও কম যোগ্য বিবেচিত হয়, তা হলে তার কারণ, তাদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

নারীরা কঠোর সংকল্প নিয়েছে যে তারা আর পেছনে পড়ে থাকবে না। এবং সংগ্রাম যতই দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক হোক না কেন ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আমার বোনেরা নিজেদের দুর্বল মনে করবেন না, সমস্ত ঝুঁকি ও সংকটের মুখোমুখি হতে নিজেদের প্রস্তুত করবেন এবং হাজারে হাজারে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবেন।

এখন, আমি কি করে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলাম তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করবো। ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময় আমি চট্টগ্রামে একটি

বিপ্লবী সংগঠনের আভাস পাই। জানতে পেরেছিলাম - বিপ্লবী নেতৃত্বের উপযুক্ত বহুগুণ-সম্পন্ন একজন শক্তিধর মানুষ এই সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছেন।

ঢাকায় দু বছর ইণ্টারমিডিয়েট পড়াকালীন মহান মাস্টারদার যোগ্য সহকর্মীরূপে নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য আমি সচেষ্ট হয়েছিলাম। তৎসত্ত্বেও পড়াশুনায় আমি অবহেলা করি নি। ১৯৩০ সালে ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে সকলের মধ্যে পঞ্চমস্থান অধিকার করে আমি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।

১৯৩০ সালের ১৯ এপ্রিল সকালবেলা। আমি যখন পরীক্ষার পর বাড়ি ফিরে আসি তখন চট্টগ্রামের বীরদের (গত রাতের) গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা শুনতে পাই। এই মহান বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ অপূর্ব কার্যে আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না এবং যে মাস্টারদার নাম শোনার পর থেকেই আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে একবার ক্ষণিকের দেখাও হলো না বলে খুব ব্যথিত হলাম। জালালাবাদের শহীদদের জন্য আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বেদনা অনুভব করলাম। এই মানসিক অবস্থায় আমি বি. এ. পড়তে কলকাতা চলে গেলাম। তখন স্বদেশের কথা সব সময় আমার মনের প্রধান অংশ জুড়ে থাকতো। যে সব সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই সব প্রিয় সন্তানদের বিচ্ছেদ-বিধুরা জননীদের শোকাশ্রু আমি দেখতে পেতাম।

মনের এই রকম অবস্থায় নতুন উদ্যম পেলাম. যখন আমার এক দাদা (মনোরঞ্জন রায়) আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণদা তখন জেলের একটি নির্জন কক্ষে স্বদেশপ্রেমের অপরাধের জন্যই বৃটিশের চরম দণ্ডের জন্য প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। আমি রামকৃষ্ণদার মাসতুতো বোন বলে নিজেকে পরিচয় দিয়ে যেতাম এবং প্রতিদিনই প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে দেখা করতাম। ফাঁসির আগে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় চল্লিশবার দেখা করেছি। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টি, সহজ কথাবার্তা, মৃত্যুর কাছে প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, সরল ঈশ্বরভক্তি, শিশুসুলভ সরলতা, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান, সুগভীর অনুভূতি আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং আগের চেয়ে আমি দশগুণ বেশি তৎপর হই। মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর কোন একটি কার্যকর বৈপ্লবিক অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আমি অত্যন্ত লালায়িত হয়ে উঠলাম। তথাপি, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য আরো ন' মাস কলকাতা থাকতে হয়। এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যর্থ হই।

১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে কোন প্রকারে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘদিনের লালন পালন করা বাসনা পূর্ণ হলো। এবং বিখ্যাত চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের দুই মহান নেতা মাস্টারদা ও নির্মলদার সামনে শীঘ্রই উপস্থিত হলাম।

নির্মলদার সঙ্গে অল্প ক'দিনের আলাপেই আমি উপলব্ধি করেছি, তাঁর মহান ও সৌন্দর্যে ভরা অন্তঃকরণ। সেই হৃদয়ে প্রবল ধর্মবোধের এক সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল। আমার

সৌভাগ্য, এমন একজন মহাত্মার সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। তিনি যে কত মহান, কত পবিত্র ও কী অনন্যসাধারণ—তা দেশবাসীকে জানানোর কোন সুযোগ না দিয়েই নীরবে নিভৃতে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

নির্মলদার বিষাদময় মৃত্যু আমাকে নিদারুণ আঘাত দেয় এবং আমি আরো মরীয়া হয়ে উঠি। এই সময় আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল বের হলো। আমি ডিস্টিংশনে পাস করি। এর কিছুদিন পরেই আমার প্রিয় পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের চিরতরে বিদায় দিয়ে এসে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে সমস্ত অন্তঃকরণ সঁপে দিলাম।

শৈশব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস এবং অবিচল ভক্তি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ আমি সমগ্র জীবন আমার বক্ষে সস্নেহে পোষণ করে এসেছি। এবং আমি যখন আজ চিরবাঞ্ছিত ঈশ্বরপদ লাভের জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছি, তখন আমার এই সম্পদ যেন আরো বহুমূল্য, আরো আনন্দময়, আরো জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে। আমার বৈপ্লবিক আদর্শ, আমার ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে যদি সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে না পারতো তা হলে আমি কখনও বিপ্লবী হতে পারতাম না।

ঈশ্বরের প্রতি সনির্বন্ধভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে আমি আজকের দায়িত্ব সম্পাদন করতে চলেছি। এবং কামনা করছি, তিনি যেন আমাকে মলিনতা মুক্ত করে পবিত্র করে তোলেন, যাতে আমি তাঁর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার যোগ্য হতে পারি।"

ইংরেজ সরকারের সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিয়ে বিপ্লবীরা পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ করে নিমিষে উধাও হয়ে গেলেন।

ইংরেজ সরকার বিচলিত। পুলিশ ও ফৌজ ভীষণভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। শহরে ও গ্রামে ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছে। সরকার বুঝতে পেরেছেন সূর্য সেনকে ধরতে না পারলে এই বিদ্রোহ দমন করা যাবে না। শত চেষ্টাতেও ইংরেজ সরকার সূর্য সেনকে বন্দী করতে পারছেন না।

প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল তার একটি তালিকা 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় ছাপা হয়—প্রীতিলতার সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে (১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের তিনটি ফটো (২) ছয় কপি ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির নোটিশ (৩) পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান (৪) শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি। (৫) একটি চামড়ার বেল্ট (৬) তিনটি কার্তুজ (৭) একটি Whistle (৮) তিনটি রিবন্ (৯) তাহার স্বহস্তে লিখিত একটি বিবৃতি।

['পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত]

প্রীতিলতার ইচ্ছামৃত্যুর পর পুলিশ প্রীতির কাছে যা পেয়েছে তা সরকারি হেফাজতে চলে গেলো। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার 'চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা' বইয়ের ভূমিকায় প্রীতিলতা সম্বন্ধে লিখেছেন, এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবের বিবরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এই মামলায় সংশ্লিষ্ট একজন সরকারী উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কথাপ্রসঙ্গে প্রীতিলতার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন: পুলিশ অফিসে রক্ষিত সূর্য সেনের নিকট প্রীতিলতার লিখিত কয়েকখানি চিঠিতে পুনঃপুনঃ তাহার একটি

কথার উল্লেখ দেখতে পাই—'আপনি আমার জন্য ভাবনা বা ভয় করিবেন না। আমার বুকের মধ্যে যিনি আছেন তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন।' বারবার 'বুকের মধ্যে'— এই কথাটি চিন্তা করিয়া আমার মনে কৌতূহল জাগে। প্রীতিলতার আত্মহত্যার সময় তাহার গায়ের জামা পুলিশের হেফাজতে ছিল—আমি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য গেলাম। দেখিলাম, জামার অভ্যন্তরে সেলাই করা কৃষ্ণের ছোট একখানি ছবি। তখন বুঝিলাম, আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঠিক—ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই পূর্বোল্লিখিত উক্তিটির অর্থ।"

ইংরেজ রথী মহারথীদের কপালে শেষ পর্যন্ত মেয়েছেলের মার! এ অসহ্য। যীশুর অপার করুণায় ক্লাবে উপস্থিত সকলেই যে মারা পড়েনি তাই রক্ষে। গুলি খাওয়া বাঘ যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে তেমনি ইংরেজ সরকারও রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। ঢালাও আদেশ—হিন্দুর ছেলে যাকে পাবে তাকে ধর। যুবকগুলোর বড় বাড় বেড়েছে। এদের পিটিয়ে সোজা করতে হবে।

ইংরেজ সরকার হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সৈন্যদল উঠেপড়ে লেগে গেলো। চট্টগ্রাম শহরে অনেক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। সুধাংশু সরকার তাদের মধ্যে একজন। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরদিন রাত সাড়ে আটটায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অপরাধ—তিনি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের সঙ্গে জড়িত। একজন যুবক বন্দী হবার পর মারের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশের কাছে সুধাংশু সরকারের নাম করে বসলো।

সুধাংশু সরকারকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। পুলিশের বড় কর্তা সুধাংশু সরকারের জবাবে খুশি হতে পারলেন না। শুরু হলো পুলিশী নির্যাতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেটাতে পেটাতে পুলিশের হাত ব্যথা হয়ে গেলো। তারপর সবুট লাথি। তাতেও পুলিশের কর্তা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এরপর আদেশ হলো- "উপুড় করে শুইয়ে পিঠের ওপর পুলিশ বুট সমেত বারবার হাঁটবে। যতোক্ষণ স্বীকার করবে না ততোক্ষণ এই শাস্তি বহাল থাকবে।"

হুকুম তামিল হলো। সুধাংশু সরকারের প্রাণ যায় যায়। রাত দেড়টায় একজন গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর এলেন। তিনি সুধাংশু সরকারের বাবা বিপিনবিহারী সরকারের বন্ধু। বিপিন সরকার তখন মহিরা গ্রামে নিজের বাড়ি গিয়েছেন। পুলিশের হাতে সুধাংশু গ্রেপ্তার হবার খবর পাঠিয়ে আই. বি. ইন্সপেক্টার তার বন্ধু বিপিন সরকারকে চট্টগ্রাম শহরে আনলেন। বাবার বন্ধুর প্রভাবে সুধাংশু সরকার পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

সুধাংশু সরকার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরদিন পরৈকোড়া গ্রামের বীরেশ্বর রায় ধরা পড়লেন। বীরেশ্বর রায় ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি সুধাংশু সরকারের শরীরের বীভৎস দশা দেখে আঁৎকে উঠলেন। সুধাংশু সরকারের মুখ থেকে শুরু করে সমস্ত দেহ ফুলে গেছে। পুলিশী অত্যাচারের চিহ্ন তাঁর সারা শরীরে

বীরেশ্বর রায় সুধাংশু সরকারকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার শরীরের এ দশা কেন ?"
সুধাংশু সরকার জবাব দিলেন, "পুলিশ সারারাত মেরামত করেছে তাই আমার এই হাল।"
পুলিশ ও সেনাবাহিনীর এতো তৎপরতা সত্ত্বেও প্রীতিলতার সঙ্গে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। ক্লাব আক্রমণকারীরা যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। বিপ্লবীদের কাছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ট্রেনিং প্রাপ্ত পুলিশেরাও হার মানলো। এমন কি সন্দেহ করে থানায় ধরে আনা অনেক যুবককে পিটিয়েও কোন কথা ফাঁস করা গেলো না।
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পর দলে নূতন সদস্য সংগ্রহের ব্যাপারে মাস্টারদা খুব সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কেসে এবং বিনাবিচারে ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীরা একে একে বন্দী হলেন। পুলিশের নির্মম অত্যাচারেও তাঁরা মুখ খুললেন না। ফলে ইংরেজ সরকার ক্লাব আক্রমণকারীদের কোন হদিস পেলেন না। ক্লাব আক্রমণকারীদের নাম ইংরেজ সরকারের কাছে চিরদিনের মতো রহস্যাবৃত হয়ে রইলো।
ইংরেজ সরকার গোঁ ধরেছে, যেমন করেই হোক বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে হবে। কল্পনা দত্ত তখনো চট্টগ্রাম জেলে বন্দী। কল্পনা দত্ত জেলে বসে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের খবর পান। এবং হিন্দু যুবকদের থানায় এনে পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচারের খবরও তিনি সংগ্রহ করেছেন। কল্পনা দত্ত তাঁর 'স্মৃতিকথা' বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন "পাহাড়তলী আক্রমণ উপলক্ষ্য করে প্রায় ৮৪ জনকে পাকড়াও করা হয়। প্রমাণাভাবে কোন মোকদ্দম খাড়া করা যায়নি।

কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তার বাড়ি শ্রীপুর। তিনি বিপ্লবীদলের সদস্যা। শ্রীপুর গ্রামটির পাশ দিয়ে কর্ণফুলি নদী ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। এ গ্রামে সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠন জোরদার। কল্পনা শ্রীপুর গ্রামেরই মেয়ে। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি ফেরার।
বর্ষণ মুখর সন্ধ্যে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। রাতের গাঢ় অন্ধকারে সময় সময় বিদ্যুতের ঝলকানি। একজন পলাতক বিপ্লবী আসার প্রতীক্ষায় কুন্দপ্রভা প্রহর গুনছেন। ফেরার বিপ্লবীটি কুন্দপ্রভার আশ্রয়ে ক'দিন থাকবেন।
বিপ্লবীদের চলার পথ মোটেই মসৃণ নয়। দুর্যোগঘন রাতে বিপ্লবীকে আশ্রয়ের আশায় পা বাড়াতেই হবে। সংসারের সুখময় জীবন আর প্রিয়জনের প্রীতির বন্ধন বিপ্লবীদের জন্য নয়। তাঁদের পথ চলতেই হবে।
বর্ষার রাতে কুন্দপ্রভার বাড়ির সবাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কুন্দপ্রভার চোখে ঘুম নেই। তিনি খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।
বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ নজরে পড়লো একজন লোক ছাতা মাথায় কুন্দপ্রভার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কুন্দপ্রভা ঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে এলেন। বিপ্লবী ভদ্রলোক কুন্দপ্রভার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।
হেঁশেলের ভার কুন্দপ্রভাব ওপর। তাঁর কাকা ও কাকীমা লাকসাম গেছেন। ঘর ফাঁকা। সব দিক থেকে বিপ্লবীকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ। তার ওপর কুন্দপ্রভার

মা পরদিন সকালে তাঁর বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা।

বিপ্লবীকে কাকীমার ঘরে রেখে কুন্দপ্রভা বাইর থেকে দরজায় তালা দিয়ে দিলেন। দু'দিন পর কুন্দপ্রভার মা তাঁর বাপের বাড়ি থেকে ফিরলেন। তারপর একদিন ভাতের থালা আঁচলে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলেন।

কুন্দপ্রভার মা কুন্দপ্রভাকে বললেন, "আমি সব বুঝতে পেরেছি। ওকে বিদায় কর। নতুবা সমূহ বিপদ্।"

বিপ্লবীটি রাতের অন্ধকারে এসেছিলেন। কুন্দপ্রভার মায়ের চাপে পড়ে রাতের অন্ধকারে অভুক্ত অবস্থায় চলে গেলেন। মায়ের বুকেও স্নেহ নেই। এই তো বিপ্লবী জীবন। তবুও বিপ্লবীদের পথ চলাতেই আনন্দ।

কিছুদিন পর এক গভীর রাতে কুন্দপ্রভা মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লেন। সঙ্গে শ্রীপুর গ্রামের আঞ্চলিক নেতা মণীন্দ্র মজুমদার।

বর্ষাকাল। পথ কর্দমাক্ত। নৈশ অভিযানে পথ চলতে কুন্দপ্রভার পা বার বার পিছলে যাচ্ছে। পড়বার সময় মণীন্দ্র মজুমদার কুন্দপ্রভার হাত ধরে ফেললেন।

মণীন্দ্র মজুমদার কুন্দপ্রভাকে বললেন, "শরীরটা সটান রেখে চলবি। তা হলে পড়বি না।"

দীর্ঘ পথ। প্রায় দু ঘণ্টা পর কুন্দপ্রভা বিপ্লবী ঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখেন, যাঁকে তিনি আশ্রয় দিয়ে ছিলেন সেই পলাতক বিপ্লবীই—মাস্টারদা। মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করে রাতেই বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

তারপর কুন্দপ্রভা বন্দী হলেন। তাঁকে ধলঘাট পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে গেলো। বিচারে কুন্দপ্রভার দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

হিন্দুদের বাড়ি যখন একের পর এক খানাতল্লাশি হতে লাগলো আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা মুসলমান পরিবারে আশ্রয় নেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে বহু মুসলমান পরিবারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শ্রীপুর-হওলা গ্রামের মীর আহম্মদ তাঁদের একজন।

মীর আহম্মদের জন্ম—১৯১৫ সাল। ইস্কুলে পড়ার সময় তিনি বিপ্লবীদলে যোগ দেন। মাস্টারদার খুব প্রিয় ছিলেন। বিপ্লবী সংগঠনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনেক মুসলমান যুবককে তিনি বিপ্লবীদলের সদস্য করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মুসলমান, পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন। মাস্টারদা ও নির্মল সেন তাঁর বাড়িতে বহুবার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

একদিনের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মীরা মীর আহম্মদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। মীর আহম্মদের বৃদ্ধা মা পুত্রতুল্য বিপ্লবীদের অতি যত্ন সহকারে খেতে দিয়েছেন। বৃদ্ধা নিজ হাতে বিপ্লবীদের খাবার পরিবেশন করে চলেছেন। পরিবেশন করাকালীন বৃদ্ধা সখেদে মাস্টারদাকে বললেন, "বাবা, তোমরা অনেকেই আমার বাড়ি এলে। কিন্তু একদিনও সূর্য সেনকে নিয়ে এলে না। আমার খুবই ইচ্ছা তাকে একটি বার দেখি। বুড়ো হয়ে গেছি। কবরে যাওয়ার সময় হয়েছে। মরার আগে সূর্য সেনকে যদি একটিবার দেখে যেতে পারি তবে আমার দিল ঠাণ্ডা হবে। তার কথা লোকের মুখে কতো শুনেছি। তাই তাকে দেখবার এতো ইচ্ছে।...তোমরা কম-সে কম একটিবার তাকে

আমার বাড়িতে নিয়ে এসো।"

মীর আহম্মদের বৃদ্ধা মায়ের একান্ত বাসনার কথা শুনে সূর্য সেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "খালা (মাসীমা), সূর্য সেনের দেখা পাওয়া মুশকিল। সূর্য সেন কখন কোথায় থাকে কেউ জানে না। এমন কি সে সব বাড়িতে যায় না। শুনেছি, সে অনেক দূরে রয়েছে। তবে আপনি যদি আমাদের পেট ভরে তালের বড়া খাওয়ান তা হলে সূর্য সেনের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসবো।"

বৃদ্ধা মাস্টারদার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বৃদ্ধা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমরা একবার তাকে নিয়ে এসো। আমি কবরে যাওয়ার আগে তাকে দেখে যেতে চাই। খোদা মেহেরবান।"

মীর আহম্মদের মা যেন ভারতমাতারই প্রতীক। তিনি তাঁর স্নেহের আঁচল পেতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে চলেছেন। সকল অমঙ্গল থেকে বিপ্লবীরা যাতে রক্ষা পান তারজন্য তিনি খোদার কাছে মুনাজাত করেন। মীর আহম্মদের গ্রেপ্তার হওয়ার পরও বৃদ্ধা খালা বিপ্লবীদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছেন। সংসারে নিদারুণ অভাব। অভাবের মধ্যেও তিনি বিপ্লবীদের খাওয়া ও আশ্রয়ের মোটে ত্রুটি করেন না। ছেলের অসম্পূর্ণ কাজ মা সানন্দে সম্পন্ন করে চলেছেন।

১৯৩৩ সালে মীর আহম্মদ কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। বোড়াল যক্ষা হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। দেশপ্রেমিক মীর আহম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক স্বর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী মীর আহম্মদের মতো রত্নগর্ভা চট্টলার আর এক বীর সন্তান আবদুল সাত্তার। তিনিও মাস্টারদার বিপ্লবীদলে যোগ দেন। তাঁর বাবার নাম ইয়াকুব আলী। ১৯১৭ সালে আবদুল সাত্তারের জন্ম হয়। মাত্র পনর বছর বয়সে এই বীর যুবক মাস্টারদার সান্নিধ্যে আসেন। মুক্তিকামী মানুষ যখন দেশময় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তখন স্বদেশ প্রেমিক আবদুল সাত্তার তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফেরারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া ছাড়াও তিনি বিপ্লবী সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করে চলেছেন।

আবদুল সাত্তার যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শেষ পর্যন্ত তিনি পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। তাই তিনি আর বেশিদিন দেশের কাজ করার সুযোগ পেলেন না। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে, ১৯৩৪ সালের ৯ অক্টোবর তিনি কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৩৮ সালের ১৮ জুন মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি চট্টগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

আবদুল সাত্তার প্রতিভাদীপ্ত পুরুষ। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন, ভাবীকালে তিনি যে একজন জনপ্রিয় নেতা হবেন। এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বিপ্লবীরা যখন একের পর এক হিন্দুদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হতে লাগলেন তখন

মুসলমান আশ্রয়দাতারা বিপ্লবীদের বলতে লাগলেন, "হিন্দুদের মতো আমরা বেইমান নই। পুরস্কারের মোহে আমরা কোন বিপ্লবীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিইনি।"

জামিনে মুক্ত, চট্টগ্রামের পলাতকা কল্পনা দত্ত সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি লেখা হয়েছে দেখা যাক।

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত নিখোঁজ

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত এখনও নিখোঁজ। তাঁহাকে খোঁজ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। পুলিশ তাঁহার পিতার এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আটক করিয়াছে।

[আনন্দবাজার ঃ ৩-২-৩৩]

গেরিলা সংঘর্ষের চার-পাঁচ দিন আগে মাস্টারদা তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে কাশীয়াইস গ্রামের এক গোপন আস্তানায় অবস্থান করছেন। কাশীয়াইস গ্রামের চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে আনোয়ারা গ্রাম। আনোয়ারা রেজিস্ট্রি অফিসে কল্পনা দত্তের জেঠা মশাই সাব্-রেজিস্টার পদে চাকরি করেন। কল্পনা দত্তের একান্ত ইচ্ছে তাঁর জেঠতুতো বোনের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন।

আনোয়ারা রেজিস্ট্রি অফিসের কাছেই থানা। মাস্টারদার নির্দেশে সুশীল দাশগুপ্ত ও কেদারেশ্বর চক্রবর্তী কল্পনা দত্তের চিঠি নিয়ে আনোয়ারা ইস্কুলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন। একটি ছাত্রের মাধ্যমে তাঁরা কল্পনার জেঠতুতো ভাইকে ইস্কুল থেকে ডাকিয়ে আনলেন।

কল্পনার জেঠতুতো ভাইয়ের বয়স দশ-এগারো বছর। তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুশীল দাশগুপ্ত বললেন, "এই চিঠিটি তোমার দিদির হাতে দেবে। তোমার দিদির কাছ থেকে চিঠির জবাব নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আমরা দূরে সরে গিয়ে, মাঠের মাঝখানে বসে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

সুশীল দাশগুপ্ত দেখতে পেলেন একজন লোক দু' হাত তুলে তাঁদের ডাকছেন। সুশীল বললেন, "দেখ কেদার, ছেলেটির পরিবর্তে খাকী হাফপ্যাণ্ট্ পরা আগন্তুকের উপস্থিতি মোটেই শুভ লক্ষণ নয়।"

কেদার বললেন, "সুশীলদা, ওতো কল্পনাদির ভাই নয়। পুলিশ!"

সুশীল হকচকিয়ে গেলেন। তারপর দেখতে পেলেন ইস্কুলের দিক থেকে আরো চার-পাঁচজন পুলিশ তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁরা ছুট দিলেন। পুলিশ তাঁদের পিছু ধাওয়া করলো। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

রাতে কাশীয়াইস গ্রামে পৌঁছে সুশীল মাস্টারদাকে পুলিশের তাড়া খাওয়ার কথা জানালেন।

সুশীলের কাছে সব কথা শুনে মাস্টারদা সেই রাতে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে কাশীয়াইস গ্রাম থেকে বের হয়ে পড়লেন। মাস্টারদার সঙ্গে আছেন—কল্পনা দত্ত,

মণিলাল দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও সুশীল দাশগুপ্ত। রাতের অন্ধকারে তাঁরা গ্রামের পর গ্রাম হেঁটে চলেছেন। প্রায় বারো কিলোমিটার পথ পার হয়ে বিপ্লবীরা রাত দুটায় গৈরলা গ্রামে হাজির হলেন।

গৈরলা গ্রামের জমিদারের ছেলে ব্রজেন সেন বিপ্লবীদলের সদস্য। বিপ্লবীরা ব্রজেন সেনের সঙ্গে দেখা করলেন। ব্রজেন সেন গৈরলা গ্রামের ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি বিপ্লবীদের নিয়ে গেলেন। ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি, বিপ্লবীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্র গুলির মধ্যে অন্যতম।

ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ি মাটির। দোতলা। টিনের ছাউনি। বিপ্লবীরা দোতলায় থাকেন। সময় সময় তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সাল। বিপ্লবীদের ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘ যেন জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। সেদিন দুপুরবেলা ক্ষীরোদপ্রভা বিপ্লবীদের ঘরে রেখে কাছাকাছি কোন কাজে বের হয়েছেন। ঘরের কপাট ভেজানো। সুশীল দাশগুপ্ত ও মণিলাল দত্ত ঘরের ভেতরে বসে আলাপ করছেন। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভেজানো দরজা খুলে গেলো। ভদ্রমহিলা সুশীল ও মণিকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। ভদ্রমহিলার চাউনি দেখে বিপ্লবীদের সন্দেহ হলো।

প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলা ক্ষীরোদপ্রভার খোঁজ করলেন। মহিলাটির বয়স বছর ছত্রিশ। সুশীল দাশগুপ্ত বললেন, "মাসীমা বাড়ি নেই।"

মহিলাটি চলে যাওয়ার পর সুশীল মাস্টারদাকে ঘটনাটি জানালেন। এবং বললেন, "মহিলাটির ভাবভঙ্গী দেখে আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের গোপন আশ্রয়ের খবর প্রকাশ হয়ে পড়বে।"

মণি দত্ত সুশীলের কথা সমর্থন করলেন। বললেন, "মাস্টারদা আমরা কিছুক্ষণ পর পর একজন একজন করে এখুনি বের হয়ে পড়ি।"

মাস্টারদা নীরবে সব কথা শুনলেন। তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। কিছুক্ষণ পর ক্ষীরোদপ্রভা ঘরে ফিরলেন। মাস্টারদা ক্ষীরোদ প্রভার সঙ্গে আলোচনা করলেন।

মাস্টারদা সুশীলকে বললেন, "ভদ্রমহিলার সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রভার পথে দেখা হয়েছে। আলাপ করে যা বুঝলাম, সন্দেহের কোন কারণ নেই। ভর দুপুরে এখান থেকে চলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ফুটুর (তারকেশ্বর দস্তিদার) সঙ্গে রাতে দেখা করে তবেই যাবো।"

তারকেশ্বর দস্তিদার ও কালীকিঙ্কর দে হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের এক আশ্রয়কেন্দ্রে তখন অবস্থান করছেন। গৈরলা থেকে হাবিলাসদ্বীপের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। রাতে মাস্টারদার সঙ্গে তাঁদের দেখা করার কথা।

মাস্টারদা তাঁর প্রিয় অনুগামীদের সঙ্গে মিলিত হতে যে উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করলেন, তার বিষময় পরিণতি তাঁকে মরণ ফাঁদে পা দিতে সাহায্য করলো। এই মহান মানুষটি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। মহিলাটিকে কেন্দ্র করে সুশীল ও মণি যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা যথোপযুক্ত গুরুত্বের অভাবে শত্রুপক্ষের কাছে তিনি হেরে গেলেন। তাঁর একমাত্র ভুল শতসহস্র ফণা তুলে তাঁকে ছোবল মারতে দ্রুতগতিতে

এগিয়ে এলো।

চট্টগ্রামের শহর ও গ্রামে কারফিউ। সেই সান্ধ্য আইনের সুযোগ নিয়ে বিপ্লবীরা রাতে চলাফেরা করেন। রাত ন'টা। গাঢ় অন্ধকার। বিপ্লবীরা গৈরলা আশ্রয়কেন্দ্র হতে দু'জন দু'জন করে বের হয়ে বাড়ির উঠানে এসে হাজির হলেন। ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ি থেকে যাঁরা বের হয়ে এলেন, তাঁরা হলেন—মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, মণিলাল দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও ব্রজেন সেন। ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্ত নিরস্ত্র।

বাড়ি থেকে বের হয়ে, বাড়ির পুর্বদিকের স্বাভাবিক পথ ধরে এগুতে লাগলেন। সবার আগে মাস্টারদা ও সুশীল দাশগুপ্ত। চলতে চলতে সুশীল মাস্টারদার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন। এমন সময় আঁধার ভেদ করে আচমকা একটা শব্দ ভেসে এলো—'হল্ট'। বিপ্লবীরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাস্টারদার নির্দেশে তাঁরা বাড়ির আড়ালে চলে গেলেন। মাস্টারদা বললেন, "টুনুকে (ব্রজেন সেনের ডাক নাম টুনু) ডাকো।"

কিছুটা দূরে ব্রজেন সেন দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রজেন সেন মাস্টারদার কাছে এগিয়ে গেলেন। মাস্টারদা ব্রজেন সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, বাড়ির পশ্চিমদিকের বাঁশবনের ভেতর দিয়ে বের হয়ে যাওয়া নিরাপদ।

কল্পনা ও সুশীল এগিয়ে গেলেন। সামনে বাঁশের ঘেরা। ঘেরা ডিঙাতে হবে। কল্পনা দত্ত বাঁশের ঘেরায় পা রাখলেন। সুশীল তাঁর কল্পনাদিকে দু'হাতে সজোরে ধরে ঘেরা পার হতে সাহায্য করছেন। বাঁশের ঘেরা মড়মড় শব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। জানিয়ে দিলো অত ভার বহনে সে অক্ষম। মিলিটারিরা মড়মড় শব্দ শুনে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রাইফেল থেকে শব্দভেদী বাণ ছুঁড়লো। একটা গুলি সুশীল দাশগুপ্তের বাঁ-হাতের কব্জিতে এসে লাগলো।

'সূর্য সেন স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থে (১৭৯ পৃঃ) 'মাস্টারদা'র স্মৃতি-কথা' প্রবন্ধে কল্পনা দত্ত লিখেছেন, "প্রথমে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি। পরে বুঝলাম, আমরা পুলিশের বেড়াজালের ভেতর পড়ে গেছি। পেছনের দিকে ছুটলাম। দেখলাম, আমার চোখের সামনেই—সামনের ছেলেটি হাতে গুলি খেয়ে পড়ে গেল। আরো কিছুদূর গিয়ে ঝোপের অন্ধকারে মাস্টারদার নাগাল পেলাম। তিনি দেখেই বললেন : পথঘাট তুই চিনবি না, তাই অপেক্ষা করছি।"

রাইফেলের গুলির আঘাতে সুশীল দাশগুপ্ত সংজ্ঞাহীন। তাঁর কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। অপরিচিত জায়গা। ঘোর অন্ধকার। রাতের ঘন আঁধারে আকাশের বুক চিড়ে ঘন ঘন বিজলি ধেয়ে চলার মতো সেনাবাহিনী অবিরাম রাইফেল ফায়ার করছে।

রাইফেলের গুলি বিপ্লবীদের আশপাশ দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে চলেছে। বিপ্লবীরা নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করে এগিয়ে চলার সময় শুকনো পাতায় পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খড়্‌খড়্‌ শব্দ উঠছে। সেই শব্দ শুনে সৈনিকেরা সমানে গুলির স্রোত বয়ে দিচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অজানা পথ চলতে চলতে পা পিছলে মণি দত্ত ও কল্পনা দত্ত পানা ভরা এঁদো ডোবায় পড়ে গেলেন। জলের শব্দ শুনে সেনাবাহিনী আরো অজস্র ধারায় গুলি বর্ষণ শুরু করলো। অন্ধকারে গলা ডুবানো পুকুরের জলে কল্পনা দত্তের সঙ্গে মণিলাল দত্তের দেখা হলো। ফিসফিস করে দু'জনের মধ্যে পরিচয় বিনিময় হলো। তারপর দু'জনে পরামর্শ

করে পানার আড়ালে মুখ লুকিয়ে রাখলেন।

কল্পনা ও মণি দত্ত দেখলেন, রিভলবার ও রাইফেলের অসংখ্য গুলি তাঁদের আলিঙ্গন করার জন্য ধেয়ে আসছে। এবং আগুনের গোলা গুলো তাঁদের চার পাশে এদিক-ওদিক জলের মধ্যে মুখ লুকাচ্ছে। জলের অপর নাম জীবন। পা পিছলে জলে পড়াতেই তাঁদের মঙ্গল। তাঁরা আধ ঘণ্টার ওপর পুকুরের জলে আশ্রয় নিলেন। মিলিটারি বেষ্টনীর মধ্যে বিপ্লবীদের আটকে পড়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সৈনিকেরা 'ভিয়ারী লাইট' (Verey Light) ছুঁড়তে শুরু করলো। 'আলোক-বোমা' ওপর দিকে ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক দিনের মতো আলোয় আলোময় হয়ে গেলো। সেই 'আলোক-বোমা' খেজুর গাছের শুকনো ডালে পড়ে দাউদাউ করে জ্বলছে। বিপ্লবী দু'জন আরো সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তাঁদের চোখ ও নাক পুকুরের জলের ওপর ভাসিয়ে রেখেছেন। সমস্ত শরীর তাঁদের জলের মধ্যে ডুবানো। জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাঁরা রণক্ষেত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছেন।

পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে রেখে কল্পনা ও মণি দত্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন। অনেক্ষণ পর সেনাবাহিনী গুলি ও 'আলোক-বোমা' ছোড়া বন্ধ করে দিলো। তারা বিপ্লবীদের ধরার জন্য ওতপেতে বসেছে।

অবস্থা বুঝে মণি দত্ত কল্পনাকে বললেন, "ডোবা থেকে আমাদের উঠতেই হবে।"

ডোবার পাড় বেশ খাড়া। কল্পনা ও মণি দত্ত অতিকষ্টে পাড়ে উঠলেন। সামনে বাঁশঝাড়। তাঁরা সেখানে আশ্রয় নিলেন। বাঁশঝাড় আত্মরক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। রাইফেলের গুলি তাতে আটকাবে না, তা মণি দত্ত এক লহমায় বুঝে নিলেন।

এবার মণি দত্ত কল্পনাকে নির্দেশ দিলেন, "উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। আমাদের জায়গা পরিবর্তন করতে হবে। বুকে হেঁটেই এগুতে হবে। সামনে শুকনো পাতা রয়েছে। পাতা-গুলো দু' হাতে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে ক্রলিং করতে হবে। আমি আগে আগে যাই। আপনি আমার পেছনে আসুন।"

কল্পনা বললেন, "আমরা পাশাপাশি চলি। যদি মরি একসঙ্গেই মরবো।"

কল্পনার প্রস্তাবে মণি দত্ত রাজি হলেন। দু'জনে দু'হাতে শুকনো পাতা আলতোভাবে সরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বুকে হেঁটে এগুতে লাগলেন। ভাগ্যদেবী শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে তা তাঁদের অজানা। গৈরলা গ্রামে তাঁরা প্রথম আশ্রয় নিয়েছেন। অপরিচিত গ্রাম। এমন কি ক্ষীরোদ প্রভার বাড়ির পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁরা একদিন রাতে এ বাড়িতে আত্মগোপন করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। চলে যাওয়ার সময় এই বিপত্তি। তাঁদের আশা তাঁরা মিলিটারি বেষ্টনী ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম হবেন। কিছুদূর এগুতেই দূর থেকে দেখলেন, একজন সৈনিক অন্ধকারে রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। বিড়ি খাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এ মতো অবস্থায় বিড়ি খাওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। শীতের রাত। বেচরা বিড়ি খেয়ে শীত তাড়াচ্ছে। বিড়ির আগুন লক্ষ্য করে বিপ্লবীরা গুলি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য তা নয়। তাই কল্পনা ও মণি দত্ত অন্যদিকে এগুতে লাগলেন।

মণি দত্ত কল্পনাকে বললেন, "আপনি একদিকে গুলি চালান। আমি অন্যদিকে গুলি

চালাবো। তবে একসঙ্গে নয়। কেননা গুলি আমাদের সীমিত। একজনের পর একজন গুলি চালাবো।"

মণি দত্ত কল্পনাকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো—সৈন্যদের অবস্থান আঁচ করা। যে-দিক থেকে পালটা গুলি আসবে সেদিকে তাঁরা যাবেন না। সৈন্যবাহিনী যে ব্যূহ রচনা করেছে তা আগে বুঝতে না পারলে সমূহ বিপদ। এমনো হতে পারে মিলিটারি যেখানে ওতপেতে আছে সেখানে গিয়ে তাঁরা পড়তে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মেজর জেনারেলের মতো উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে চলেছেন। মণি দত্ত বীরের মতো বীর। তিনি বীরাঙ্গনা কল্পনাকে নিয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে সেনাবেষ্টনী ভেদ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মণি দত্তের দৈহিক গড়ন মেজর জেনারেলের মতো। যুদ্ধ কৌশলে তিনি যে এতো পারদর্শী তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ তিনি কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এর একমাত্র সাক্ষী অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্ত। কল্পনা দত্ত তাঁর 'স্মৃতিকথা' (পৃঃ ৮৮) বইতে লিখেছেন, "আমিও নিঃশব্দে সেনাপতির আদেশের মত তাঁর (মণি দত্ত) হুকুম মেনে চল্লাম। অন্যদিক থেকে গুলি বন্ধ হয়েছে—এবার পালাবার চেষ্টা করতে হবে।"

ফেব্রুয়ারি মাস। প্রচণ্ড শীতের রাত। ভিজে কাপড়ে প্রায় একঘণ্টা মাটির ওপর সৈনিকের মতো বুকে হাঁটছেন কল্পনা। ভিজে কাপড়ে ধুলো কাদা হয়ে লেপটে আছে। শাড়ির ওজন অত্যধিক বেড়ে গেছে। ভিজে শাড়িটিকে মাটি যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। তাঁর সমস্ত শরীর কাদায় ভরতি। জীবন-মৃত্যুর চরম সন্ধিক্ষণ। বীরাঙ্গনা কল্পনা ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবন নিয়ে খেলছেন।

যেদিকে কল্পনা ও মণি দত্ত এগুচ্ছেন, ভাগ্যক্রমে সেদিকে কোন সৈনিক পাহারায় নেই। এক ঘণ্টা বুকে হাঁটার পর তাঁরা বিপদসীমা পার হলেন। মণিলাল দত্তের পরিচালনায় কল্পনাও মিলিটারি বেষ্টনী ভেদ করতে সক্ষম হলেন।

মণি দত্তের একমাত্র ভাবনা, মাস্টারদা, ব্রজেন সেন, সুশীল দাশগুপ্ত ও শান্তি চক্রবর্তীর দশা কি হলো? তাঁরা কি সেনাবাহিনীর বেষ্টনী থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন? বিপ্লবী সাথীদের জন্য তাঁর মন অধীর হয়ে উঠেছে।

বিপ্লবীরা মিলিটারি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যে অন্ধকারে বিছিন্ন হয়ে পড়লেন। গাঢ় অন্ধকারে পথ চলা একেবারে অসম্ভব। বাধ্য হয়ে শান্তি চক্রবর্তী এক সেকেণ্ডের জন্য টর্চ জ্বাললেন। টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সামনে রাইফেলধারী এক সৈনিককে দেখতে পেলেন। পলকে তিনি সৈনিককে লক্ষ্য করে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লেন। তারপর অন্ধকারে আন্দাজে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন।

সামনে গড়খাই। পাঁকে ভরতি। শান্তি চক্রবর্তী রিভলবারের গুলি ছোঁড়ার এক মিনিটের মধ্যে তাঁর দিকে রাইফেলের গুলির স্রোত সাঁই-সাঁই করে ছুটে চলেছে। নিমেষে তিনি পরিখা পার হয়ে গেল্লেন। কিন্তু একটি গুলি তাঁর পিঠ দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ড ঘেঁষে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বুক দিয়ে বের হয়ে গেলো। পিঠের স্ক্যাপুলার হাড়টি গুলির আঘাতে ভেঙ্গে গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা। বাঁ-হাত অসাড়। ডান হাতে রিভলভার। ক্ষতস্থান থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। তিনি মরিয়া হয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। সেনাবাহিনী

এই প্রথম 'আলোক-বোমা' ব্যবহার করলো। 'আলোক-বোমার' পরিধির মধ্যে থেকেও আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে তিনি কোন সময় মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। কখনও ঝোপের আড়ালে থেকে সৈনিকদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিচ্ছেন। আবার কখনও বুকে হেঁটে এগুচ্ছেন। এভাবে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে তিনি শত্রুর নাগালের বাইরে যেতে সচেষ্ট হলেন। মিলিটারিরাও 'রকেট-বোমা' ফাটিয়ে বিপ্লবীদের ধরার জন্য পাতি পাতি করে খুঁজছে।

সকলের আগে শান্তি চক্রবর্তী শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম হলেন। বিপদ সীমা পার হয়ে তিনি হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের রমণী চৌধুরীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। মাস্টারদা এই আশ্রয়ের নাম দিয়েছিলেন Amiable shelter, বিপ্লবীদের পরম বন্ধু রমণী চৌধুরী গুরুতর আহত শান্তি চক্রবর্তীকে পরম যত্নে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দিলেন। বিপ্লবী সাথী নেপাল দস্তিদার, রমণী চৌধুরীর বাড়ি এসে গুরুতর আহত শান্তি চক্রবর্তীর দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন। তাঁর সেবা যত্নে শান্তি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পুলিশ ও ফৌজী বেষ্টনী ভেদ করে শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত ও মণিলাল দত্ত অতিকষ্টে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মাস্টারদা, ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্তের কি হলো ? সুশীল দাশগুপ্তের বাঁ-হাতের কবজিতে গুলি লেগে জ্ঞান হারিয়েছেন। তারপর ?

শীতের রাত। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়েছে। বৃষ্টির ফলে সুশীল দাশগুপ্তের জ্ঞান ফিরে এলো। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর চোখ খুলে দেখলেন, চারদিক ঘোর অন্ধকার। একে তো শীতের রাত, তার ওপর বৃষ্টি। তাই তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপছেন। কেন এ মতো অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন তা তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো। তিনি ধূলিশয্যা থেকে উঠে বসলেন। দেখলেন, পাশে কেউ নেই। সাথীদের কি হলো ? কে কোথায় গেলেন তা তিনি জানেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে কালক্ষেপ করা সমীচীন নয়।

সুশীল দাশগুপ্ত দেখতে পেলেন একটি বাড়ির জানালা দিয়ে প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছে। বাড়িটির দিক থেকে ঘেউঘেউ করে কুকুর একটানা ডেকে চলেছে। আলো লক্ষ্য করে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন। কোন দিকে গেলে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবেন তা তিনি জানেন না। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করেই তিনি যাত্রা শুরু করলেন। সন্তর্পণে চলতে চলতে হরিশ বিশ্বাসের উঠানে গিয়ে হাজির হলেন। এ বাড়িটি ক্ষীরোদ-প্রভার পাশের বাড়ি। বাড়ির পাশেই গড়। বাড়ির একটু দূরেই পায়খানা। পায়খানা থেকে দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। তাঁর ধারণা, জায়গাটি নিরাপদ। বিষ্ঠার তীব্র গন্ধে সৈনিকদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে পায়খানার দিকে দুরুদুরু বুকে এগুতে লাগলেন। জল, কাদা ও বিষ্ঠায় গড় ভরতি। পূতিগন্ধময়।

সুশীল দাশগুপ্তের প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না। তিনি পায়খানার পাশ দিয়ে হেঁটে গড় পার হলেন। তারপর ধীরে ধীরে বিপদসীমা পার হয়ে গেলেন। হঠাৎ খেয়াল হলো—রাত ক'টা বাজে ? তিনি তাঁর বাঁ-হাতটি তুলতে চেষ্টা করলেন। হাতটি ভারি ভারি মনে

হচ্ছে। খানিকটা অবশ। অতিকষ্টে হাতটি তুলে দেখলেন—তাঁর হাতঘড়িটি নেই। কবজি থেকে রক্ত ঝরছে। তা হলে শত্রুপক্ষের রাইফেলের গুলি হাতঘড়িটিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ?

গৈরলা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে সুশীল দাশগুপ্ত হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের বিপ্লবী সদস্য ধীরেন দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে মিলিটারি বেষ্টনীর মধ্যে আটকে পড়ার পর রাতের অন্ধকারে শত্রুদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করে শান্তি চক্রবর্তী, মণিলাল দত্ত ও কল্পনা দত্ত বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। সুশীল দাশগুপ্তও ভাগ্যের জোরে বের হয়ে এলেন। কিন্তু মাস্টারদার জন্য তাঁদের উৎকণ্ঠা সীমাহীন। মাস্টারদার খবরাখবরের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ি থেকে উঠানে নামার পর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বাইরে শুকনো পাতার ওপর ইতস্ততঃ চলাফেরা করার খড়খড় শব্দ ক্ষীরোদপ্রভার কানে গেলো। তিনি কান খাড়া করলেন। তারপর মড়মড় শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল গর্জে উঠলো। রাইফেলের আওয়াজের পর, কি যেন ধপাস করে মাটিতে পড়ার শব্দ হলো। পরক্ষণে ঝপাং ঝপাং জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার শব্দ ভেসে এলো। রকমারি শব্দগুলো ক্ষীরোদপ্রভাকে বুঝিয়ে দিলো বিপ্লবীরা শত্রুর বেড়াজালে আটকে পড়েছেন। তিনি ইষ্টনাম জপ করতে লাগলেন। বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর তাঁর বাড়িতে পুলিশ আসবে তাতে কোন ভুল নেই। ঘরে বিপ্লবীদের ফেলে যাওয়া আপত্তিজনক কিছু আছে কিনা তা তিনি তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। ঘরের মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো কিছু কাগজ পেয়ে তা তিনি জ্বালিয়ে দিলেন। বেচারীর চোখে ঘুম নেই। কি হয়, কি হয়। এই উৎকণ্ঠার মধ্যেই রাতের এক এক প্রহর পার হতে লাগলো।

পরাধীন ভারতের বড়ই দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। প্রদীপ্ত সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার জন্য দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ ধেয়ে আসছে। ভাগ্যবিধাতা বিপ্লবীদের ভাগ্যে যেন শকুনির চাল দিয়ে বসলেন।

রাতের গাঢ় অন্ধকার। ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ির পশ্চিমদিকে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে বিপ্লবীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। মাস্টারদার সঙ্গে আছেন ব্রজেন সেন। এদিকে পুলিশ ও ফৌজ তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে রাইফেল নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে। বাড়ির পশ্চিমদিকে পাহারায় আছে গুর্খা সৈন্য মান বাহাদুর। তার বাঁ-পাশে নূর সিং সেপাই। দু'জনের হাতেই রাইফেল। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছেন। মাস্টারদা সেনা বেষ্টনী ভেদ করার আগে আশেপাশে সৈনিক মোতায়েন আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকবার রিভলবারের গুলি ছুঁড়লেন। মান বাহাদুর ও নূর সিং গুলির জবাব গুলিতে না দিয়ে বড় গাছের আড়ালে চুপ করে রইলো। শুকনো বাঁশ পাতার খড়খড় শব্দ শুনে সেপাইরা ভাবলো, বিপ্লবীরা এগিয়ে আসছেন। মানসিক প্রস্তুতির ফলে সৈনিকেরা রিভলবারের গুলির উত্তর রাইফেলের গুলিতে দেয়নি। গুর্খা সৈন্যবাহিনী যোদ্ধা হিসেবে সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া। সাহসের জোরে, মাস্টারদার চালে

তারা বোকা বনতে নারাজ। তারা চায় বিপ্লবীদের পাকড়াও করতে। তাতে চাকরিতে পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই সুযোগ। ভাগ্যদেবী তাদের কপালে জয়তিলক এঁকে দিতে চলেছেন।

মাস্টারদা গুলি চালিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ভাবলেন, সামনে কোন পুলিশ অথবা সৈনিকের পাহারা নেই। পথ মুক্ত। তারপর যা ঘটলো তা বড়ই মর্মান্তিক।

সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রজেন সেন কিছুদূর এগুতেই সেপাই নুর সিংয়ের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। নুর সিং রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে ব্রজেন সেনকে জড়িয়ে ধরলো। এ সময় মাস্টারদা তাঁর রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লেন। লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। পাশ থেকে গুর্খা সৈন্য মান বাহাদুর এসে মাস্টারদাকে জাপটে ধরলো। দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। পাশাপাশি আরো ক'জন সৈন্য ওতপেতে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে 'আলোক বোমা' আকাশের দিকে ছুঁড়ে তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর তিন-চার জন সৈন্য এসে মাস্টারদাকে সজোরে মাটিতে ফেলে দিলো। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে হাত-পা বেঁধে বাগানের মধ্যে মাটিতে ফেলে রাখলো। তখন রাত প্রায় দু'টা।

গৈরলা গ্রামের গোপন আশ্রয়কেন্দ্র কিভাবে প্রকাশ হয়ে পড়লো, তার বিস্তারিত বিবরণ ব্রজেন সেন 'চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী' স্মরণিকায় 'গৈরলা সংঘর্ষ ও মাস্টারদা বন্দী' (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩) প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"যে মহিলাটি মাস্টারদা এবং অন্যান্যদের দেখেছিল সে বাড়ি গিয়েই তার স্বামীকে সব বলে দেয় এবং মাস্টারদার বর্ণনা দেয় ও একটি অপরিচিত মেয়ের কথাও বলে। ঐ মহিলার স্বামী প্রসন্ন বিশ্বাস এ ঘটনা শুনেই তার মনে সন্দেহ জাগে, ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি নিশ্চয় সূর্য সেন এবং মেয়েটি কল্পনা দত্ত। প্রসন্ন বিশ্বাস এ খবর শুনেই গ্রামের মাতব্বর ও পুলিশে যোগাযোগ রক্ষাকারী কুখ্যাত নেত্র সেনকে (ব্রজেন সেনের সহোদর দাদা।) এসে বলে দেয়। মাস্টারদার মাথার জন্য দশ হাজার টাকা সরকারি পুরস্কার ঘোষিত আছে। পিউনেটিভ ট্যাক্সের ভীতি, দশ হাজার টাকার লোভ, সরকারি মহলে সুযোগ ও মর্যাদা লাভে অন্ধ হয়ে বৃটিশ শাসকের কৃপাপ্রার্থী হওয়ার মানসে নেত্র সেন পটিয়া থানায় গিয়ে গোপনে এ সংবাদ দিয়ে আসে। থানা হ'তে এই গোপন সংবাদ পাশেই মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লের কাছে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ চট্টগ্রাম শহরের কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টারে যায়।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লের অধিনায়কত্বে ৩০০ গুর্খা সৈন্য ক্ষিপ্রগতিতে এসে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ি বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থান বেষ্টন করে। গ্রামবাসী কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ সাহায্য না পেলে এত ক্ষিপ্রগতিতে এসে অচেনা, অগম্য একটি গ্রামের নির্দিষ্ট বাড়ি সঠিক ও নিখুঁতভাবে বেষ্টন করা সম্ভব হতো না।

১৬ই ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় পরিষ্কার জানা গেল, এই আশ্রয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা প্রয়োজন। তাই মাস্টারদা তাঁর সাথীদের আদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি ৯টার মধ্যেই বইপত্র, দলিলাদি ও নিজেদের টর্চ, রিভলবার পিস্তলগুলো নিয়ে তৈরি হতে। সকলে প্রস্তুত হয়ে ৯টা ১৫ মিনিটে সারিবদ্ধ হয়ে একে অন্যের পেছনে

বেরিয়ে পড়ল। রাত্রির ঘন অন্ধকারে পথ চলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একে অন্যের খুব নিকটে ছিল। তখন কার্য়ফিউ ছিল বলে গ্রামের পথঘাট অস্বাভাবিক নির্জন ছিল। এই সারিবদ্ধ বিপ্লবীদলের পুরোভাগে ছিল যথাক্রমে ব্রজেন সেন, মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত।

মাস্টারদার নেতৃত্বে এই বিপ্লবীদল প্রথমে পূর্বদিকে—বাড়ি থেকে বেরোবার স্বাভাবিক পথে এগিয়ে বাঁশের ঘেরা পার হবার চেষ্টা করতেই অকস্মাৎ আওয়াজ শোনা গেল—'কোন হ্যায়।'

মুহূর্তে সকলেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আগ্নেয়াস্ত্র মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে অতি ধীরে সকলে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। মাস্টারদা তখন ইঙ্গিত করলেন সকলকে বাড়ির আড়ালে চলে যেতে। সেখানে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই পরামর্শ করে নেওয়া হল যে, ঐ জায়গা থেকে বেরিয়ে যাবার সব চাইতে নিরাপদ পথ বাড়ির পশ্চিমদিকের বাঁশবনের ভেতর দিয়ে। সেদিকে সকলে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল।"

সারারাত পুলিশ ও সেনাবাহিনী ক্ষীরোদপ্রভার বাড়ি ঘিরে রাখলো। বিপ্লবীদের কি দশা হলো ক্ষীরোদপ্রভা কিছুই জানেন না। দুর্ভাবনার মধ্যে তিনি রাত কাটালেন।

রাত ভোর হলো। কয়েকজন পুলিশ ও ফৌজ গৈরলা গ্রামের গণ্যমান্য লোক বরদামোহন লালার বাড়ি গেলো। বরদামোহন পুলিশ ও মিলিটারির চাপে পড়ে ক্ষীরোদপ্রভার উঠানে এসে হাজির হলেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে বরদামোহন ক্ষীরোদপ্রভার ছেলেকে ডাকলেন, "মনোরঞ্জন, তুমি তোমার মাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে এসো।"

ক্ষীরোদপ্রভা ভাবলেন, থানায় যেতে হবে। এই যাত্রা হয়তো জীবনের শেষ যাত্রা। ঘর থেকে বের হবার আগে তিনি সিল্কের চাদর গায়ে জড়ালেন। টেঁকে গুঁজলেন-- চারটি মোহর ও এগারো খানা গিনি। ছেলেকে পরতে দিলেন ধুতি ও পাঞ্জাবি। তারপর তিনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। পুলিশ তাঁর কাছে জানতে চাইলো, বিপ্লবীদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন কিনা।

ক্ষীরোদপ্রভা বললেন, "আমি কাউকে আমার বাড়িতে আশ্রয় দিইনি। হয়তো বাইরে থেকে তাড়া খেয়ে ওরা আমার বাগানে ঢুকে পড়েছে। রাতে আমার উঠানের ওপর দিয়ে কয়েকজন লোকের দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনে আমি ভয়ে কাঠ। বিধবা মানুষ। একমাত্র ছেলে নিয়ে ঘরে থাকি। চোর-ডাকাত ভেবে ঘরে খিল দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর অবিশ্রান্ত গোলাগুলির শব্দে ভয়ে সারারাত ঘুমোতে পারিনি।"

পুলিশ ক্ষীরোদপ্রভা ও মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করলো। সর্বমোট গৈরলায় বন্দী হলেন চারজন। তাঁরা হলেন—মাস্টারদা, ব্রজেন সেন, ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস।

ক্ষীরোদপ্রভার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা। তাঁর একমাত্র ছেলে মনোরঞ্জন কারান্তরাল থেকে জীবনে বের হয়ে আসতে পারবেন কিনা ভগবান জানেন। মনোরঞ্জন ছাড়া সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। আকস্মিক প্রচণ্ড ঝড়ে যেন সংসাররূপ গাছটিকে সমূলে উপড়ে ফেললো। তিনি স্রোতের টানে ভেসে চলেছেন। তাঁর সোনাদানা গয়নাগাঁটি সব ঘরের

মেঝেতে মাটির তলায় পোঁতা আছে। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে জেলের ভেতর অনেক বিপ্লবী যুবকের জীবন-দীপ চিরতরে নিবে গেছে। মনোরঞ্জন কি শেষ পর্যন্ত জেল থেকে বের হয়ে আসতে পারবে? এলোমেলো নানাকথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাতৃহৃদয়ে এক অমঙ্গলের ছায়া পড়লো।

খুব ভোরে পুলিশ আর সেনাবাহিনী মিলে মাস্টারদা, ব্রজেন সেন, ক্ষীরোদপ্রভা ও মনোরঞ্জনকে নিয়ে চললো—পটিয়া ডাকবাংলোর মিলিটারি ক্যাম্পে। গৈরলা থেকে পটিয়ার দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার। গ্রাম্যপথ। কোথাও কোথাও কর্ষিত জমির ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। ঢেলা ভরতি মাঠ। পুলিশ ও সেনাবাহিনী বিজয় উল্লাসে মাস্টারদাকে সময় সময় দৌড়িয়ে, টেনে ও হেঁচড়ে নিয়ে চললো। মাস্টারদার দুর্বল দেহ এই ধকল সইতে পারলো না। তিনি কর্ষিত মাঠে বেশ কবার পড়ে গেলেন। ফলে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত। তাঁর শরীর থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। এভাবে পথ চলতে চলতে এক সময় তাঁর পরনের কাপড় খুলে গেলো। তিনি বিবস্ত্র হয়ে পড়লেন। দিগম্বর অবস্থায় তাঁকে অর্ধেক পথ চলতে হয়। পরে সাহেব এসে মাস্টারদার হাতের বন্ধন খুলে দিলেন। মাস্টারদা কাপড় পরে নিলেন।

দীর্ঘ সাড়ে চার কিলোমিটার পথের দু'ধারে গ্রামবাসী ও পথিকেরা অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে মাস্টারদা এবং তাঁর সঙ্গীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখলো। তাদের মনে হতে লাগলো তারা যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। সকলে হতবাক। ওদিকে গুর্খা সৈন্যদের আনন্দ আর ধরে না। লোকজনের উদ্দেশ্যে গুর্খা সৈন্যেরা মহানন্দে চিৎকার করে বলতে লাগলো—
"তুমহারা সর্দ্দারকো পাকাড় লিয়া।"

মাস্টারদাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে চট্টগ্রামবাসীদের স্বপ্নসৌধশীর্ষে যেন বজ্রপাত হলো। তাদের বিশ্বাস ছিল মাস্টারদা জাদু জানেন। বৃটিশ সেনার বুদ্ধিতে মাস্টারদাকে ধরা অসম্ভব। স্বাধীনতা প্রিয় চট্টগ্রামবাসীর আশাদীপ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলো।
ক্ষীরোদপ্রভাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী তাঁর ঘরের মেঝে তিন ফুট গভীর করে খুঁড়ে ফেললো। পুকুরের জল সেচে পুকুর জলশূন্য করলো। তারপর শুরু হলো পাঁক ঘাঁটাঘাঁটি। উদ্দেশ্য—বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র অনুসন্ধান চালিয়ে বের করা। কিন্তু কোন আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোদপ্রভার বাড়িটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিলো। সোনার গয়নাগুলি যার হাতে পড়লো সে টেঁকে গুঁজে নিলো।

মাস্টারদা গ্রেপ্তার হবার পর, এ খবর দাবানলের মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। বিপ্লবীরা প্রমাদ গুনলেন।
পটিয়া ডাকবাংলোয় মিলিটারি ক্যাম্প। মাস্টারদা ও তাঁর সঙ্গীদের ডাকবাংলোয় নিয়ে আসা হলো। ছ' ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কাঁটাতারের এক খাঁচায় মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। পটিয়া হলো—থানা। মফস্বল শহর। মাস্টারদা ধরা পড়ার খবর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার পর, গ্রাম-গঞ্জের লোক এবং ইস্কুলের ছাত্ররা ইস্কুল ছেড়ে হাতে বই নিয়ে মাস্টারদাকে দেখার জন্য ডাকবাংলোয় জমায়েত হয়েছে। দেশবাসী তাদের প্রিয়

নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে দূর-দূরান্ত থেকে হেঁটে আসছে। বেলা যতো বাড়তে লাগলো, কাতারে কাতারে লোক এসে জন-সমুদ্রের রূপধারণ করলো। সকলের মুখে গভীর শোকের ছায়া। মাস্টারদা খাঁচায় ঘুরে ঘুরে জনতার উদ্দেশ্যে দু' হাত জোড় করে নমস্কার করছেন। জনতাও মাস্টারদাকে প্রতিনমস্কার করছেন। দু' পক্ষই নীরব। সাগর তরঙ্গ চোখে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের নীরব শোকের ঢেউ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

কাঁটাতারের খাঁচায় বসে আছেন সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন। খাঁচার বাইরে চারজন সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। মাস্টারদা বড়ই ক্লান্ত। মাথার ওপরে জ্বলন্ত সূর্য। ক্লান্তিতে শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু গুর্খা সৈন্যেরা সঙ্গিন উঁচিয়ে তেড়ে আসে। ধুলি শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়াতেও তাদের আপত্তি।

এমন সময় পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এসে বললেন—"Surya Babu, we have many things to learn from you."

মাস্টারদা অফিসারের কথা শুনেও কোন জবাব দিলেন না। সারাদিন রোদে পুড়ে মাস্টারদার গলা তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে। কথাগুলো তাঁর কাছে পরিহাসের মতো শুনালো।

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন ধরাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারিভাবে চট্টগ্রাম শহরে খবর পাঠানো হলো। চট্টগ্রাম শহর থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার পটিয়া চলে এলেন। তাঁদের সঙ্গে এলেন কয়েকজন ইংরেজ।

পুলিশ সুপার মিঃ হিকস্ মাস্টারদাকে বললেন—"I shall hang you."

মাস্টারদা জানেন, ইংরেজদের কথাই হলো—আইন। কোর্ট কাছারির আইন হলো—প্রহসন। ইংরেজেরা তাঁকে ফাঁসি না দিয়ে ছাড়বেন না।

মিঃ হিকস্ সদলবলে চলে যাওয়ার পর মাস্টারদা ব্রজেন সেনকে বললেন, "আমিও ফাঁসি চাই। আমার ফাঁসি হবে। তোমরা রইলে। জেল থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করবে। ধলঘাটের বিশ্বাসঘাতকতা নিরক্ষর গ্রাম্যলোকের দ্বারা হয়েছিল বলে ক্ষমা করেছি। এবারের বিশ্বাসঘাতকতা যেন কিছুতেই ক্ষমা না পায়। আমাদের দুর্বলতা যেন প্রকাশ না পায়। এতে বিপ্লবী কাজের খুব ক্ষতি হবে।"

মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে ডাকবাংলোতে লোহার কাঁটাতারের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পর, ক্ষীরোদপ্রভা এবং তাঁর ছেলে মনোরঞ্জনকে পটিয়া থানায় নিয়ে আসা হলো। পটিয়া থানার দারোগা বাঙ্গালী হিন্দু। ক্ষীরোদপ্রভা দারোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে নিলেন। তিনি দারোগাবাবুকে কিছু সোনা ঘুষ দিলেন। উদ্দেশ্য—ক্ষীরোদপ্রভার রিপোর্টটি দারোগাবাবু যাতে হালকাভাবে লিখেন। অবশিষ্ট সোনা থানায় জমা দিলেন। কিন্তু সোনা জমার কোন রসিদ পেলেন না।

সতেরো তারিখ সন্ধ্যে সাতটা। মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে পটিয়া থেকে চট্টগ্রাম শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। গুর্খা সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন ট্রেনে চললেন শহর অভিমুখে।

এ সময় একজন গোয়েন্দা পুলিশ বললেন, "সূর্যবাবু, আপনি গান্ধীজীর অহিংস পথে না গিয়ে সশস্ত্র পথে গেলেন কেন ?

মাস্টারদা শান্তভাবে বললেন, "নিরস্ত্র ও সশস্ত্র আন্দোলনের লক্ষ্য একই।"
রেলগাড়ি ষোলসহর জংশনে এসে থামলো। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদার কামরার দরজা খুলে কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙালী গোয়েন্দা উঠে পড়লেন।
একজন ইংরেজ সার্জেন্ট সিংহ গর্জনে জিজ্ঞেস করলেন—"Who is the great Surya Sen ?"
একজন বলল—"That old man."
যেই বলা অমনি ইংরেজ সার্জেন্ট ধাঁই করে শৃঙ্খলিত মাস্টারদার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিলেন। নাক ফেটে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। মাস্টারদার রক্তে ট্রেনের মেঝে লালে লাল। মাথা ঘুরে মাস্টারদা ব্রজেন সেনের বুকের ওপর ঢলে পড়লেন।
কয়েকজন লোক ধরাধরি করে রেলগাড়ি থেকে নামিয়ে মাস্টারদার মাথায় জল ঢালতে লাগলো। মুমূর্ষু মাস্টারদা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। ষোলসহর থেকে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে মোটরগাড়ি করে জেলা গোয়েন্দা অফিসে আনা হলো।
জেলা গোয়েন্দা অফিসে একজন গোয়েন্দা অফিসার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন, "সূর্যবাবু, পাহাড়তলীতে প্রীতিকে খেলেন জ্যান্ত মেরে। কল্পনাকে কোথায় রেখে এলেন ?"
শ্রান্ত ও ক্লান্ত মাস্টারদা। তিনি অতিকষ্টে জবাব দিলেন, "জানি না।"
কিছুক্ষণ পর পুলিশ সুপার মিঃ হিকস্ ও সহকারী পুলিশ সুপার মিঃ স্প্রিংফিল্ড এসেই, মাস্টারদা এবং ব্রজেন সেনকে বেধড়ক মার শুরু করলেন। অনেক দিনের জ্বালা মেটানোর জন্য যেন তাঁরা রাগে অন্ধ হয়ে গেছেন। খাঁচায় বন্দী সিংহ দেখলে কুকুর যেমন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘেউঘেউ করে তেজ দেখায় তেমনি মিঃ স্প্রিংফিল্ড শৃঙ্খলিত মাস্টারদার বুকে রিভলবার দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন।
মিঃ স্প্রিংফিল্ডের আক্রোশ উত্তরোত্তর বাড়তে দেখে একজন গোয়েন্দা অফিসার বললেন, "He is injured seriously, please don't beat him."
এ কথা শুনে দুই অফিসার মাঝপথে মারে ক্ষান্ত দিলেন।
এর পরে এলো কালো পোশাক পরা বহু ইংরেজ, তারা ইংরেজের চিরশত্রু মাস্টারদাকে দেখতে এসেছে। এরা কৌতূহলী ইংরেজ। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার মাস্টারদাকে পরীক্ষা করে ইংরেজ অফিসারকে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেলেন।
সংবাদপত্রে মাস্টারদা গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের ভাষায় :

চট্টগ্রামের সূর্য সেন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম, ১৭ই, ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ফেরারী সূর্য সেনকে গত রাত্রে পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে গৈরলা নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার প্রধান আসামী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গত ১৯৩০ সাল হইতে সূর্য সেন পলাতক ছিলেন এবং তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। [আনন্দবাজার : ১৮-২-১৯৩৩]

বিপ্লবীরা আর একটি পরিকল্পনা হাতে নিলেন। পরিকল্পনাটি হলো—মাস্টারদাকে জেল থেকে মুক্ত করা।

কয়েকজন রাজবন্দী চট্টগ্রাম জেলে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে মাস্টারদাকে জেল থেকে উদ্ধার করা যায়। তাঁরা মাস্টারদার সেলের প্রহরীদের সঙ্গে ভাব করলেন। শেষ পর্যন্ত প্রহরীদের বশীভূত করতে সক্ষম হলেন। প্রথমপর্ব শেষ করে, রাজবন্দীরা জেলে বসে দলনেতা তারকেশ্বর দস্তিদারের সাথে যোগাযোগ করলেন। মাস্টারদাকে জেল থেকে বের করে আনার ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো।

শৈলেশ রায় খবর পেলেন রাতে কারফিউর মধ্যে শহরের লালদিঘির গাছের আড়ালে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেখানে একজন সেপাই এসে তাঁকে একখানি চিঠি দিয়ে যাবে।

তখন রাত প্রায় দশটা। কারফিউ। সামনেই থানা। শৈলেশ রায় নির্ভরযোগ্য সংবাদ পেয়ে লালদিঘির পাড়ে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর একজন সেপাই এসে শৈলেশ রায়ের হাতে একখানি চিঠি দিলো। চিঠিটি শৈলেশ রায় তাঁর জামার ঘড়িপকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

চিঠিটি নিয়ে শৈলেশ রায় সেপাইটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, কয়েকজন বন্দুকধারী সেপাই তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। পালাবার উপায় নেই। ভাগ্যের এমনি পরিহাস চিঠিটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন। চিঠিটি নষ্ট করে দিতে পারলেই তিনি বিপদমুক্ত হতে পারতেন। যথেষ্ট সময়ও পেয়েছেন।

রাত দশটার পর শৈলেশ রায়কে বন্দুকধারী সেপাইরা ঘিরে ফেললো। আই. বি. ইন্সপেক্টার শচীন ভৌমিক এসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশ রায়ের দেহতল্লাসী হলো। শৈলেশ রায়ের জামার ঘড়িপকেট থেকে চিঠিটি বের করে ফেললো। চিঠিটি মিঃ শচীন ভৌমিকের হাতে দেওয়া হলো।

শৈলেশ রায় মিঃ শচীন ভৌমিকের হাত থেকে চিঠিটি ছিনিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন। মিঃ ভৌমিক শৈলেশের কণ্ঠনালী চেপে ধরে চিঠিটি উদ্ধার করলেন।

শৈলেশ রায় পুলিশের হাতে ধরাপড়ার পর, তাঁর কাছ থেকে কিভাবে পুলিশ চিঠি উদ্ধার করেছিল, তার বিবরণ এবং চিঠির বিষয়বস্তু 'পরিবর্তন' পত্রিকা ১১ আগস্ট

বিশেষ স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার কয়েকটি বিখ্যাত এগজিবিট" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। তা হুবহু তুলে দেওয়া গেলো :

"পুলিশ বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চালিয়ে কয়েকটি চিঠি ও চিরকুট উদ্ধার করে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সরকার পক্ষ আদালতে দাখিল করে। যেমন চট্টগ্রাম জেলের বাইরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকায় এবং ঐ জেলের একজন ওয়ারডার বাজলালের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শে ব্যস্ত থাকার সময় পুলিশ চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তার করে। তারপর তাকে নিকটবর্তী একটি পানের দোকানের সামনে এনে খানাতল্লাসী করা হয়। সেই সময় সে একটুকরো কাগজ মুখের মধ্যে পুরে ফেলে। পুলিশ তখন তার চোয়াল চেপে ধরে কাগজটি উদ্ধার করে। কাগজের টুকরোটি এগজিবিট ১১৭ হিসাবে আদালতে প্রদর্শিত

হয়। ঐ কাগজের টুকরোয় লেখা ছিল 'ক্লোরোফরম ৮ ফায়াল বা ২ আউনস পটাসিয়াম সায়নাইড, ২টা ছোরা, বেবী ২, ফুড ২৪। আনডারলাইন করা জিনিসগুলি এক্ষুণি পাঠানোর দরকার নেই। হঠাৎ করে স্থানান্তরিত করার জন্য শহরের মধ্যে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজে রাখা উচিত।'

পুলিশের পক্ষ থেকে ঐ সাংকেতিক চিঠির মর্ম উদ্ধার করা হয়। ঐ চিঠিতে লিখিত বেবী ২ ও ফুড ২৪ বলতে বোঝায় 'দুটো রিভলবার ও ২৪ কার্তুজ।'

বিচারে শৈলেশ রায়ের মোট সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এবং আন্দামানে প্রেরিত হন।

সমস্ত ব্রিটিশ শক্তি যেন চট্টগ্রামের বুকে আছড়ে পড়েছে। বিপ্লবীদের রুখতে যে হারে সেনা-বাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে, তাতে মনে হবে চট্টগ্রাম অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

মাস্টারদা গ্রেপ্তার হবার পরও ইংরেজ সরকারের চোখে ঘুম নেই। মাস্টারদা ধরাপড়ার পর বিপ্লবীদলের দায়িত্ব এসে পড়েছে তাঁর সুযোগ্য সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপর।

বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার ভাবলেন, চট্টগ্রাম জেলার উত্তর ও মধ্যভাগে যেভাবে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে তাতে বিপদের সম্ভাবনা বেশি। আসানুল্লা হত্যা, গৈরলা সংঘর্ষ ও ধলঘাট যুদ্ধের ফলে চট্টগ্রামের জনসাধারণের ওপর অহেতুক সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন চলছে। তাছাড়া বিপ্লবীদের অনেক গুপ্তঘাঁটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

বিপ্লবীরা এবার চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণদিকে এগোতে লাগলেন। তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে আছেন কল্পনা দত্ত ও সুধীন দাস। তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন বাঁশখালি থানার সাধনপুর গ্রামে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তাঁরা চলে এলেন কালীপুর গ্রামে।

১৬ মে। ১৯৩৩ সাল। বিপ্লবীরা কালীপুর থেকে মাঝরাতে আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন। গ্রামটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত।

এ আশ্রয়কেন্দ্রটি হালে যোগাড় হয়েছে। আশ্রয়দাতার দু' ভাগনে বিপ্লবীদলের সমর্থক। তাঁরা তাঁদের দু'মামার কাছে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

গৃহকর্তা পূর্ণ তালুকদার ও ভাই প্রসন্ন তালুকদার। পূর্ণ তালুকদারের বয়স প্রায় সত্তর বছর। সংগতিসম্পন্ন গৃহস্থ। একান্নবর্তী পরিবার। ভাগনেদের প্রস্তাবে বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে এক কথায় রাজি হলেন।

বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য—তাঁরা সীতাকুণ্ডের দিকে যাবেন। সেদিক অপেক্ষাকৃত শান্ত। সেখানে বিনোদ দত্ত আছেন। সীতাকুণ্ড অঞ্চল বিপ্লবীদের শক্ত ঘাঁটি।

বিপ্লবীরা দিনে পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন। সন্ধ্যেয় স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সারেন। তারপর রাতে সমুদ্র চরায় গিয়ে বসেন। তার কারণ আশেপাশের গ্রামের বিপ্লবী কর্মীরা বিভিন্ন খবর নিয়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

বোয়ালখালি থানার কয়েকটি গ্রামে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চলছে। মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত একজন ফেরারী বিপ্লবী। তিনি ছনদণ্ডী গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। সেখানে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না।

১৮মে সকালবেলা। মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গহিরা গ্রামে এসে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত

হলেন। সেদিন সন্ধ্যেয় তুলাতলী গ্রামের মনোরঞ্জন দাস সংবাদ নিয়ে তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মোট পাঁচজন বিপ্লবী পূর্ণ তালুকদারের বাড়িতে এসে একত্রিত হলেন। তাঁরা হলেন—তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, সুধীন দাস, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত (খোকা) ও মনোরঞ্জন দাস।

রাতে বিপ্লবীরা বঙ্গোপসাগরের চরায় গেলেন। আশ্রয়ে ফিরলেন রাত সাড়ে তিনটা। তারপর তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

১৯ মে ১৯৩৩ সাল।

পাখপাখালী ডাকছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। তারকেশ্বর দস্তিদার মনোরঞ্জন দাসকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলেন। তিনি যথাস্থানে ফিরে যাবেন। ভোর হবার আগে তাঁকে গহিরা গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মনোরঞ্জন দাস ঘরের বাইরে এসে কয়েক পা এগোতেই সৈন্যেরা তাঁকে ধরে ফেলে। তিনি জোর চিৎকার করে বিপ্লবীদের জানিয়ে দেন, "পুলিশ পুলিশ!"

আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জন দাসের মাথায় বেটনের ঘা পড়লো। কণ্ঠরোধ হলো। মাথা ফেটে গেলো। পাকড়ির কাপড় দিয়ে তাঁকে বেধে ফেললো।

পুলিশ আসার চিৎকার শুনে বিপ্লবীরা তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। তাঁদের ঘুম জড়ানো চোখ। বিপ্লবীরা আছেন বেড়ার ঘরে। দেখেন, সঙ্গিনধারী সৈন্য বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলেছে। তাঁদের সঙ্গে আছে তিনটি রিভলবার। বোমা তৈরির বিস্ফোরক দ্রব্য। সংগঠনের জন্য সংগৃহীত কিছু টাকা-পয়সা ও সোনার গয়না। আর একটি হাতের লেখা খাতা। তাতে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে লেখা। খাতাটি লিখেছেন—তারকেশ্বর দস্তিদার।

বিপ্লবীরা ভাবলেন, বেড়ার ঘরে থেকে রাইফেলধারী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাবে না। তারকেশ্বর দস্তিদার তাঁর সাথীদের মাটির বাড়িতে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। বেড়ার ঘর থেকে বের হয়ে বিপ্লবীরা মাটির বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবং দক্ষিণের জানালাটি খোলা রাখা হলো।

মাটির ঘরে ঢুকেই তারকেশ্বর দস্তিদার টাকাকড়ি ও সোনার অলঙ্কারের পুঁটলিটি প্রসন্ন তালুকদারের হাতে দিয়ে বললেন, "যদি কোনদিন আমাদের সংগঠনের কেউ এসে, এগুলি চায় তাকে দিয়ে দেবেন। বাড়ির সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুন। আপনারা কোন মতেই ঘরের বের হবেন না। প্রয়োজন হলে আমি বলবো।"

বিপ্লবীরা তিনটি রিভলবার নিয়ে তৈরি। তারকেশ্বর দস্তিদার বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর তিনি সাথীদের বললেন, "যেভাবে জাঠ সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে তাতে আমাদের পালাবার কোন উপায় নেই।"

সুধীন দাস তারকেশ্বর দস্তিদারকে বললেন, "রাত পোহাতে আর দেরি নেই। আপনাকে এবং কল্পনাদিকে বাঁচাতেই হবে। পার্টিকে সুসংগঠিত রাখার জন্য আপনাদের পালিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। আমি আর মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কর্ডন্ ভেদ করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে, সৈন্যেরা মনে করবে আমরা সবাই সেদিকে পালিয়ে যাবার

চেষ্টা করছি। এতে তাদের লক্ষ্য থাকবে সেদিকে। আর এ সুযোগে আপনারা অন্যদিকে পালিয়ে যাবেন।"

বিপ্লবীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা দেয়ালের আড়ালে থেকে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর হতে গুলি চালাতে লাগলেন। রাইফেলের গুলিতে বিপ্লবীদের গুলির জবাব এলো। এ যেন বিরামহীন আগুনধারা।

বিপ্লবীদের শক্তি সীমিত। গুলি অপ্রতুল। যুদ্ধ অসম। গুলি চালনা লক্ষ্যহীন। সেনাবাহিনী রিভলাবারের পাল্লার অনেক দূরে আড়ালে থেকে ঘরের জানালা লক্ষ্য করে গুলি করছে। সৈনিকদের গুলির লক্ষ্যস্থল সুনির্দিষ্ট। তবুও বিপ্লবীরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছেন।

বিপ্লবীরা যুদ্ধ করলেন খুবই কম সময়। এই সময়ের মধ্যে বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেলো, "আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণ কর।"

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালানোর পর বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে গেলো। তিনটি রিভলবারে মাত্র ছ' রাউণ্ড করে গুলি করা হয়েছে। এবার বিপ্লবীদের হাতে তৈরি বুলেট রিভলবারে লোড করা হলো। এ বুলেটগুলি আশ্রয়কেন্দ্রে বসে বিপ্লবীরা তৈরি করে ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি। সেই বুলেট রিভলবারে ভরতি করার পর দেখা গেলো চেম্বার আর ঘোরে না।

বাইরে গুলি চলছে অবিরাম। একই সঙ্গে সেনাবাহিনী চিৎকার করে বলছে, "গুলি বন্ধ কর। আত্মসমর্পণ কর।"

আত্মসমর্পণের কথা শুনে গৃহকর্তা পূর্ণ তালুকদার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

সৈন্যরা হাঁক দিলো, "Hands up"

হাত না তোলার অপরাধে মিলিটারি পূর্ণ তালুকদারকে গুলি করে। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে।

বিপ্লবীরা হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পেলেন, "আমার দাদাকে মেরে ফেলেছে!"

তারপর আর একটা গুলিতে আর্তনাদ স্তব্ধ হয়ে গেলো। বিপ্লবীরা বাইরে একটি ভারী জিনিসের পতন শব্দ শুনতে পেলেন। ভাবলেন, আর একজন গেলো।

বাড়ির বৌ-ঝি ও ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি জুড়ে দিলো। হৃদয় বিদারক কান্নায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এলো। বিপ্লবীদের সামনে সব পথ রুদ্ধ। হাতে রিভলবার আছে গুলি নেই। কালক্ষেপ করলে বাড়ির লোকজনের মৃত্যুর হার বাড়বে। বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির হলো— পালাবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। জীবিত ধরা দেওয়ার কথা উঠেই না।

সকাল আটটা। পালাবার জন্য কল্পনা দত্ত দরজা খুলতে এগিয়ে গেলেন। কল্পনার পেছনে অন্য বিপ্লবীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। দরজা সামান্য খুলেছেন। এমন সময় একটি রাইফেলের গুলি কল্পনা দত্তের বাঁ-হাত ঘেঁষে চলে গেলো। হাতটিকে ঝাঁকুনি দিলো। কল্পনা দত্তের হাতের চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

কল্পনা দত্তের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত (খোকা)। রাইফেলের গুলিটা

সোজা গিয়ে মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের বুকে লাগলো। মনোরঞ্জন করুণস্বরে জীবনের শেষ ডাক দিলেন—'মা'।

'মা' শব্দটি করেই মনোরঞ্জন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর দেহ থেকে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বের হতে শুরু করলো। নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়েছে। সেই দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

তারকেশ্বর দস্তিদার মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের শরীর পরীক্ষা করে বেদনাহত কণ্ঠে বললেন, "খোকা চলে গেলো।"

পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা আশ্রয়দাতার পারিবারবর্গকে রক্ষা করতে হবে।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকায় 'গহিরা সংঘর্ষ' প্রবন্ধে কল্পনা যোশী (দত্ত) লিখেছেন, "আমি ফুটুদাকে (তারকেশ্বর দস্তিদার) অনুরোধ করেছিলাম—আত্মসমর্পণ করতে—অস্ত্রশস্ত্র যেন আমার হাতে দিয়ে সমর্পণ করতে দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী আমি নিয়েছিলাম তিনটি রিভলবার। আমরা আত্মসমর্পণ করব বলাতে—একজন চৌকিদারকে পাঠিয়ে দিল সুবেদার আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিতে। জানালার সামনে এসে আমি তিনটি রিভলবার তুলে দিলাম তার হাতে। আত্মসমর্পণ করতে হওয়াতে আমরা গ্লানিবোধ করছিলাম বলে, অনেক সময় নিয়েছিলাম সিদ্ধান্ত নিতে।

রিভলবারগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের বলা হোল এক এক করে হাত তুলে খালি গায়ে আসতে হবে এবং আমাকে প্রথম। আমি বেরিয়ে এলাম হাত তুলে। কিন্তু খালি গায়ে নয়, সেমিজ ও শাড়ী ছিল পরনে। গুলি তখন থেমে গেছে। শিশুদের কান্নার রোলও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। থামেনি শুধু মেয়েলোকদের কান্না। সামনের কোঠাঘরের দাওয়ায় বসে তারা। কান্না তাদের থামতে পারে না।"

বিপ্লবীরা একে একে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। সবার আগে কল্পনা দত্ত। তিনি কিছুদূর এগোতেই প্রথমে দেখতে পেলেন—বৃদ্ধ পূর্ণ তালুকদার পড়ে আছেন। অনেকটা জায়গা রক্তে ভেসে গেছে। তিনি মারা গেছেন। আর কয়েক পা এগোতেই দেখলেন, পূর্ণ তালুকদারের ছোট ভাই প্রসন্ন তালুকদারের বুকে রাইফেলের গুলি লেগেছে। তিনি কাতরাচ্ছেন। তাঁর বুক থেকে রক্ত ঝরছে। তিনি জোরে জোরে হাঁপ ছাড়ছেন। মনে হচ্ছে—মৃত্যু আসন্ন। তারপর চোখ পড়লো বিপ্লবী সাথী মনোরঞ্জন দাসের দিকে। রক্তে তাঁর জামা-কাপড় ভিজে চপ্‌চপ্‌ করছে। তাঁর অপরাধ—তিনি চিৎকার করে পুলিশ আসার খবর বিপ্লবীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আশ্রয়দাতার পরিবারের কয়েকজনকে মিলিটারিরা বেটনের আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তাদের শরীর রক্তে ভেসে গেছে। কল্পনার সামনে পেছনে যেন রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছে।

এতো রক্ত দেখে কল্পনার মাথা ঘুরে গেলো। চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখেন একজন দশাসই জাঠ সুবেদার তাঁর সামনে হাজির। কোন কথা না বলেই সুবেদার ধাঁই করে কল্পনার গালে এক চড় কষালো।

তারপর এক অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটজন সেপাই সুবেদারকে ঘিরে ফেললো। তারা সমস্বরে বললো, "অগর আপনে ফিরসে ইস ঔরৎপর হাত উঠায়া তো হাম আপকে হুকুম মাননে কো ইনকার করেঙ্গে।"

সেপাইদের প্রতিবাদে সুবেদার দমে গেলেন। সুবেদার বুঝলেন, সেপাইয়া নারীজাতির প্রতি অবমাননা মোটেই বরদাস্ত করবে না।

সেপাইরা কল্পনা দত্তকে আশ্বাস দিয়ে বললো, ' হামারে রহতে আপকে জিস্‌ম পর কোই হাত নহী দে সকেগা। আপ শেরকে ঔলাদ হৈঁ— আপকে উপর কিসি তরহ কা ভী জুলুম হম বরদাস্ত নহী করেঙ্গে।"

পরের অধ্যায়ে জাঠ সেনারা সঙ্গিন উঁচিয়ে এবং পিস্তল তাক করে তারকেশ্বর দস্তিদার ও সুধীন দাসের কাছে এসে তাঁদের পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। বন্দী হবার পর বন্দীদের ওপর কি ধরনের নির্যাতন চলেছিল, সে সম্বন্ধে সুধীন দাস কি লিখেছেন দেখা যাক।

'চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব স্মরণিকায় 'গহিরা প্রবন্ধে সুধীন দাস লিখেছেন ঃ

"এক জাঠ মেজর তার হাতের বেটন দিয়ে আমার বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। সেই আঘাতে আমি দশ মিনিট নিশ্বাস ফেলতে পারিনি। সেই বেটন মারার কালো দাগ শরীরের চামড়ার সাথে মিশে যেতে প্রায় তিন-চার বছর লেগেছিল। তারপর আমাকে এবং ফুটুদাকে চৌকিদারেরা নীল পাগড়ির কাপড়ের দুদিক দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে রাস্তার একপাশে বসিয়ে রাখল এবং কল্পনাদিকে অন্য এক দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাদের থেকে আলাদা করে বসিয়ে রাখল, পাঁচ-ছয়জন সৈন্য সঙ্গিন উঁচিয়ে পাহারা দিতে লাগল। সেই সময় দেখতে পেলাম দূর থেকে অনেক সৈন্য এসে সেই আশ্রয়ে জমা হচ্ছে।

দুজন ইংরেজ অফিসার ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার) ও আমার কাছে এসে আমাদের নাম জিজ্ঞেস করল এবং ফুটুদাকে বুট দিয়ে এমনভাবে লাথি মারল, যার ফলে তাঁর বাম চোখের ভ্রূর উপর ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল।"

বিপ্লবীনেতা তারকেশ্বর দস্তিদারকে যিনি বুট দিয়ে লাথি মারলেন, তিনি হলেন—আনোয়ারা থানার মিলিটারি ক্যাম্পের ইন-চার্জ মেজর কীম।

গহিরা যুদ্ধের বিপ্লবীরা ধরা পড়ার আগে থেকেই স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মাস্টারদার বিচার শুরু হয়েছিল। বিপ্লবী তিনজন ধরা পড়ার পর আবার মাস্টারদাকে নিয়ে একসাথে বিচার চললো। কিছুদিন পর সুধীন দাসের মামলা পৃথকভাবে চলতে লাগলো।

সুধীন দাস দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করার পর ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। সুধীন দাসের বাড়ি ভাটীখাইন। থানা—পটিয়া।

১৫ জুন ১৯৩৩ সাল। মাস্টারদা, তরেকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার শুরু হলো। ১৪ আগষ্ট বিচারের প্রহসন শেষ হয়। বিচারে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হয়। কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত বিবরণ ঃ

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রতি প্রাণদণ্ড

কুমারী কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

চট্টগ্রাম ১৪ই আগষ্ট—অদ্য দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রাইবিউনাল হইতে

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার রায় প্রদত্ত হয়। ট্রাইবিউনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ঐ একই ধারায় তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। কুমারী কল্পনা দত্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণের চারিদিকে পুলিশের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। রায় প্রদত্ত হইবার পূর্বে সেনাদল কিছুকাল শহরে কুচকাওয়াজ করে।

আসামীরা শান্তচিত্তে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করে এবং তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহারা বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিতে করিতে আদালত গৃহ ত্যাগ করে।

ট্রাইবিউনালের প্রেসিডেণ্ট রায়ের উপসংহারীয় অংশ পাঠ করেন। ১৫০ খানি টাইপ করা কাগজে প্রদত্ত হইয়াছে। [আনন্দবাজার : ১৫-৮-৩৩]

মামলার রায় প্রদানের পর তিনজন বিপ্লবীর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। সংবাদপত্রের ভাষায় :

সূর্য সেন প্রভৃতির আপীল

হাইকোর্টে আবেদন দাখিল

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কুমারী কল্পনা দত্তের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের আবেদন পেশ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রোহিনীবিনোদ রক্ষিত, পরিমল মুখোপাধ্যায় এবং রাধিকারঞ্জন গুহ এই সকল আইন ব্যবসায়ী আসামী পক্ষ হইতে আপীল রুজু করিয়াছেন। [আনন্দবাজার : ২২-৮-১৯৩৩]

হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হলো, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রাণদণ্ড এবং কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রইলো।

মাস্টারদা তাঁর বৌদিকে চট্টগ্রাম জেল থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা পড়ে দেখা যাক।

Chittagong Jail
Censered & Passed
PRISONER'S LETTER

From

Surjya Kumar Sen
Condemned Prisoner
21.11.33.

স্নেহময়ী বৌদি,

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাদের ২০শে অক্টোবরের, ৩রা নভেম্বরের এবং মণির ৭ই কার্ত্তিকের চিঠি একই সঙ্গে গত ১১ই নভেম্বর পেয়েছি। অষ্টদুর্বা

পাঠিয়েছিলেন বলে লিখেছিলেন। অষ্টদূর্বা পাইনি। আমি গত ৮ই নভেম্বর আপনার নামে সহরের ঠিকানায় একখানা চিঠি দিয়েছি, আশা করি পেয়েছেন! দাদা, মেজদি এবং অন্যান্য গুরুজনকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবেন। কমল, অজিত, গোপাল, রাখাল, মণি, রানী, বাদল এবং অন্যান্য ছোট সকলকে আমার স্নেহাশীষ দেবেন।

বৌদি, হাইকোর্টের রায় শুনে আপনারা বোধহয় শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারা গত নয় মাসে এই আঘাতটুকু সহ্য করবার জন্য হৃদয়কে তৈরী করেছেন বলেই আমার ধারণা। আমি বেশ আনন্দ নিয়েই যাচ্ছি, আমার কোন দুঃখ নেই। আপনাদেরও দুঃখ করার কোন কারণ নেই। আর আমার মোকদ্দমা চালান সম্বন্ধে আপনাদের খুব সন্তুষ্ট হওয়াই উচিত। আপনারা এত অভাবের মধ্যেও কলকাতার সবচেয়ে বড় ব্যারিস্টারকে দিয়ে আমার মোকদ্দমা চালিয়েছেন। চাটগাঁয়ও খুব ভাল ব্যারিষ্টারই নিযুক্ত করেছিলেন। এরচেয়ে বেশী আর কি করবেন? আপনাদের সাধ্যের অতিরিক্ত আপনারা করেছেন। আমি যখন শুন্‌লাম ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জি হাইকোর্টে আমার মোকদ্দমা করেছেন তখন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় আমার মন ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল আর্থিক অবস্থার লোকেও যে এতটুকু করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য আপনাদের অগাধ স্নেহ মমতার কথা ভেবে আমার মন করুণ হয়ে উঠ্‌ল। যখন হাইকোর্টের রায় শুন্‌লাম তখন নিজের কথা কিছুই মনে হল না, আপনাদের কথাই প্রাণের মধ্যে ভেসে উঠল। ভাব্‌লাম এই নির্ম্মম আঘাতটুকু আপনাদের কি ভীষণভাবে বাজবে। বৌদি, আপনারা চিরদিন আমার জন্য যা করলেন তার কণামাত্র প্রতিদানও আমি দিতে পারিনি। গুরুজনগণের স্নেহ মমতার ঋণ কেউ পরিশোধ করতে পারে না। আমি আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ ঋণীই রয়ে গেলাম। আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না। ভগবান চিরদিনই মঙ্গলময়।

ইতি
আপনার স্নেহের
শ্রীসূর্য্যকুমার সেন।

Chittagong Jail
Censored & Passed
PRISONER'S LETRER.

From
Surjya Kumar Sen
5.12.33.

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, আমার বৌদি,

স্নেহময়ী বৌদি, আমার ভক্তিপ্রণতি নিন্‌। আপনার কাছে হয়ত আমার এই শেষ চিঠি। জানিনা আর চিঠি লিখ্‌বার সময় হয় কিনা।

বৌদি আমি চল্লাম। আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহের মধুর স্মৃতি নিয়েই আমি যাচ্ছি। আপনাদের অগাধ স্নেহ আমায় পৃথিবীতে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ল না বলে দুঃখ কর্‌বেন না। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা যতই গভীর হোক্‌, অপরিসীম হোক্‌ তা কখনও মানুষকে চিরদিন সংসারে বেঁধে রাখতে পারে না। একদিন ভগবানের বিধানে সমস্ত বন্ধন কেটে সে অসীমের পানে ছুটে চলে যায়। ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার বিধান। আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মন আজ অসীমকে চায়, ভগবানের সান্নিধ্য চায়। দিন ভালই কাটছে। চার পাঁচদিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় একদৃষ্টে একমনে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। নির্মল জ্যোৎস্নায় সমস্ত নীল আকাশ ভরে গিয়েছিল। অসংখ্য নক্ষত্র সুন্দর ফুলের মত সারা আকাশে ফুটে রয়েছিল। গাছগুলি নীরবে যেন প্রকৃতি; এই শোভা উপভোগ করছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মন প্রকৃতির এই বিমল সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে গেল। মনে পড়ে গেল তাঁর কথা, যিনি এই সুন্দর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের আনন্দের জন্য প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন। তাঁর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে বেশ আনন্দ হল। অনেকক্ষণ এ ভাবে কেটে গেল। আজকাল প্রায়ই এ ভাবে অসীমের চিন্তাতেই মন ভরপুর হয়ে থাকে। বৌদি, যাই তবে। আমায় আশীর্বাদ করুন। আপনাদের কাছে কত অপরাধই করেছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন। ভগবানের বিধানকে তাঁর শুভ আশীষ বলেই গ্রহণ করবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের

সূর্য্য

ইতিমধ্যে সুধাংশু সরকার আবার বন্দী হলেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদারের নেতৃত্বে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের কিছুদিন পর সুধাংশু সরকার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে না পারায় মুক্তি দেন। এবার ব্রিটিশ সরকার নাছোড়বান্দা। তাই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে তাঁকে জেলে আটক করা হলো।

সুধাংশু সরকারের জন্ম—১৯১৪। বাবার নাম বিপিনবিহারী সরকার। মায়ের নাম শৈলবালা। বাড়ি মহিরা। থানা-পটিয়া।

বিপিনবিহারী সরকারের সাত ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম—সুধাংশু, সুখেন্দু, কিরণলাল, হিরন্ময়, অরবিন্দ, নির্মলেন্দু ও সুবিমল। মেয়ের নাম শীলা।

বিপিনবিহারী সরকার আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে কাজ করেন। ১৯২১ সালে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করার জন্য কারাবরণ করেন ও চাকরি হারান। ১৯২৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানিতে চাকরি নেন।

১৯২৮ সালে সুধাংশু সরকার অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তখন তিনি ইস্কুলের ছাত্র। ১৯৩০ সালে ছাত্রনেতা হিসেবে বিভিন্ন ইস্কুলে ধর্মঘট সংগঠিত করেন। চট্টগ্রাম শহরে সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে থাকাকালীন M/s Ezikiel কোম্পানির মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় ধৃত হন তিনি। এবং পুলিশী নির্যাতন ভোগ করেন। এ সময় তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষে ১৯৩২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। পাস

করেন। চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে পড়াকালীন পুলিশ রিপোর্টে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন।

কুমিল্লা কলেজে সুধাংশু সরকার ম্যাগাজিনের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন। কিশোর বয়স থেকে তিনি কবিতা ও গল্প লেখা শুরু করেন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি ইস্কুলে দেয়াল পত্রিকা বের করেন। চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াকালীন কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর ঢাকা থেকে বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে সুধাংশু সরকার বহরমপুর বন্দিশালায় থাকাকালীন হাতে লেখা পত্রিকার পরপর অনেক গুলি সংখ্যা বের হয়। সেই সব সংখ্যায় সুধাংশু সরকারের অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে সব কটি সংখ্যা নিয়ে নেয়। এবং বাজেয়াপ্ত করে।

সুধাংশু সরকারের কারাবাস প্রায় পাঁচ বছর। মুক্তি পেয়ে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। 'দেশপ্রিয়' পত্রিকায় গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়, 'সীমান্ত' মাসিক পত্রিকায় কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র দোল সংখ্যায় 'ফুটপাত' গল্প ও পরে 'দেশ' পত্রিকায় 'নীল সাপ' কবিতা বের হয়। এবং পত্রিকা থেকে সম্মান মূল্য পান।

১৯৪৫ সালের মে মাসে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের প্রকাশনালয় 'ইণ্টারন্যাশন্যাল্ পাবলিশিং হাউস' থেকে অনুবাদ গ্রন্থ 'বিপ্লবোত্তর রাশিয়া' (Russia Without Illusion) প্রকাশিত হয়। 'গ্রন্থলোক' প্রকাশনা থেকে কিশোর গ্রন্থ 'বিশ্ব-সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ও উপন্যাস 'পদ্ম-পলাশ' প্রকাশিত হয়। 'বইঘর' প্রকাশনা থেকে ছদ্মনামে অনুবাদ গ্রন্থ 'বিজ্ঞান বিচিত্রা', 'নবজাতক' প্রকাশনা থেকে ছদ্মনামে 'মাও সে-তুঙ এর রূপকথা এবং 'অশান্ত কাম্বোডিয়া' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া কিশোর গ্রন্থ 'ছন্দে ছড়ায় বিজ্ঞান' এক অনবদ্য রচনা। বইটি অনেক ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক। বিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে ছড়ার মাধ্যমে তিনি কিশোরদের উপহার দিয়েছেন।

এই গেলো প্রকাশিত বইয়ের নাম। অপ্রকাশিত বইয়ের পাণ্ডুলিপি সুধাংশু সরকার লেখককে দেখিয়েছেন। এ রচনা গুলি হলো—লাওস, চীন ও ইন্দোচীন সম্পর্কে লেখা। ঐতিহাসিক নানা তথ্য সমৃদ্ধ। সাহিত্য সাধনা করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকাশক হয়েছেন। তাঁর প্রকাশনার নাম 'গ্রন্থলোক', কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে। কলকাতা।

'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা'-র চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন স্মারক পুস্তিকায় সুধাংশু সরকার সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"তিনি (সুধাংশু সরকার) ১৯১৪ সালে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার মহিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিপিনবিহারী সরকার ১৯২১ সালে আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেন ও চাকুরি হারান। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ব্যাপারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতিত হন। আটক আইনে প্রায় পাঁচ বছর বন্দিদশায় ও পাবনার গ্রামে অন্তরীণ থাকার পর তিনি ১৯৩৮-এ মুক্তি পান।"

সুধাংশু সরকার জেল থেকে বি. এ. পাস করেন। মহিরা গ্রামে সুধাংশু সরকারের বাড়িতে মাস্টারদা, সরোজ গুহ এবং আরো অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভারত সরকার তাম্রপত্র দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

তাঁরকেশ্বর দস্তিদার বন্দী হবার পর বিপ্লবীদলের নেতা নির্বাচিত হলেন, বিনোদ দত্ত। বিপ্লবীদের কাছে সব আশাদীপ নিভে যেতে বসেছে। জেলের বাইরে যে ক'জন বিপ্লবী আত্মগোপন ও অন্তরীণ আছেন তাঁরা পরবর্তী আক্রমণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হাবিলাসদ্বীপের এক গোপন আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন— হিমাংশু চক্রবর্তী, কিরণ সেন ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস। হিমাংশু চক্রবর্তী বললেন,—"একই দিনে আমরা দুটি আক্রমণ চালাবো। প্রথমটি হলো—মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে হত্যার মাধ্যমে সমুচিত জবাব দিতে হবে। দ্বিতীয় হলো—ক্রিকেট খেলার মাঠে ইংরেজদের ওপর আক্রমণ। ইংরেজরা মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনের ওপর দৈহিক নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাচ্ছে। এদের ক্ষমা নেই।"
কিরণ সেন বললেন,—"একই দিনে দু'টি আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কোন কারণে তোদের পরিকল্পনা বাতিল হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, নেত্র সেন বাড়ি নেই। তোদের শহরের আক্রমণের খবর পেলে তবেই আমি নেত্র সেনকে হত্যার জন্য তৈরি হবো।"
নেত্র সেনের হত্যার বিশদিন আগে এসব খুঁটিনাটি আলোচনা হয়। হিমাংশু বারবার কিরণ সেনকে সতর্ক করে দিয়েছেন, নেত্র সেন এবং তার মেজ ভাই দেখতে এক রকম। কেবলমাত্র পার্থক্য হলো—মেজ ভাইয়ের মুখে বসন্তের দাস। হত্যার আগে ভাল করে দেখেশুনে যেন কাজটি করেন। ভুল হলে বিপদ। ব্রজেন সেন হলেন নেত্র সেনের ছোট ভাই।
কিরণ সেন নিজ বাড়িতে অন্তরীণ। তাঁর কাছে দলের ৪টি বোমা জমা আছে। ৬ জানুয়ারি ১৯৩৪ সালের সন্ধ্যাবেলায় হিমাংশু বোমা নিতে এলেন। পরের দিন পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষ্ণ চৌধুরী, নিত্যরঞ্জন সেন, হিমাংশু চক্রবর্তী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী যাবেন চট্টগ্রাম পুলিশের প্রধান মিঃ ক্লিয়ারী ও শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের ওপর আক্রমণ করতে। কিরণ সেন ভাবনায় পড়লেন। পাশের বাড়ির সহপাঠী দেবেন দত্তের কাছে বোমাগুলো রাখতে দিয়েছিলেন। দেবেন দত্ত তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বোমাগুলো কোথায় আছে তা তাঁর জানা। সুকৌশলে দেবেন দত্তের ছাদের ওপর থেকে বোমাগুলো কিরণ সেন সংগ্রহ করলেন।
হাবিলাসদ্বীপ গ্রাম থেকে বোমা নিয়ে গভীর রাতে কিরণ ও হিমাংশু কদুরখিল গ্রামের আশ্রয়ে পৌঁছলেন। খেতে গিয়ে দেখেন হাঁড়িতে দুমুঠো ভাত পড়ে আছে। শীতের রাত। তাতে আবার জল দেওয়া হয়েছে। তরকারির ভাণ্ড খালি। এদিকে ক্ষুধায় পেট দাউদাউ করে জ্বলছে। কিরণ সেন সাগ্রহে হিমাংশুকে বললেন, "ও দুমুঠো ভাত তুই খেয়ে নে। তুই কাল মরতে যাচ্ছিস। পেট ভরে ভাত খাওয়ার ভাগ্যও তোর হল না। এ খাওয়া তোর শেষ খাওয়া।"

হিমাংশু করুণ সুরে বললেন, "আইল্যা'তে (তুষ ভর্তি মাটির পাত্রে আগুন রাখা হয়।) দুটো শুকনো লঙ্কা পুড়ে নে। দু'জনে এক সঙ্গে এক থালায় বসে খাওয়ার সৌভাগ্য জীবনে আর আসবে না।" বন্ধুর শেষ মুহূর্তের কথা উপেক্ষা করার সাধ্য কিরণের নেই। তাই তাঁরা দু'জনে দুটি লঙ্কায় কামড় দিয়ে পান্তা দুমুঠো খেয়ে নিলেন। এ এক করুণ দৃশ্য।

রাত ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে মরণজয়ী বিপ্লবী চারজনকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে কিরণ সেন হাবিলাসদ্বীপের পথে রওনা দিলেন।

ইংরেজেরা ভারতবাসীর শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে নিতে চায়। দেশের মানুষ বুঝেছে, নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। যন্ত্রণায় কাতর মানুষ আত্মশক্তিতে বলীয়ান। নিরস্ত্র মানুষ অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর।

৭ জানুয়ারি। ১৯৩৪ সাল। সকালবেলা। চারজন বিপ্লবী নৌকো করে কদুরখিল গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম শহরে যাত্রা করলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে আছে ক'টি হাতবোমা ও একটি রিভলবার। উদ্দেশ্য—ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্বেতাঙ্গদের ওপর আক্রমণ করা। এ আক্রমণ হবে ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ সরকারের অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের প্রকাশ্য প্রতিবাদ। আবেদন, মিটিং ও মিছিলের ভাষায় সাম্রাজ্যবাদীদের টনকনড়ে না।

চট্টগ্রাম শহরে পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ ফৌজি পাহারায় সুরক্ষিত। সৈন্যেরা ইংরেজ দর্শকদের ঘিরে রেখেছে। বিপ্লবীরা ভাবলেন, প্রতিশোধ নেওয়ার এই তো সময়। তরুণ বিদ্রোহীরা দু দলে বিভক্ত হয়ে ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বিপ্লবীরা অতর্কিতে হাতবোমা ও রিভলবার দিয়ে শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের আক্রমণ করলেন। বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে মাঠ কেঁপে উঠলো। মৃত্যুভয়ে ভীত দর্শক দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপ্লবীদের বোমা ও রিভলবারের গুলি ফুরিয়ে গেলো।

শুরু হলো সেনাবাহিনীর প্রতিআক্রমণ। খেলার মাঠে বিদ্রোহী যুব নিত্য সেন শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন। হিমাংশু চক্রবর্তী গুরুতর আহত হয়ে সংজ্ঞাহীন। তিনিও মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনে শহিদ হলেন। কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তী আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলে বন্দী হলেন।

৫ জুন, ১৯৩৪ সালে মেদিনীপুর জেলে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তীর ফাঁসি হয়।

ক্রিকেট খেলার মাঠে বিপ্লবীদের আক্রমণের খবর, কিরণ সেন হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে বসে সেদিন শত চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারলেন না। সীমাহীন উৎকণ্ঠায় রাতে তিনি ঘুমোতে পারলেন না।

রবীন্দ্র নন্দী কিরণ সেনের বাড়িতে এলেন। নেত্র সেনকে হত্যার প্রস্তুতিপর্বে কিরণ সেন রবীন্দ্র নন্দীকে নক্সা এঁকে বললেন, "মাঠের ধান উঠে গেছে। ফাঁকা মাঠ। আজ আমরা মেঠো পথ দিয়ে গৈরলা গ্রামে যাবো। হাবিলাসদ্বীপ থেকে গৈরলা গ্রামের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার। ফাঁকা মাঠের বুক চিড়ে কোণাকুণি গেলে দু কিলোমিটার হবে। নেত্র সেনের বাড়ির বাউণ্ডারি প্রকাণ্ড। বাড়ির চারদিকে গড়খাই। সারা বছর ওতে জল থাকে।

বাড়ির গেটের সামনে মস্ত বড় দিঘি। ফটক থেকে বসতবাড়ির দূরত্ব প্রায় দু'শ মিটার। একটি মাত্র প্রবেশ পথ। বাড়িটা যেন একটি দুর্গ। বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। এঁকেজুখে এখন যা বলি না কেন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন হতে পারে। হাঁ, একটি মূল্যবান কথা মনে রাখবে। সেটি হলো— অত্যুৎসাহী বা মতিভ্রমবশতঃ নেত্র সেনকে কোপাতে গিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে কোপাকুপি না করি। মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, বিচলিত হবে না। বিকেলে ফুটবল খেলতে মাঠে এসো।
৮ জানুয়ারি। ১৯৩৪ সাল। সূর্য অস্ত গেলে কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দীর অভিযান শুরু হবে। রাত্রির উপাসনায় মগ্ন কিরণ সেন।
কিরণ সেনের বাড়ির পাশেই ফুটবল খেলার মাঠ। কিরণ ও রবীন ফুটবল খেলতে মাঠে নেমেছেন। খেলার দর্শকদের মধ্য থেকে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেলো, "নেত্র সেন যাচ্ছে। নেত্র সেন যাচ্ছে।"
এই চিৎকারের অর্থ হলো—বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের প্রতি গ্রামের মানুষের অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি। খেলার ছলে কিরণ সেন নেত্র সেনকে দেখে নিলেন। তিনি দেখলেন, নেত্র সেনের হাতে একটি পদ্মার ইলিশ ঝুলছে।
নেত্র সেন শহর থেকে ফিরছে। নৌকোয় সেনেরপুলের ঘাটে নেমেছে। হাবিলাসদ্বীপ গ্রাম দিয়ে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছে। কিরণ সেন স্থির করলেন, খাওয়ার সময় নেত্র সেনকে রান্নাঘরে হত্যা করতে হবে।
খেলা শেষ হওয়ার পর কিরণ সেন রবীন্দ্র নন্দীকে বললেন, "তুমি তোমার বাড়ি থেকে একটি চাদর ও একখানা দা নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এসো। দা খানা চাদরের তলায় ঢেকে আসবে। দেরি করো না।"
সন্ধ্যে উতরে গেছে। কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী হাবিলাসদ্বীপ গ্রাম থেকে গৈরলা গ্রামে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের পরনে ধুতি। গায়ে চাদর। চাদরের তলায় কিরণ সেন নিয়েছেন রামদা। রবীন্দ্র নন্দী নিয়েছেন দা।
সামনে ফাঁকা মাঠ। দু'জনে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। উদ্দেশ্য—দেশদ্রোহী নেত্র সেনকে হত্যা।
কনকনে শীতের রাত। রাতের আকাশ ভরা তারাই তাঁদের অভিযানের একমাত্র সাক্ষী। মাঠ পার হয়ে গৈরলা গ্রামের রাস্তায় উঠতে যাওয়ার সময়, কিরণ সেন নাম-করা ফুটবল খেলোয়াড় বটুকৃষ্ণ ধরকে দেখতে পেলেন। বটুকৃষ্ণ ধর কিরণ সেনের দাদার বন্ধু। তাঁকে দেখে কিরণ ও রবীন মাঠের কেয়াবনের আড়ালে গা-ঢাকা দিলেন।
বটুকৃষ্ণ ধর আপন মনে চলে গেলেন। কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী গুটিগুটি পায়ে এগুতে লাগলেন। তাঁদের গায়ের চাদর পাগড়ির মতো মাথায় জড়িয়ে নিলেন। উদ্দেশ্য—যাতে কেউ তাঁদের চিনতে না পারে।
রাত সাড়ে আটটা। কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী নেত্র সেনের বাড়ির মেনগেটে এসে পৌঁছলেন। গেটের বাঁশের দরজাটা কিরণ সেন সম্পূর্ণ খুলে ফেললেন। পালাবার পথ আগেভাগে মুক্ত করলেন।
নেত্র সেনের ছোট ভাই ব্রজেন সেন। ব্রজেন সেনের বন্ধু হলেন কিরণ সেন। নেত্র সেনের

বাড়িতে কিরণ সেন প্রায় সময় নিমন্ত্রণ খান। নেত্র সেনের বাড়ি তাঁর নখদর্পণে।

কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী সোজা পথে এগুলেন না। ফটক পার হয়ে বাড়ির দক্ষিণ পাশ দিয়ে চললেন। সামনে বাঁশের বেড়া। পাশেই লাউয়ের মাচা। মাচার নিচ দিয়ে খানিকটা নুয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেখেন, নেত্র সেন রান্নাঘরের খোলা বারান্দায় খেতে বসেছে। সামনে হারিকেন জ্বলছে।

কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী রান্নাঘরের এক কোণে এসে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। রান্নাঘর বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। কিরণ সেন বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, নেত্র সেনের স্ত্রী খাবার পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত। এবার উঁকি দিয়ে দেখলেন—রান্নাঘরের বারান্দায় যে লোকটা খেতে বসেছে সে নেত্র সেন, না তার মেজো ভাই।

কিরণ সেন ভালো করে দেখে বুঝলেন, এই নেত্র সেন। এতে কোন ভুল নেই। নেত্র সেনের স্ত্রী খাবার পরিবেশনের কাজে বারবার রান্নাঘর আর বারান্দায় যাওয়া-আসা করছেন। এ ফাঁকে কিরণ সেনকে সুযোগ নিতে হবে। নেত্র সেন ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাওয়ার সময় কার্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল। সমস্যা হলো—ফাঁকা বারান্দায় চার মিটার পথ এগিয়ে যেতে হবে।

এমনি নিয়তি বিপ্লবীদের পরিকল্পনা মতো নেত্র সেনকে রান্নাঘরেই পাওয়া গেলো। সুযোগ বুঝে কিরণ সেন সাপের ছোবলের গতিতে নেত্র সেনের কাছে হাজির হলেন। পলকে কিরণ সেন তাঁর রামদা দিয়ে নেত্র সেনের ঘাড়ে প্রথম কোপ বসালেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন রবীন্দ্র নন্দী। তিনিও তাঁর দা দিয়ে নেত্র সেনের ঘাড়ে একের পর এক কোপ বসালেন। নেত্র সেনের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। রান্নাঘরের বারান্দায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেলো। তাড়াহুড়োর জন্য তাঁরা নেত্র সেনের মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না। তবে নেত্র সেনের মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে বিপ্লবীরা নিমিষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। অন্ধকারে পালাবার পথে হোঁচট খেয়ে কিরণ সেন মাটিতে পড়ে গেলেন। রাতের ঘুটঘুটে আঁধারে দেখতে না পেয়ে রবীন্দ্র নন্দী কিরণ সেনের গায়ের ওপর পড়লেন। চট্‌পট্‌ উঠে তাঁরা বিপদসীমা পার হলেন।

এই সন্ধিক্ষণে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসে নেত্র সেনের স্ত্রী বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে এক ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারালো।

অন্ধকার ভেদ করে কিরণ সেন ও রবীন্দ্র নন্দী ধলঘাট রেল স্টেশনের দিকে চললেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো—তাঁরা ঘুরপথে হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে ফিরবেন। প্রথমে বোয়ালখালি নদীর পুল পার হলেন। তারপর তাঁরা নদীর তীর ধরে এগোতে লাগলেন। সামনে বোয়ালখালি নদীর ওপর ধলঘাট গ্রামে যাওয়ার আর একটি ব্রিজ। দূর থেকে অন্ধকারে তাঁদের মনে হলো—ব্রিজের ওপর পুলিশ যেন পাহারায় মোতায়েন।

কিরণ ও রবীন থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কিছুটা পেছনে সরে গিয়ে তাঁদের জামা কাপড় খুললেন। দু'জনে দুটি পুঁটলি তৈরি করে তাতে নিজের নিজের দা রাখলেন। এখন তাঁরা জন্মদিনের পোশাকে নদী সাঁতরানোর জন্য তৈরি হয়েছেন। উভয়ের এক হাতে পুঁটলি অন্য হাতে নদী সাঁতরাতে শুরু করলেন। জলে নামার পর কিরণ তাঁর বাঁ-হাঁটুতে

জ্বালা অনুভব করলেন। একে তো কেটে গেছে, তার ওপর নোনা জল লেগে অসহ্য জ্বালা করছে। রবীন্দ্র নন্দীরও বাঁ-হাতের কবজির কিছু ওপরে জ্বালা করছে। নদী পার হয়ে তাঁরা পোশাক পরে নিলেন।

রাত এগারোটা। কিরণ ও রবীন হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের দেবেন দত্তের বাড়ির উঠানে এসে হাজির হলেন। কিরণ সেন জিব তালুতে ঠেকিয়ে টক্‌টক্ সাংকেতিক আওয়াজ করলেন। দেবেন দত্ত জেগেই আছেন। কেননা ভর সন্ধ্যেয় তাঁর কাছ থেকে কিরণ সেন রামদা নিয়ে গেছেন। কিছু একটা ঘটতে চলেছে তা তিনি আঁচ করেছেন। তিনি বিপ্লবী নন। কিন্তু বন্ধু কিরণ সেনের সুখ-দুঃখের শরিক। তাই তিনি চিন্তার সাগরে ডুবে আছেন। পাশে তাঁর স্ত্রী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন।

কিরণ সেনের সাংকেতিক শব্দ শুনে দেবেন দত্ত হাতে হারিকেন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। হারিকেনের আলোয় দেখলেন, কিরণ ও রবীনের জামা-কাপড় রক্তে লালে লাল। যেন হোলি খেলে এসেছেন। হারিকেনের আলোতে তাঁরা তাঁদের ক্ষতস্থান দেখে নিলেন।

কিরণ সেন দেবেন দত্তকে বললেন, "তুই আমার বাড়ি গিয়ে বৌদির কাছ থেকে দু'খানা ধুতি নিয়ে আয়।"

কিরণ সেনের বৌদি কিরণ সেনকে খুবই স্নেহ করেন। বৌদির কাছে তাঁর স্নেহের দাবি অফুরন্ত। দাদা থাকেন বার্মায়। দেবেন দত্ত কিরণ সেনের নির্দেশ মতো সাংকেতিক শব্দে বৌদিকে জাগালেন। বৌদি সিন্ধুবালা সেন গভীর রাতে দরজা খুলে বের হয়ে এলেন।

দেবেন দত্ত বললেন, "বৌদি, কিরণ আপনাকে দু'খানা ধুতি দিতে বলেছে।"

কিরণ ও রবীন শীতে কাঁপছেন। দেবেন কাপড় নিয়ে এলেন। কিরণ, রবীন ও দেবেন পুকুরে গেলেন। মুখ-হাত ধুয়ে তাঁরা জামা কাপড় ছাড়লেন। দুজনের সব জামা-কাপড় দেবেন দত্তকে দেওয়া হলো।

কিরণ সেনের নির্দেশে দেবেন দত্ত পুকুরের একগলা জলে নেমে পোশাকগুলি কাদার ভেতর পুঁতে দিলেন। দা দু'খানি ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নিলেন। কাজ শেষ করে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

কিরণ সেন রাতে কিছুই খেলেন না। শুয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুম আসে না।

সকালবেলা। নেত্র সেনের হত্যার খবর তিল থেকে তাল হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। লোকে বলাবলি করছে – নেত্র সেন ও তার পরিবারবর্গকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। বংশে বাতি দেওয়ার কেউ নেই।

কিরণ সেন হাঁটুর ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতর। হাঁটতে পাচ্ছেন না। জ্বর এসেছে। অনুক্ষণ বাড়িতে পুলিশ আসার কথা ভাবছেন। ইতিমধ্যে খবর পেলেন, পুলিশ নেত্র সেনের লাশ চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে যাচ্ছে।

কারা-প্রাচীরের অন্ধকারে ঢাকা দিনগুলিতেও মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের হৃদয় সৌন্দর্য মোটেই বিবর্ণ হয়নি। চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন আকৃষ্ট হয় তেমনি মাস্টারদার

ভালোবাসার অমোঘ শক্তিতে জেলে মেথর থেকে সিনিয়র ডেপুটি জেলার নীলমণি মুখার্জী পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের ঘুমন্ত দেশপ্রেমকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির আগে ইংরেজ সরকার চট্টগ্রামের সব বিপ্লবীদের যেন ছেঁকে জেলে ঢুকালো। সন্দেহজনক কোন যুবক জেলের বাইরে নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের জাগ্রত যৌবন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

১১ জানুয়ারি, ১৯৩৪ সাল। সকালবেলা। সিনিয়র ডেপুটি জেলার নীলমণি মুখার্জী কয়েদি পরিদর্শনে এলেন। ফেরার সময় তিনি একজন বিপ্লবীকে বললেন, "আজ রাতে মাস্টারদা এবং তারকেশ্বরবাবুর ফাঁসি হবে। জেল ভীষণ কড়া।"

এ খবর নিমেষের মধ্যে সারা জেলে ছড়িয়ে পড়লো। বন্দীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে চললো।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর আছেন কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেলে। একজন কয়েদি মেথর কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেল থেকে বের হয়ে এলেন। হাতে তাঁর ময়লার পাত্র। এই অনুগত মেথরটি মাস্টারদার বিশিষ্ট সহকর্মীদের সঙ্গে জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিঠি লেনদেন করেন। এবার মেথরটি রাজনৈতিক বন্দী ওয়ার্ডে ঢুকলেন। এই ওয়ার্ডে আছেন মাস্টারদার বিশ্বস্ত সহকর্মী কালীকিঙ্কর দে। মেথরটি কি সংবাদ বয়ে এনেছেন তা কালী দের লেখা থেকে পড়া যাক।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা পুস্তিকায় 'মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি ও চট্টগ্রাম জেলে অকথ্য অত্যাচার' প্রবন্ধে কালীকিঙ্কর দে লিখেছেন ঃ

"...ময়লার টুকরি হাতে করে ঢুকল মেথর। সে তার পূর্ব পরিচিত বন্দীবাবুকে চোখ ইশারা করল। ময়লার টুকরিতে পাওয়া গেল একটি ছোট্ট করে ভাঁজ করা কাগজ। উভয় পৃষ্ঠা পেনসিলের সীস দিয়ে ছোট ছোট করে ইংরেজী লেখা—এক পৃষ্ঠা মাস্টারদার হাতে অন্য পৃষ্ঠা তারকেশ্বরদার।"

ফাঁসির পূর্বে মাস্টারদার শেষ বাণীটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

Ideal and unity is my farewell message. Rope is hanging over my head. Death is knocking at my door. My mind is soaring towards Eternity. This is the time for 'Sadhana'. This is the time for preparation to embrace death as a friend and this is the time to recall lights of other days as well.

Sweet remembrance of you all ! My dear brothers and sisters, break the monotony of my life and cheer me up. At such a pleasant, at such a grave, at such a solemn moment, what shall I leave behind for you ? Only one thing, that is my dream, a golden dream—a dream of Free India. How auspicious a moment it was, when I first saw it ! Throughout my life most passionately and untiringly, I have pursued it like a lunatic. I know not how far I proceeded towards the fulfilment of my dream. I know not where I am compelled

to stop my pursuit to-day. If icy hands of death give you a touch before the goal is reached, then give the charge of your further pursuit to your followers as I do to-day. Onward, my Comrades, onward—never fall back. The day of bondage is disappearing and the dawn of freedom is ushered in Be up and doing. Never be disappointed. Success sure. God bless you !

Never forget the 18th April, 1930, the day of Easter Rebellion in Chittagong. Keep ever fresh in your memory the fights of Jalalabad, Julda, Chandannagar and Dhalghat. Write in red letters in the core of your hearts the names of all patriots who have sacrificed their lives at the altar of India's freedom.

My earnest appeal to you—there should be no division in our organisation. My blessings to you all, inside and outside the jail. Fare you well.

Long live revolution.
Bande Mataram.

Chittagong Jail
11th. Jan., '34
at 7 P. M.

"সুদৃঢ় ঐক্য ও সুমহান আদর্শ—আমার শেষ বাণী। আমার মাথার ওপর দুলছে মৃত্যুর ফাঁস। দুয়ারে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যুর করাঘাত। মন আমার অনন্ত-অমৃত-পথযাত্রী। এই তো 'সাধনা'-র প্রকৃষ্ট সময়। মৃত্যুকে মিত্রের মতো আলিঙ্গনের এই তো সময়। ফেলে আসা দিনগুলিকে স্মরণ করার এই তো সঠিক মুহূর্ত।

কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি! প্রিয় ভাইবোনেরা আমার, তোমরা আমার জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙ্গে দাও। আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দঘন, পবিত্র ও গুরুত্বপূণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিস আমি রেখে যাচ্ছি, তা হলো আমার স্বপ্ন। একটি সোনালি স্বপ্ন—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কী শুভক্ষণে আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। জীবনভোর পরম উৎসাহে ও অক্লান্তভাবে উন্মাদের মতো এই স্বপ্নের পেছনে ছুটেছি আমি। জানি না, কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে যদি মৃত্যুর হিম-শীতল হাত তোমাদের স্পর্শ করে, তবে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই মহান্ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব তুলে দিও, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এগিয়ে চল, কম্‌রেড্‌স, এগিয়ে চল। কখনো পিছিয়ে পড়বে না। দাসত্বের দিন অবসান প্রায়। স্বাধীনতার উষালগ্ন আগত ঐ। উঠো। কাজে লাগো। কখনো নিরাশ হয়ো না। সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে ঈস্টার অভ্যুত্থানকে কখনো বিস্মৃত হয়ো না। জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সর্বদা স্পষ্ট মনে রেখো। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ দেশপ্রেমিকদের স্মৃতি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

তোমাদের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন আমাদের সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে। যারা কারান্তরালে ও বাইরে রয়েছো তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার আশীর্বাদ। বিদায় বন্ধু। বিদায়।

চট্টগ্রাম জেল
১১ জানুয়ারি ১৯৩৪
সন্ধ্যা ৭ টা

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
বন্দে মাতরম্!"

কনডেম্‌ড সেলের পাশে রাজনৈতিক বন্দী ওয়ার্ড। দুই ওয়ার্ডের মাঝখানে উঁচু একটা দেয়াল। দেয়ালটা ছাদ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। মাঝখানে কিছুটা অংশ ফাঁকা। সময় সময় মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক বন্দী ওয়ার্ডে ভেসে আসে।

তখন বিকেল। চট্টগ্রাম জেলের ভার ন্যস্ত হয়েছে মিলিটারির ওপর। রাইফেল কাঁধে সেনাবাহিনী জেল চক্কর দিচ্ছে।

সাড়ে চারটায় রাজবন্দী ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রাজবন্দীরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন, "বন্দে মাতরম্! সূর্য সেন কি জয়! তারকেশ্বর দস্তিদার কি জয়!" শতাধিক বন্দীর জয়ধ্বনিতে জেল কেঁপে কেঁপে উঠলো। এই ধ্বনি চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিরামহীন জয়ধ্বনিতে বিপ্লবীরা মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁদের পরম শ্রদ্ধা।

জয়ধ্বনি চলাকালীন মাস্টারদার আওয়াজ শোনা গেলো, "বন্দে মাতরম্। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।"

তারকেশ্বর দস্তিদার ও একই সুরে সুর মেলালেন। এই ধ্বনি প্রতিটি রাজবন্দীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো।

এবার মাস্টারদা সব রাজবন্দীর নাম জানতে চাইলেন। অমর সেন চিৎকার করে মাস্টারদাকে শুনিয়ে দিলেন রাজবন্দীদের নাম। মাস্টারদা তাঁর অনুগামীদের নাম শুনে পরম আনন্দলাভ করলেন।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার রাজবন্দীদের আশীর্বাদ জানালেন। পরিশেষে মাস্টারদা বললেন, "আমরা জীবনের শেষ উপাসনা করতে যাচ্ছি।"

মাস্টারদার শেষ উপাসনার কথা শোনার পর সমস্ত জেল নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। মাস্টারদা গীতা পাঠ করতে লাগলেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন ঃ

'জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥'

রাত সাড়ে এগারোটায় জেল গেটে ঘণ্টা পড়লো। এ সময় কয়েকজন ইংরেজ অফিসার জেলের মধ্যে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর মাস্টারদা চিৎকার করে তাঁর পাশের ওয়ার্ডের রাজবন্দীদের জানিয়ে দিলেন, "আমাদের ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে।"

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদার 'বন্দে' বলার পর আর মাতরম্ বলতে পারলেন না। রাজবন্দীরা অনুমান করলেন, মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ইংরেজ অফিসারেরা টুঁটি টিপে আধমরা করে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছেন।

জেল গেটে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজলো। ইংরেজী মতে ১২ তারিখ শুরু হলো। পরক্ষণেই শোনা গেলো ফাঁসির মঞ্চের লিভারের টান।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির সময় কালীকিঙ্কর দে চট্টগ্রাম জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি তার একটি প্রবন্ধে উক্ত সময়ে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়েছে বলে লিখেছেন।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়ার পর মুহূর্তে গুর্খা সৈন্য ও অফিসারেরা ছুটে এলো রাজবন্দী ওয়ার্ডে। শুরু হলো লাঠি-চার্জ। তাদের এককথা কোনরকম জয়ধ্বনি দেওয়া চলবে না। অফিসারেরা একবার অত্যাচার করে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা আবার জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। ফের শুরু হয় লাঠিপেটা। শত অত্যাচার চালিয়েও বিপ্লবীদের জব্দ করতে পারলেন না তাঁরা।

সারারাতব্যাপী রাজবন্দীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে বহু বিপ্লবীর শরীর থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। ইংরেজ অফিসারেরা ভোর পাঁচটায় জেল ছেড়ে চলে গেলেন।

জেল কর্তৃপক্ষ মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃতদেহ তাঁদের আত্মীয়দের কাছে দেননি।

মাস্টারদাও তারকেশ্বর দস্তিদারকে যে জল্লাদ ফাঁসি দিয়েছিল তার নাম শিবলাল ডোম। তার বাড়ি বেরিচাপরা গ্রামে। জেলা—মজঃফরপুর।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়ার আগে থেকে শিবলাল মদের নেশায় চুর হয়ে আছে। ফাঁসির পর দু'জনের মৃতদেহ কোথায় জেল কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছেন, তা সে জানে না।

একই ফাঁসির মঞ্চে দু'জন বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়ার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রের ভাষায় ঃ

সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার

শুক্রবার ভোরে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসি

চট্টগ্রাম ১২ই জানুয়ারী, অদ্য সকালবেলা চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী। চট্টগ্রামে এক স্পেশাল ট্রাইবিউনালে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। বিচারে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছিলেন।

[আনন্দবাজার ঃ ১৩-১-৩৪]

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃতদেহের কি হলো ?
অনেকের ধারণা, মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রাণহীন দেহ জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে ইংরেজেরা বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দিয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। কিন্তু, ভারতবাসীর কাছে রেখে গেলেন তাঁর 'সোনালি স্বপ্ন।' সূর্য সেনের 'সোনালি স্বপ্ন' হলো—ভারতের স্বাধীনতা।

রাতের অন্ধকার সাঁতরিয়ে নূতন দিনের প্রদীপ্ত সূর্য পুবের আকাশে উদিত হবে। ভোরের সোনালি রোদের উজ্জ্বল কিরণে মাস্টারদার 'সোনালি স্বপ্ন' ছড়িয়ে পড়বে ভারতের দিকে দিকে।

মাস্টারদার সংগ্রামময় জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক স্বর্ণ অধ্যায়। তিনিই ভারতবাসীকে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অজেয় নয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরাধীন ভারতবাসীরা জেগেছে। ফলে ভারতের দিকে দিকে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেছেন, "ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন জোয়ারের সূচনা হয়েছে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সময় থেকেই।"

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন জাতিকে শিখিয়েছেন, স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেকে কিভাবে উৎসর্গ করতে হয়। তাঁর অনুগামীদেরও তিনি শিখিয়েছেন, স্বদেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় উদ্দীপ্ত হয়ে কি করে মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপ দিতে হয়। বহু শহিদের আত্মোৎসর্গ ভারতের স্বাধীনতার পথকে করেছে মসৃণ।

সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রচিত হয় ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সংগ্রামেই রচিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস।

ভারতবাসীর কাছে মাস্টারদার সংগ্রামময় জীবনের আদর্শই হোক স্মরণীয়। তিনিই হোন বরণীয়। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে তাঁর সাধনপথই হোক প্রেরণার উৎস।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট